বঙ্গদেশে অল্পই আছেন। চট্টগ্রামে তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই। দেশের বালক-বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম এবং নীতির প্রচার করিবার জন্য মন্দির সংস্থাপন, রুগ্নদিগকে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য ঔষধালয়ের ব্যবস্থা, গ্রামবাসীকে নির্ম্মল জল বিতরণ করিবার জন্য বহু পুষ্করিণী খনন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির বিস্তার করিবার জন্য সভামণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি ধর্ম্ম এবং যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন ও দেশের নরনারীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন এবং পরম পিতার বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে অনেকস্থান খালি হইয়াছে অনেক অনুষ্ঠানে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যাত্রামোহনের ন্যায় আর কেহ এদেশে নাই। এদেশে বহু অর্থশালী লোক বর্ত্তমান আছেন কিন্তু জনহিতকর কার্য্যে দান করিবার মত, হৃদয়বান আর কাহাকেও দেখিতেছি না।

যাত্রামোহনের স্থানে আমরা এখন অন্য লোককে প্রতিষ্ঠিত করিব। কিন্তু তাঁহার ন্যায় দেশের সেবা করিতে কেহ প্রস্তুত কিনা জানিনা, তাঁহার ন্যায় ঘরের অর্থ পরের জন্য দান করিতে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেশের স্বার্থ রক্ষা করিতে কেহ প্রস্তুত আছেন কিনা জানিনা।

ধর্ম্ম-জীবনের কথা—তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের দুইটি কথা না বলিলে আমার কথা অসম্পূর্ণ থাকিবে। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামের কথা অনেকেই জানেন। প্রায় ৩২ বৎসর ধর্ম্মজীবনের পথে আমরা পরস্পর এক সঙ্গে চলিয়াছি। সুতরাং তাঁহার কথা বলিবার আমার কিঞ্চিৎ সুযোগ আছে। তাই আমি ইহার উল্লেখ করিতেছি।

যৌবনকালে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মতের স্থিরতা বা দৃঢ়তা ছিলনা। পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের ধর্ম্ম বিশ্বাসে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া অনেকেই এদেশের প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সরল বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারেন না, অথচ জ্ঞানের অনুকূল ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যতীত মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম পিপাসারও তৃপ্তি হইতে পারে না। পুরাতনে বিশ্বাসহীনতা এবং নূতন পথ অন্বেষণে নিশ্চেষ্টতা প্রযুক্ত আজকাল ধর্ম্মে উদাসীনতাই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। একসময় যাত্রামোহন বাবুর ধর্ম্মজীবনের এই অবস্থাই ছিল। দেশের পুরাতন আচার অনুষ্ঠানে তাঁহার আস্থা ছিলনা অথচ সমাজ রক্ষার জন্য তাহাই করিতে হইত। নিজের জ্ঞানানুমোদিত কোনও নূতন পথের অন্বেষণ তখন তিনি করেন নাই। সেই অবস্থাতে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ধর্ম্ম প্রচারার্থ চট্টগ্রামে আসি য়া যাত্রামোহনবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তখন তাঁহার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁহার শ্বশুর স্বনামখ্যাত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়ের অনুরোধে তিনি উক্ত প্রচারক মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া নিজগৃহে রাখিয়া ছিলেন। প্রচারক মহাশয় কিঞ্চিদধিক ৫মাস কাল তাঁহার গৃহে বাস করিয়া স্থানীয় (সাধারণ) ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়া

যান। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে অনেক সময়ে তাঁহার গৃহে আলোচনা হইত। প্রতি রবিবার তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মোপাসনা হইত এবং অনেক সময় বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের তিনি সাহায্য করিতেন। এইরূপে ১৮৮৭ সালের মার্চ্চমাস হইতে তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সাক্ষাৎ পরিচয় ও যোগ স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে হিন্দু-সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ পাশাপাশিভাবে, একসঙ্গে, তাঁহার হৃদয় মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। অনেক বৎসর, তিনি দুই সমাজকেই অবলম্বন করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যে যোগদান করিতেন এবং হিন্দুসমাজের সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। এই অবস্থায় লোক-চক্ষুর অগোচরে তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্ব্বদা ধর্ম্মসংগ্রাম চলিতেছিল। কোন্ আদর্শ তাঁহার জীবনে জয়যুক্ত হইবে, তাহা তখনও ঠিক হয় নাই। কোন পথে তিনি চলিবেন, তাহা কেহ জানিত না। তজ্জন্য তাঁহাকে লোকনিন্দাও সহিতে হইয়াছিল। লোকে বলিত তিনি গ্রামে যাইয়া হিন্দু ও সহরে আসিয়া ব্রাহ্ম হন। এই দোলায়মান অবস্থার দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—

সুরধুনীবালা নামে তাঁহার এক প্রিয় কন্যা ছিল। জলে ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ব্রাহ্মমতে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিলেন। তদুপলক্ষে কোন হিন্দু-অনুষ্ঠান হয় নাই। অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আমার মনে হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মেই তাঁহার সরল বিশ্বাস। কারণ এই শোকের সময় কেহ অসরলভাবে কার্য্য করিতে পারে না। এই কথা ভাবিয়া, পরের দিন আমি তাঁহাকে এক পত্র লিখিলাম। তাহাতে লেখা হইয়াছিল যে শোকের অবস্থাতে তিনি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সরল বিশ্বাসের পরিচায়ক। যদি তাহাই হয়, যদি ব্রাহ্মধর্ম্মেই তাঁহার সরল বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী চিন্তা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার কথা তাঁহার হৃদয়ে কতদূর স্পর্শ করিয়াছিল জানি না, কিন্তু তখন তিনি তাহা কার্য্যের পরিণত করিতে পারেন নাই। ঘটনাক্রমে এই পত্রের কথাটী বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এক উকীলবন্ধু তাহাতে আমাকে বলিয়াছিলেন, "যাত্রামোহনবাবু পাকা উকীল, আপনি তাহা জানেন না বলিয়া, তাঁহাকে ব্রাহ্ম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" বন্ধুর এই উপহাস আমাকে নীরবেই সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু, যাত্রামোহনবাবুর পরবর্ত্তী জীবন এই মন্তব্যের সমর্থন করে নাই। তিনি বাস্তবিকই "পাকা উকীল" ছিলেন। কাহারও কথায় বা কোন প্রলোভনে তিনি ব্রাহ্ম হন নাই; কিন্তু ভগবানের কৃপায়, উপযুক্ত সময়ে, তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে তিনি তাঁহার বিশ্বাসের সরল পথ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাইলাম, ভগবানের কৃপায় "পাকা উকীলের" ও হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়; তাঁহারাও ধর্ম্মের সরল পথে চলিয়া ব্রহ্মকৃপালাভ করিতে পারেন। ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিশ্বাসের দোলায়মান অবস্থাতে আরও কিছুদিন গেল।

কয়েক বৎসর এইরূপে গত হইলে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি হিন্দুমতে এবং ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। তাহাতে দুএকজন ব্রাহ্মবন্ধু তাঁহার বাড়ীতে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই এবং একজন তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, যে যখন তাঁহার ধর্ম্মমতের স্থিরতা নাই, তখন তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন না। এই ব্যবহারেও তিনি হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছু কাল পরে, একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—"হরিশবাবু, আপনারাও আমাকে ঘৃণা করেন"। তাঁহার ন্যায় পদস্থ এবং সম্মানিত ব্যক্তির মুখে এমন কথা শুনিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কেন এমন কথা বলিতেছেন?" তিনি বলিলেন "আমি যে, হিন্দু!" আমি বলিলাম "হিন্দুকে আমি কি ঘৃণা করি? আমার পিতা হিন্দু ছিলেন, আমার পিতামহ হিন্দু ছিলেন। আমি কি তাঁহাদিগকে ঘৃণা করি। আমিও বহুদিন হিন্দু ছিলাম, আমি কি আমাকেও ঘৃণা করি? কখনও না। তবে একথা মনে হয় যে যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তাঁহার তাহাই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-জীবনে বিশ্বাসের সরল পথই শ্রেয়ঃ।" আমার কথা হয়ত তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। কারণ, তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতাতেও তাহার সায় পাইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ধর্ম্মবিশ্বাসের অব্যবস্থিত অবস্থাতে থাকিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে যেমন প্রাণের ভিতরে শান্তি পাওয়া যায় না, তেমনই বাহিরে লোকেরও শ্রদ্ধালাভ করিতে পারা যায় না। আরও কিছুকাল আত্মচিন্তা এবং আত্ম-পরীক্ষা করিয়া অবশেষে তিনি, প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিরাকার চিন্ময় ঈশ্বরের পূজা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি নীরবে আত্মচিন্তা করিয়াই ধর্ম্মজীবনের পথ ঠিক করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তাহার পূর্ব্বদিনেও কেহ তাহা জানিত না। ১৯০৭ ইংরাজীর জানুয়ারী মাস, মাঘোৎসবের দিন, ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালে উপাসনা শেষ হইলে, তিনি আমাকে ও শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র সেনকে তাহার গৃহের এক নির্জ্জনকক্ষে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আজ আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব।" সেই দিন রাত্রিতে তিনি বহুলোকের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। প্রায় ৫৮ বৎসরের বৃদ্ধ, এইরূপে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রচুর নৈতিক সাহস ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন। তৎপর ১২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আমরা তাঁহার সরল বিশ্বাস, ঐকান্তিক ভক্তি এবং অবিচলিত নিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি উপাসনাতে শ্রদ্ধাবান ও অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান ছিলেন। বিশবৎসর সংগ্রামের পর, তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের সে পথ তিনি দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

হৃদয়ের মহত্ব।—যাত্রামোহনবাবুর সংস্পর্শে যে কেহ আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন। তিনি ধনে, মানে, জ্ঞানে অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার অহঙ্কার কখনও ছিল না। তাঁহার সামাজিক ব্যবহার খুব অমায়িক ছিল। দরিদ্রের গৃহে তিনি যাইতেন, তাহার খবর নিতেন,

বিপদে সাহায্য করিতেন এবং কখনও দরিদ্র বলিয়া কাহারও প্রতি অবহেলা বা উদাসীনতা প্রকাশ করিতেন না। সকলেই তাঁহার ভালবাসায় এবং সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল। ধর্ম্ম জীবনের দীনতা স্বীকার করা তাঁহার আর একটী প্রবল গুণ ছিল। ধর্ম্মের অহঙ্কার অনেকেরই থাকে। তাঁহার তাহা কখনও ছিল না। ধর্ম্ম সাধনে তিনি নিজেকে খুব দীন বলিয়া মনে করিতেন এবং বলিতেন। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিতে ও উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেও তিনি অগ্রসর হইতেন না। তিনি নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করিতেন। অন্যের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন, ধর্ম্ম আলোচনাতে যোগ দিতেন এবং ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের সাহায্য করিতে তিনি সকল সময়ে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উদার ছিল। কাহাকেও কোন কথার কূট অর্থ করিতে দেখিলে তিনি বলিতেন "তোমরা কেন এমন মনে কর, তাহার মনে হয়ত ভাল ভাব ছিল। ভাল ভাবেই কথাটী গ্রহণ করনা কেন? না জানিয়া কাহাকেও দোষী করা ভাল নয়।" একবার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি লইয়া তাঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপী ভয়ঙ্কর মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। তিনি যখন শুনিলেন, বিপক্ষ পীড়িত, তখন তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তিনি দেখা করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। দেখিলাম, বন্ধুভাবে তিনি তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেন এবং পীড়িত অবস্থায় বাস করিবার জন্য তাঁহাকে নিজের এক খানা ঘর দিতে প্রস্তাব করিলেন। অবশ্যই তাঁহার বিপক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শুনিয়াছি, মোকর্দ্দমায় পরাজিত হইয়া বিপন্ন হইলেও, তিনি তাঁহাদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এরূপ উদারতা অল্পই দেখা যায়।

অর্থ উপার্জ্জন অনেকেই করিতে জানে, কিন্তু অর্থের ব্যবহার করিতে সকলে জানে না। অর্থ ব্যবহার দ্বারা লোকের জীবনও চরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাত্রামোহনবাবু যেমন বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমন অর্থের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। তিনি দেশের কল্যাণের জন্য অনেক অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের সাহায্যেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কত জন তাঁহার অর্থে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, কত পরিবার তাঁহার সাহায্যে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। সাময়িক সাহায্য ত অনেকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরের জন্য যেমন তিনি মুক্তহস্তে অর্থের সদ্ব্যয় করিতেন, নিজের পরিবার পরিজনের জন্যও অর্থ ব্যয়ে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাঁহার সন্তানদের শিক্ষা দানের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার দুই পুত্রকে ইংলণ্ডে শিক্ষা দান করিবার জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। টাকার কথা কখনও চিন্তা করিতেন না। যাহাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতেন। এদেশেও পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা পরিবার পরিজনের সুখ সুবিধা এবং সন্তানগণের সুশিক্ষা দানের জন্য অর্থ ব্যয় করাকে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন।

বাবু যাত্রামোহন সেন সৌভাগ্যশালী

পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনে শোক দুঃখের অভাব ছিল না। অসময়ে স্ত্রীবিয়োগ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যার অকাল মৃত্যুতে, তাঁহার হৃদয়ে শোকের কঠোর আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার আর এক পুত্র শ্রীমান্ নীরেন্দ্রমোহন সেন ইংলণ্ডের ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। ইহাঁর শিক্ষার জন্য ৩০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া তিনি বলিতেন। এই বহু ব্যয় সাধ্য শিক্ষা সমাপন করিয়া,সন্তানকে আর দেশে ফিরিয়া আসিতে তিনি দেখিলেন না। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে আর এক কন্যা কুমারী নলিনীবালা পরলোকে চলিয়া যান। ইনি যখন বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন, হঠাৎ কলিকাতা নগরীতে দেহ ত্যাগ করেন। ইহাঁদের শোক বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার মস্তকে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল। তিনি এত কঠোর শোকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও ধীর-ভাবে জীবনের পথে চলিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধীর শান্ত মন তাহা সহ্য করিলেও, তাঁহার রুগ্ন ভগ্ন দেহ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। অচিরেই তিনি শয্যাশায়ী হইলেন এবং পৃথিবীর সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া রোগ শোকের রাজ্য অতিক্রম করিয়া পরম পিতার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। সন্তানহারা জননীর ন্যায় ভাগ্য-হীন চট্টগ্রাম আজ তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি এই মহাপুরুষের মহত্বের কাহিনী শেষ করিব। সে অতি পুরাতন কথা। অনেকেই তাহা জানেন না। ২৫ বৎসরের অধিক হইয়াছে, এই সহরের এক ব্রাহ্ম যুবক অতি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৮ দিনের এক শিশু পুত্র রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী হঠাৎ পরলোক গমন করেন। শিশুর প্রতিপালনের ভার লইবার জন্য তাঁহার গৃহে আর কেহই ছিল না। কোনও আত্মীয়স্বজন আসিয়াও তাহার ভার গ্রহণ করিলেন না। বেতনভোগী ধাত্রী ও পাওয়া গেল না। শোকে অভি-ভূত, বিপদে নিষ্পেষিত এবং সহায় সম্বল বিহীন যুবক কি করিবেন, কোথায় যাইবেন স্থির করিতে অসমর্থ, এমন সময় যাত্রামোহন-বাবু তাঁহার পর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতৃহীন শিশুর প্রতিপালনের কি ব্যবস্থা হইয়াছে। যখন শুনিলেন, কোন ব্যবস্থাই হয় নাই, বেতন দিয়া ধাত্রীও পাওয়া যায় নাই, তখন তিনি শিশুকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যুবক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি শিশুকে কি করিবেন। তিনি উত্তর করিলেন "কেন, সে আমার স্ত্রীর দুধ খাইবে এবং আমার গৃহে প্রতিপালিত হইবে। আপনি কি বলেন ?" করুণার্দ্র হৃদয়ে, সাশ্রু নয়নে যুবক বলিলেন "অর্থের বিনিময়ে কোন ছোটলোকও তাহাকে দুধ দিতে প্রস্তুত নয়, আপনি যদি দয়া করিয়া তাহাকে আপনার সন্তানের, দুগ্ধ-ভাগ করিয়া দেন, আমি আর কি বলিতে পারি।" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি ছোট লোক নই, আমি দিতে পারিব।" তিনি শিশুটীকে লইয়া গেলেন এবং অনেক দিন প্রতিপালন করিলেন।

পরলোকে যদি স্নেহের বন্ধন থাকে, যদি মিলনের সুযোগ থাকে, তবে সেই শিশু আজ এই মহাপুরুষ এবং তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কারণ সেই মাতৃহীন শিশুও আজ পৃথিবীতে নাই; জননীর ন্যায় স্তন্য দান করিবার জন্য যে মহিয়সী নারী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তিনিও নাই এবং যাঁহার প্রভাবে, করুণার এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, আজি তিনিও স্বর্গে। কেবল বিপন্ন যুবক, বর্তমান প্রবন্ধের বৃদ্ধ লেখক এখনও পৃথিবীতে আছেন, এই স্মৃতি সভাতে সেই দেব-চরিত্র মহাপুরুষের দেবত্বের সাক্ষী দিবার জন্য; আর আছে তাঁহার হৃদয়ে করুণার ছাপ, যাহা আজ উজ্জ্বলতর হইয়াছে এবং চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত করিতেছে। আজ আমি আমার তপ্ত অশ্রুধারা সহিত আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা এই মহাপুরুষের এবং তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেছি।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

অবিশ্বাসী বন্ধু।

(W. Hood)

একদিন চোখে চোখে হয়েছিল দেখা
ওহে বন্ধু,মুখে মুখে হয়েছিল কথা;
অন্তরে ছিল না তার বিন্দু লেখা-জোখা,
ছিলনা একান্ত হাসি স্তব্ধ নীরবতা।
আঁখির মিলন নহে চোখে দেখা-দেখি,
কোলাকুলি নহে বন্ধু, প্রেম-আলিঙ্গন,
ভালবাসা নহে শুধু হাসি মাখামাখি,
প্রেম নহে পরস্পরে অশ্রু বিমোচন।
যা'হবার হয়ে গেছে সুদূর অতীতে,
মোদের কখনো যেন নাই পরিচয়।
এমন অনেক হয় দেখা-শুনা পথে,
আবার এমন কত ছাড়াছাড়ি হয়।
বিদায়—বিদায় বন্ধু,জনমের মত,
চোখে দেখা,মুখে কথা—তা'ও নাহি হবে
জন্মশোধ তব প্রেম হইয়াছে গত,
মম প্রাণে তব স্মৃতি তিলেক না রবে।
বৃথা কথা বৃথা গাথা ব্যর্থ প্রণয়ের,
মুখে মুখে এতদিন যে ভালবেসেছি,
সব ভুলে যাও বন্ধু, হইয়াছে ঢের,
সে সকল ফিরে দিতে আজ যে এসেছি।
পারিতাম থাকিবারে আগের মতন,
তোমার অবজ্ঞা-হাসি ভুলিতাম যদি;
শত সান্ত্বনায় নহে সে ব্যথা মোচন,
অন্তর মাঝারে জ্বালা দগ্ধে নিরবধি।
মুখের আলাপ ছিল, তাও হল দূর,
যাও হে চলিয়া যাও, যথা মনে লয়;
আমিও যাইব চলি, কোন্ সে সুদূর,
তব সনে আর যেন দেখা নাহি হয়।
নাহি চাই স্বার্থভরা মিথ্যা ভালবাসা,
জন্মশোধ ঘুচে গেল তব প্রেম-আশা।

সুরবেশ।

সূর্য্যকুণ্ড-লিপি।

প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে গয়া জেলা বিশেষ প্রখ্যাত, তাহা আমি পূর্ব্বেই বহুবার বলিয়াছি। গয়া নগরটিও বৌদ্ধ এবং হিন্দু-ধর্ম্মের লীলা ভূমি, তাহাও আমি পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। গয়া নগর সম্বন্ধে ডাঃ কানিংহাম ব্লক, ফ্লীট, রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রভৃতি মনিষীগণ আমূল আলোচনা করিতে ক্রটী করেন নাই। কৃষ্ণদ্বারিকা, প্রপিতামহেশ্বর গায়ত্রীঘাট, সূর্য্যকুণ্ড, নৃসিংহদেবের মন্দির প্রভৃতি বহু স্থানে প্রাচীন প্রস্তর লিপি আঁটা আছে তাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ যথা স্থানে বিবৃত করিয়াছি। সূর্য্যকুণ্ডের প্রস্তর লিপি গুলির কথা অত্রস্থানে বলিব। সূর্য্যকুণ্ড লিপিতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ১৮১৯ লেখা আছে; তাহা হইলে ইহা ১৮১৯—৫৪৩ = অর্থাৎ ১২৭৬ খ্রীঃ হয়। কিন্তু ৺ বাপুদেব শাস্ত্রী ও চীন দেশীয় পঞ্জিকাদির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ডাঃ কানিংহ্যাম বলেন যে ইহা ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। সূর্য্যকুণ্ড পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীর দেওয়া আছে। ইহা টিকারী রাজ ৺ মিত্রজীৎ সিংহের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার পশ্চিম পাড়ে একটি মন্দির আছে। প্রাচীরটি ২৯২ফিট × ১৫৬ফিট বেড়ে হইবে। সূর্য্যকুণ্ডে যে ২।৩টি প্রস্তর ফলক আছে তাহার লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গয়া সূর্য্যকুণ্ডস্থিত বুদ্ধ নির্ব্বাণের লিপি

ওঁ নমো বুদ্ধায়শুদ্ধায় নমো ধর্ম্মায় শম্মর্ণে নমঃ সঙ্ঘায় সিংহায় লঙ্ঘনায়ভবাম্বুধেঃ॥ অগাধগুণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্ব-সৌখ্যেরলঙ্কৃতঃ। সুবেশশ্চক্রমাদেশো বসেৎ পূর্ব্ব প্রদেশতঃ ॥২ তত্রাভবন্নরপতিজ্জর্য়তুঙ্গ সিংহঃ শ্রীমানরাতি নৃপহস্তি ঘটৈকসিংহঃ অস্ত্রেচ শাস্ত্র নিচয়ে চ বিচক্ষণাত্মা দাক্ষিন্য লক্ষণ-গণৈঃ পরিলক্ষিতশ্চ ॥৩ বাহুতোপিপ্রদানং সমধিকমখিলে যস্য লোকে সমন্তাৎ বৈলক্ষ্যাংকল্প বৃক্ষঃ কচিদগমদিবপ্রেক্ষ্য পৃথ্বীমুপেক্ষ্য। তৈত্রাদ্ খড়্গ প্রতাপাত্রি জগতিবিদিতোপ্যুত্তমো ভূপতীনাং তৈস্তৈঃ শ্লাঘৈগুর্ণোঘৈরনঘতর তনুর্যশ্চ নোতুল্য-শকাঃ ॥৪ শ্রীকামদেব সিংহোভূৎস্বপুর্ত্তাস্য সম্মিতঃ। যোদান মার্গনবর্গেভ্যোহেলয়া-হস্তিনোহয়ান্ ॥৫ কামঃ কাম্যতয়া নমস্ত-বসন্তো দেবঃ প্রতাপোদয়া দাসীৎসিংহ সমঃ পরাক্রমতয়া ধর্ম্মাবতারশ্চিরং। অস্মাদেব হি কারণ। ত্রিভুবনে যঃ খ্যাতকীর্ত্তির্মহা-সায়াম্নায়য় ধারিতেন ধরনীপালঃ কলানা-ম্নিধিঃ ॥৬ স চচক্রনন্দ কুলজো জগতো-হিতৈষী লক্ষ্মীপতিঃ ক্ষিতিপতিঃ পুরুষোত্তমশ্চ। নারায়ণঃ প্রকট এষতনুজঃ শ্রীমাম্বভূব পুরুষোত্তম সিংহ নামা ॥৭ মর্য্যাদা পরি-পালিত ক্ষিতিতলো গাধোপ্পিপাথোনিধিঃ-সাম্যং যেন চ নাপ্নুয়াৎপ্রবিস্তুবাতেজস্বিনা জাড়াবান্। সিংহোদীন মৃগাঙ্ককোপ্য করুণশ্চন্দ্রঃ কলঙ্কাঙ্কিতো যেনাপ্যুত্তম বিক্র-মেণ যশসা কান্তেনতুল্যোনতু ॥৮ সোহয়ং দ্রষ্টুমিবোত্তমং জিনপুরং যাতস্য পুণ্যাত্ম-নোরস্য শ্রীহুহিতঃ সুতস্য চ তথা মানিক্যসিংহ-স্যহি। পুণ্যোদ্দেশ বশাচ্চকার রুচিরাং শৌদ্ধোদনেঃ শ্রদ্ধয়া শ্রীমদগন্ধ কুটীমিমামিব-কুটীং মোক্ষস্য সৌখ্যস্য চ ॥৯ অস্যাঃ সন্তত-কান্তি শান্তনরকধ্বান্তা কৃতেঃ কান্তিবান্। শিক্ষা কোটি বিচক্ষণঃ স্বচরিতো দ্বিতীয়

নিষ্ঠাপরঃ পৃথিমণ্ডলমণ্ডনস্য চক্রমাচক্র স্বরাজ্যো গুরুবিখ্যাতঃ খলুধর্ম্ম রক্ষিত যতিঃ কর্ম্মান্তর নির্ম্মমে ॥১০ প্রখ্যাতং হি সপাদ লক্ষ শিখরিক্ষমাপাল চূড়ামণিং শীলৈঃ শ্রীমদ শোকচল্লমপি যোনস্থা বিনীয়স্বয়ং অত্রচ্ছিন্দ-নরেন্দ্রমিন্দ্র সদৃশং ভ্রষ্টৈমুনেঃ শাসনেস্থিতো্যা-ছার নসৌ চকার পরমাশ্চর্য্যং কলৌদুর্জ্জয়ে ॥১১ *পূজাঃ পূজাতমস্য পঞ্চমগতৈ বাদৈস্থ সন্ধ্যং সদা রম্ভাসন্নিভ ভাবিনীভিরভিতো চেটীভিরত্যদ্ভুতং নৃত্যাস্তীভিরনঙ্গনঙ্গিমগতৈঃ গীতাদি রঙ্গৈর্ক্রিয়া যস্মাৎ সন্তি হি শাসনে ভগবতঃ সংকার বিস্ফারিতাঃ। ১২ দিব্যা-হার বিসারি সত্র বহনাস্তৈরেরম্যাঃ প্রপাঃ প্রায়ঃ পণ্ডিতবৃন্দমণ্ডিতমিদঙ্কাথস্তিতং শাসনং অভ্রান্তং নর কর্ম্ম সর্ব্বত হ তঃ শ্রীচক্র-বাড়ে যতো বৃন্দানাং বিবিধানি সন্তি মহৎ স্কৃত্যাস্থি হোনিতাশঃ॥১৩ স্কন্দঃ শ্রীরাম-দেবোচ্যুত বদতি মত্তোম (ন) শিবংশাবতং সঃ খ্যাতঃ শ্রীজীব নাগস্তদসুগুশিবরস্তস্য পুত্রঃ পবিত্রঃ। পূত্যং শস্তাং প্রশস্তিং দ্রুত তরমকরোৎ স্বল্পশস্তস্তস্বঃ কোহপি শ্রীমঞ্জনন্দো মিত্রকুল জলধো বিন্দুরানন্দ কন্দঃ ॥১৪ অলিখল্লেখকাধ্যক্ষ ইন্দ্রনন্দীতি সুন্দরঃ। রামেণশিল্পিনোৎকীর্ণ মভিরামেণ বর্ণতঃ॥১৫ ভগবতি পরিনির্বৃতে সম্বৎ ১৮১৩ কার্ত্তিক বদি ১ বুধে॥*

এই লিপি সম্বন্ধে পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী বহু গবেষণাপূর্ণ বিবরণ ও সমালোচনী প্রবন্ধ দশমভাগ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুরী পত্রিকার ৭৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ফিরোজ সাহের লিপি।

ফিরোজ সাহের লিপি :—ইহা কুল-চন্দ্রের দ্বারা দক্ষিণার্ক বা দক্ষিণাদিত্য সূর্য্যের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ইহা সূর্য্য-কুণ্ডে অবস্থিত আছে। ইহা সূর্য্যকুণ্ডের মধ্যস্থিত তিনটী শিলালিপির মধ্যে অন্যতম একটি হইতেছে এবং দেবনাগর সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত। ইহার বিষয় গটিঙ্গেনের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ কীলহর্ণ, ডাঃ ভগবানলাল ইন্দ্রজী, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনিষীগণ সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। ইহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওঁ গণপতয়ে নমঃ॥ অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধ্যর্থং পূজিতো যঃ সুরৈরপি। সর্ব্ববিঘ্ন-গণহরস্তু তস্মৈ গণাধিপতয়ে নমঃ॥ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। প্রসাদতো যস্য ধনাস্কাটৈর্বিযুক্ত নাথং কিলচক্রবাকী। অপেত শোকা লভতে দিনাদৌ সদা স বঃ পাতু সহস্র ভানুঃ॥ অসীম রাজ্যে নৃপ বিক্রমার্কে গতে গ্রহেযু গ্ম যুগেন্দুকালে। ঢিল্লীপতি শ্রীপিয়রোজ সাহেস্তুবং ম্যামাসতি বৈরিদাহে॥ ভয়েতি বিস্তাম্বুভুবা পৃথিব্যাং যদাশ্রয়া ব্রহ্মপুরী-মনোজ্ঞা নিবাস হেতোঃ খলু নির্জ্জরাণাম পোঢ়বিধ্বংসপথীন রানাং॥ খ্যাতঃ ক্ষিতৌ

---

* এই সম্পূর্ণ লিপিটি Ind. Antiq. Vol. x ৩৪২-৩৪৭ পৃষ্ঠায় এবং মদ্বন্ধু বাবু রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার ৫ ভাগ ৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

* Arch. Sur. Ind. Vol. III, P. 128
„ X „ 341
Ind. Ant. Vol XX, 312—315.
Arch. Sur. Ind. Vol III P. 129
„ XI „ 185
„ VIII „ 75
„ IV „ 366
Alberuni's India „ II. „ 314

ক্ষত্রিয় বীরধীনঃ শ্রীব্যাঘ্ররাজাখ্য (যাঙ) শূরঃ॥ ডালেতি নাম্না দিশি পশ্চিমা যাম-প্রান্ত রাজন্যগণাশ্রিতায়াং॥ তস্যান্বয়ে জাত উদার কীর্ত্তিঃ শ্রীরঙ্গপদ্দার্চ্চন পুণ্যমূর্ত্তিঃ। পূজ্যঃ সদামান ভৃতাং যশস্বী শ্রীহেমরাজঃ সদয়ো বিবেকী॥ তস্যাত্মজো নীতি বিচার দক্ষঃ সদৈব পুরাণাদি জনাভিলাষঃ। গয়াধিকারী সুকৃতী মনীষী কুলাবলম্বী কুলচন্দ্র এষঃ॥ গয়েতিদ্বার কপাটভেদী অমোক্ষ ভাজামপি মোক্ষদায়ী। সদাক্ষণার্কস্য বিশুদ্ধ বুদ্ধিশ্চকার কীর্ত্তিং বহু কীর্ত্তিনাথঃ॥ সুরাল যং য কুরুতে প্রশস্তং চিরায় ভুংক্তং মুখং নরেশঃ। সমং স দৈব ত্রিদশাংঙ্গনাভিরপাপ দেহো দিবি মোদতে সঃ॥ করোতু কল্যাণ মলং দিনেশশ্চিরং সবৈয়াগ্রন নৃপস্য বংশে। হতং তমোযেন সহস্র ধাম্না কৃতা প্রশস্তিঃ শিরিসেন নাম্না॥ সরল লিখনং যথা॥ পরম-ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্য দেব নৃপতেরতীতাব্দে সম্বৎ ১৪২৯ মাঘ কৃষ্ণাত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শনিবাসরান্বিতায়াং পুনরসীম পৌরুষেত্যাদি সকল বিরুদরাজি বিরাজমান পাশ্চাত্য সুরত্রাণ (ত্রাণ) শ্রীপিয়রোজ * সাহ-রাজ্যে। শ্রীমদুদণ্ডপুর দেশে। দক্ষিণাগার সম্বন্ধি। শ্রীমদ্ গয়াক্ষেত্রে পরম বৈষ্ণব ক্ষত্রিয়ঠাকুর শ্রীডালা পৌত্রেণ ঠাকুর শ্রীহেমরাজ পুত্রেণ ব্যাঘ্ররাজ পদ্ধতি পালিনা ঠাকুর শ্রীকুলচন্দ্র কেন গুপ্তী (ষ্ঠী) ত গয়াধিকারেণ পুণ্যবতা সকল পুণ্যাভি বৃদ্ধয়ে মাতৃ পিত্রোরাত্মনশ্চ শ্রীমদ্ ভট্টারক শ্রী দক্ষিণাদিত্যস্য পতিতা কীর্ত্তিরুদ্ধৃতা॥ লিখিত মিদং গয়া শাসনিকেন ঠ (ঠাকুর) শ্রীকরার্ণসেনস্য সুনা শ্রীমতা শ্রী সেনেতোত॥ সূত্রধারোহস্য হরিদাস নামা॥ শুভমস্তু সর্ব্বজগতঃ পরহিতনিরতা ভবন্তু ভূত গণাঃ। দোষাঃ প্রযান্তু নাশাং সর্ব্বত্র সুখী ভবতুলোকঃ। অর্থাঃ পাদবজোপমা গিরি নদী বেগোপমাং যৌবনাং মানুষ্যং জললোল বিন্দু চপলং ফেনোপমং জীবিতং। ধর্ম্মময়ো ন করোতি নিশ্চল মতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং পশ্চাত্তাপহতোজরা পরিণতঃ শোকাগ্নিনাদহ্যোতে সিদ্ধিয়ত্র কার্য্যে সতামিতি॥

এই লিপিসম্বন্ধে পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী বলেন "what is stated before in verse is repeated in a plainer and more business-like manner in prose in lines 6 to 8. Here we are told that on a certain date which will be given below, in the reign of the western Suitan Piyaroja Shaha, conspicuous by his *birudas* Aspimapaurusha (অসীম পৌরুষ) and so forth, the Thacur Kulachandaka who held the post of Governor of Gaya, who followed in the footstep of the prince Vyaghra, and was the son of the Thakoora Hemraja and a son's son of the Ksha-

* প্রাচীন উদ্দণ্ডপুরের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কোন কোন প্রত্নবিদ্ বর্ত্তমান বিহার ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন প্রদেশকে উদ্দণ্ডপুরের স্থান বলিয়া নিরূপনকরেন,এবং ডাঃ ক্যানিংহ্যাম প্রমুখমনিষীগণ গয়া হইতে ১৩।১৪ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তি বিষ্ণুপুর টাঁড়োয়া হইবে। তারানাথেরও ঐ মত। (Ind. Ant vol. XX 312-15.) তারানাথকৃত মগধেরপাল রাজগণের ইতিহাস ও গয়ার কতকগুলি বিশিষ্ট ২ স্থানের শিলালিপির বিষয় আমি যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

triya, the Thakura Daua, a descendant and devout worshipper of Vishnu at the sacred place of Gaya, belonging to Dakshinagara in the country of Udandapur, restored the holy temple of Dakshinaditya which had fallen into despair. The prose portion states besides that this inscription was written by the শাম্বনিক of Gaya. শ্রীসেন (whom I take to be the person *Sirisena* above) a son of the Kayestha, the Thakur Karnasena; and that the architect employed on the repair of the temple was Haridasa. The localities mentioned in the inscription are beside Dhili (i. e. Delhi), Gaya, Dakshiagara and the country of Uddanpur. Of these Delhi and Gaya are well known; the word Dakshinagara denotes very probably the district in which Gaya is sitnate. Udandapur or more correctly spelt Uddandapura, should perhaps have been Otantapur of Taranath's account of the Magadha kings. Sir A. Cunnigham was of opinion that this town might be the present Tandwa or Bishnupur Tandwa about 15 miles east of Gaya. Later, however, he has adopted Mr. Beglar's suggestion that, upto the time of Muhammaden conquest, Uddandapur was the proper name of the town of Behar, in the Patna District of Bengal, which is said to be still * known as Daud Bihar".

কাপ্তেন কীটোর মতে ইন্দ্রশীলাগিরি বিহারি নগরের আসন্ন গিরিয়কগ্রামের সন্নিকট পর্ব্বতরাজি হইতেছে। তাহার অনতিদূরে নালন্দ সংঘারাম অবস্থিত ছিল। নালন্দ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে বৌদ্ধ যুগ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ডাঃ আলেকজাণ্ডর কানিঙ্গহাম (Dr. Alexander Cunningham C. S. I.) তাঁহার প্রথম ভাগ আর্কিওলজিকাল সার্ভে রিপোর্টে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি গবেষণাপূর্ণ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার।

* Ind, Antq. Vol XX, p 312–15
Arch. Surv. Ind. Vol III, p 129
" " " V, 41 p 75.

গান।

১

অরূপ-রাজের রূপ-সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব্ দে!
গোপন প্রাণের তৃষটুকু
মিটিয়ে নে রে মিটিয়ে নে!
নাচিস্ নে আর ঢেউএর তালে তালে,
ভাবিস্ নে রে, লিখন কি তোর ভালে,—
শুনিস্ নে রে ওরে চপল!
বল্‌ছে কিবা কে!—
অরূপ-রাজের রূপ-সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব্ দে!

২

তরুণ উষা হিরণ-ভূষা
ভরা পাখীর গীতে!
সুধার ধারা উছলে পড়ে
ফুলের হাসিটীতে!
সুনীল নভে অনিল তুলে লহর কত শত,
শারদ-রাতে জোছনা ঝরে
পাগ্‌লা ঝোরা' মত,—
সকল কিছুর মাঝে, ওরে!
লুকিয়ে আছে যে!—
(সেই) অরূপ-রাজের রূপ-সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব্ দে!

৩

আপনা টুকু হারিয়ে ফেল্
চির-আপন পদে!
ভুলিস্ নে রে মজিস্ নেরে
বিফল-মোহ-মদে!
হবেই হবে ডুব্‌তে যখন তোর,
করিস্ কেন মধুর নিশি ভোর,—
হারাস্ নে রে এমন সুদিন
কূলের পানে চেয়ে!
অরূপ-রাজের রূপ-সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব দে!

৪

কূলে বসি গাঁথ্‌বি কত
জলের কলরোলে!—
অতল-তলে হারিয়ে যারে
সাগর-রাজের কোলে!
কত জনম যাচ্ছে চলে এমনি করে,
কিসের মায়ায় আছিস্ তুই আশা ভরে,—
ওরে বিভল! ভরসা তোর
টুট্‌ছে পদে পদে!
অরূপ-রাজের রূপ-সাগরে
ডুব্ দেরে মন! ডুব্ দে!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

মহাভারত মঞ্জরী(১)।

(মহাভারত অবলম্বনে লিখিত)

আদিপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়—সূচনা।

"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"— মহর্ষি বেদব্যাস আবিষ্কৃত অত্যুজ্জ্বল আলোক। তিনি তাহা সহ কত পুরুষ ও রমণীকে ভারতে পাঠাইয়া-ছেন। জীবন-পথে চলিতে চলিতে পথিক যখন ঘোর অন্ধকার রজনীতে দুর্দ্দান্ত ষড় সহোদর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সেই পুরুষ ও রমণীগণ সেই আলোক দ্বারা পথ হারা, দিক্‌হারা পথিককে পথ দেখাইয়া দেয়। এস কয়জনে, একবার মানস-চক্ষে সে সকল দেখি— যদি আমরাও পথ পাই।

একদিন ভারতে কত তপোবন ছিল! তথায় কত মুনিঋষি, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সুখে ও স্মিতবদনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের আলোচনায় জীবন যাপন করিতেন। নৈমিষারণ্যেও এইরূপ একটী পবিত্র তপো-বন ছিল (১)। তথায় বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ মহর্ষি শৌনক দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা দেখিবার জন্য কত মুনি আসিতেছেন। একদিন সূতকুলের (২) মহর্ষি সৌতি আসিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাম উগ্রশ্রবা। সকলে তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি সুখে উপবিষ্ট হইলে, সকলে তাঁহার নিকট আশ্চর্য্য কথা শুনিতে চাহিলেন। তিনি মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন —

"এই ভারতে এক ধীবরের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল(৩) তাহার নাম মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী। তাহার কুমারী কালে একটী পুত্র হয়। জননী সেই শিশুকে তাহার পিতা

(১) বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌর উত্তর পশ্চিম দিকে নৈমিষারণ্য ছিল।

(২) ক্ষত্রিয় পিতা ব্রাহ্মণী মাতা। সংস্কৃত মহাভারত, বঙ্গবাসী আফিস হইতে মুদ্রিত, শকাব্দ ১৮৩০ সংস্করণ। অনুশাসন-পর্ব্ব ৪৮—১০

(৩) দাশ বা ধীবর কন্যা। উদ্‌যোগ পর্ব্ব ১৭০—১।

পরাশর ঋষির আশ্রমে পাঠাইয়াদেন। তাহার কৃষ্ণবর্ণ ও যমুনানদীর মধ্যে এক দ্বীপে জন্ম হয় বলিয়া, তাহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হয়। এই বালক কালে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। বেদ বিভাগ করিয়া "বেদব্যাস" উপাধি-ভূষিত হন।

"তিনিই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পর, তিন বৎসরের অকাতর পরিশ্রমে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন(৪)। তিনি তাহা তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন প্রভৃতিকে শিক্ষা দেন। রাজা জনমেজয় যখন সর্পযজ্ঞ করেন, তখন বৈশম্পায়ন এই মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি তথায় উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছিলাম। তাহাই আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি। তাহাপেক্ষা মনোহর ও আশ্চর্য্য কথা আর কোথায় পাইব?

"পুরাকালে এই দেশে ভরত নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি শকুন্তলা-দুষ্মন্তের পুত্র। তাঁহার নাম হইতেই এ দেশের নাম ভারতবর্ষ। তাঁহার বংশের, ভারতবংশের মহৎ বৃত্তান্ত এই মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত। এই নামের অন্য কারণও আছে। ইহা মহত্ত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষাও অধিক. সুতরাং মহত্ত্ব ও গুরুত্ব হেতুও ইহা মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ(৫) ইহা পঞ্চম বেদ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে লক্ষ শ্লোক আছে। বেদব্যাস, মহাভারতে ঈশ্বর, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও জ্ঞান, যোগ তপস্যা, বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ, দর্শন পুরাণ উপন্যাস ইতিহাস, অর্থ-রহস্য রাজনীতি সমাজনীতি, তীর্থ ভূগোল ভবিষ্যঃ, যুদ্ধবিদ্যা স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের সার প্রদান করিয়াছেন। তিনি অগাধ জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত পাইয়াছেন, তাহা মহাভারতে রাখিয়াছেন। তিনি ইহাতে পঞ্চপাণ্ডবের সত্যনিষ্ঠা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের দুর্ব্বৃত্তা বর্ণন করিয়াছেন(৬)। দেখাইয়াছেন—ধর্ম্মের পরিণাম উন্নতি আর অধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অধোগতি। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন বিপুলকায়া গঙ্গা যমুনা সম্মিলিত হইয়া, নির্ম্মল সলিল দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে করিতে সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছে, আর সমস্ত দেশ উর্ব্বর ও উন্নত করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে; মহাভারতেও যেমনি অনুপম কাব্যরস শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে, আর বহুবিধ জ্ঞান তাহার হৃদয় ও মন উচ্চ ও উদার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। কোকিলের কূজন শুনিয়া কাকের কর্কশ কলরব যেমন শুনিতে ইচ্ছা হয় না, তেমনি মহাভারতের পুণ্য কথা শ্রবণ

(৪) আদিপর্ব্ব ৬২—৪১।৪২।৫২ ॥১—৯৬।৯৭। যে দিন ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেন, সেই দিন কৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় জানিবেন, কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে" (শল্যপর্ব্ব ৬০—২২)। স্কন্দ পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে যুধিষ্ঠিরের কাল, কলির পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৭, পৃঃ ২৪৭)। কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী প্রণেতা কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, কুরুপাণ্ডবের জন্ম হয় (রাজতরঙ্গিনী, ১ম তরঙ্গ)। তাহা হইলে বেদব্যাস, কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব কলিযুগের লোক, মহাভারত কলিযুগে রচিত হয়, কলিযুগেরই বিবর বর্ণনায় পূর্ণ এবং কলিযুগেরই ধর্ম্মশাস্ত্র।

(৫) আদিপর্ব্ব ৬২—৩৯॥১—২৭২।২৭৩।২৭৪॥

(৬) আদিপর্ব্ব ১—১০০।১০১। পঞ্চপাণ্ডব যে সত্যপরায়ণ এবং দুর্য্যোধনেরা যে পাপাত্মা, তাহা মহাভারতের প্রথমেই আছে।

করিয়া, আর কিছুই শুনিতে ইচ্ছা হয় না। এই ইতিহাস-প্রদীপ সত্যই মোহরূপ তমোরাশি নাশ করিয়া অখিল ভুবনরূপ গৃহ উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে।"

এইরূপে সৌতি মহাভারত কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা মহাভারতের মহাবনে বিচরণ করিয়া যে ফুলটী, যে পত্রটী মাতৃ-পূজায় লাগিবে বুঝিয়াছি, তাহা অতি যত্নে চয়ন করিয়াছি। যাহা নানা স্থানে ছিল, তাহা একত্র সাজাইয়াছি। আর মনের বন হইতে দূর্ব্বাদল তুলিয়া তাহাকে সংযোগ করিয়া দিয়াছি। এইরূপে তাম্রপাত্র পূর্ণ করিয়া আনিয়াছি। এ দীনহীনের হস্তের পুষ্পপাত্র, পূজায় লাগিবে কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম।

সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। বর্ত্তমান দিল্লীর মধ্যস্থলে যমুনাতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে যে রমনীয় নগরী ছিল, তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গঙ্গাতীরে যে অতি সুন্দর, অতুলনীয় হস্তিনাপুর মহানগরী ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে (৭)। উভয়ই ভারতবক্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তথাপি তাহাদের ধুলিময় স্মৃতি আজও পর্যাটকের প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে। হস্তী নামক ভরত বংশীয় জনৈক মহারাজা সেই হস্তিনাপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বংশে কুরু এবং কুরুর বংশে শান্তনু নামে প্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনুর প্রথম রাণী গঙ্গাদেবীর গর্ভে ভীষ্মদেব ও দ্বিতীয় রাণী সত্যবতীর উদরে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। ভীষ্মদেব জ্যেষ্ঠ হইলেও পিতার মৃত্যুরপরে নিজে রাজা না হইয়া চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিলেন। অল্পদিনের পরেই তিনি যুদ্ধে নিহত হইলেন। তখন ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করিলেন। তিনিও অকালে পঞ্চত্ব পাইলেন। তৎপরে তাঁহার দুই রাণীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং দাসীর গর্ভে বিদুর উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা বেদব্যাস জনিত রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ সন্তান। ভীষ্মদেব তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে বেদাদি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যৌবনে উপনীত হইলেন (৮)। তখন ভীষ্মদেব ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারদেশের রাজা শকুনির ভগিনী গান্ধারীর সহিত বিবাহ দিলেন (৯)। গান্ধারী এতই পতিব্রতা ছিলেন যে যখন তিনি শুনিলেন, তাঁহার স্বামী জন্মান্ধ, তখন তিনি বস্ত্রধারা স্বীয় চক্ষুদ্বয় আবদ্ধ করিলেন, স্বেচ্ছায় অন্ধ হইলেন (১০)। স্বামী যে সুখে বঞ্চিত, সে সুখ তিনি কিরূপে ভোগ করিবেন ? পরে ভীষ্মদেব পাণ্ডুকে কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত পরিণীত করিলেন। কুন্তী কৃষ্ণের পিসী। মাদ্রী বাহ্লীক দেশের অন্তর্গত মদ্রনগরের অধিপতি শল্যের ভগিনী (১১)। তৎপরে ভীষ্মদেব রাজা দেব-

(৭) দিল্লী হইতে প্রায় ৬৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুরের আনুমানিক ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India, 1—123

(৮) আদিপর্ব্ব ১০৯ অধ্যায়।

(৯) গান্ধারকে এখন কান্দাহার বলে। তাহা আফগানিস্থানের মধ্যে।

(১০) আদিপর্ব্ব ১১০—১৪।

(১১) আদিপর্ব্ব ১১০—২৩। বাহ্লীক-

কের শূদ্রানীর গর্ভজাত কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ দিলেন (১২)। তাঁহারা সকলেই যুবক যুবতী। ভারতে তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না (১৩)। ভারতে তখনও বালখিল্যদলের আবির্ভাব হয় নাই।

ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও জন্মান্ধ, রাজ্য পাইতে পারেন না। এজন্য সকলে মিলিয়া পাণ্ডুকে রাজা করিলেন। তিনি শৌর্য্য বীর্য্যে দৃপ্ত হইলেন। বিদুর কৌরব বা কুরুবংশীয় ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা বলিয়া মহাভারতে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছেন (১৪)। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধবয়সেও বৃদ্ধ বিদুরকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে "ভাই ভাই" বলিয়া কত সমাদর করিয়াছেন (১৫)। অতি অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন পর্য্যন্ত তাঁহার চরণ যুগল বন্দনা করিয়াছেন (১৬)। পূর্ব্বে ভারতে বর্ত্তমানের ন্যায় জাতিভেদ ছিল না (১৭)। বিদুর মহাধর্ম্মপরায়ণ, বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বুদ্ধিতে মহাপ্রাজ্ঞ ও কুরুকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন (১৮)। পূর্ব্বে শিক্ষার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল (১৯)। বিদুর চরিত্র-গৌরবে সাধু ও সজ্জনগণেরও বরেণ্য ছিলেন।

রাজা পাণ্ডু অনেকদিন রাজ্য শাসন করিলেন। বহুদেশ জয় করিয়া বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। বিজিত দেশ হইতে বহু ধনরত্ন আনিয়া হস্তিনাপুরের কোষাগার পূর্ণ করিলেন। পরে দুই রাণীকে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে বনবিহার করিতে লাগিলেন। তথায় একদিন ঋষিরা বলিলেন—"এই দুই রাণীর গর্ভে নিষ্পাপ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে" (২০)।

কিছুদিন পরে ঋষিগণের কথা ফলিল। হিমালয় প্রদেশের এক পবিত্র তপোবনে কুন্তীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম বা বৃকোদর ও অর্জ্জুন বা ধনঞ্জয় এবং মাদ্রীর গর্ভে যমজ নকুল সহদেব,—পাণ্ডুরাজের এই পঞ্চ ক্ষেত্রজপুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা হিমালয়েই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এমন সময় পাণ্ডুরাজের মৃত্যু হইল। মাদ্রী তাঁহার অনুগমন করিলেন। কুন্তীদেবী এখন পঞ্চশিশু সন্তান লইয়া দুঃখের সাগরে ভাসিলেন।

ঋষিরা তাঁহাদিগকে হস্তিনায় লইয়া আসিলেন। এখন যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর রাজ্যের অধিকারী। কিন্তু তিনি বালক। কাজেই ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইলেও রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। বিদুর সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী (২১) তাঁহার নিম্নে সঞ্জয় সর্ব্বপ্রধান অমাত্য। সঞ্জয়, সূত

দেশ এখন বলুক নামে প্রসিদ্ধ। তাহা আফগানিস্থানের উত্তরে অবস্থিত।

(১২) আদিপর্ব্ব ১১৪—১২।

(১৩) এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'যৌবন বিবাহ' দ্রষ্টব্য।

(১৪) উদ্যোগপর্ব্ব, ৮৬—৭॥ বনপর্ব্ব, ৫। ২৫॥ আদিপর্ব্ব, ১০৬—২৮॥

(১৫) বনপর্ব্ব ষষ্ঠ অধ্যায়।

(১৬) বনপর্ব্ব, ২৫৬—৭৮।

(১৭) এ সম্বন্ধে এ গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে "জাতিভেদ" দ্রষ্টব্য।

(১৮) আদিপর্ব্ব ১০৯ অধ্যায়। সভাপর্ব্ব, ৭৩—১৫॥ ৪৯—৪৩॥ ৫০—১০।১১॥

(১৯) এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে "শিক্ষা" দ্রষ্টব্য।

(২০) আদিপর্ব্ব, ১২০—২৪। পঞ্চপাণ্ডব যে নিষ্পাপ তাহা এইরূপে মহাভারতের প্রথমেই বলা হইয়াছে।

(২১) সভাপর্ব্ব, ৪৯—৪৩॥ ৭৩—১৫॥

কুলোৎপন্ন, দৈবজ্ঞ ও মহা প্রাজ্ঞ। মহাভারতে আছে, "মহাভারতের কুটশ্লোক সকলের অর্থ বেদব্যাস জানেন, তাঁহার পুত্র শুকদেবও জানেন, আর সঞ্জয় জানেন কি না সন্দেহ।" এই বলিয়া সঞ্জয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীদেবীর গর্ভে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শতপুত্র ও দুঃশলা নামে এক কন্যা এবং বৈশ্যদাসীর গর্ভে যুযুৎসু নামে পুত্র জন্মিয়াছে। বিদুরেরও অনেক পুত্র হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। ভীম ও দুর্য্যোধন এক দিনেই ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহারা সকলেই কুরুবংশীয়। তথাপি পরিচয়ের নিমিত্ত কেবল পাণ্ডুর পুত্রগণ পাণ্ডব এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র প্রভৃতি আর সকলেই কৌরব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতঃপর তাঁহার দুঃশলা তনয়াকে সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

এখন হইতে পঞ্চপাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণ সকলে মিলিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভীম সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। তাঁহাকে দুর্য্যোধনেরা শত ভ্রাতায়ও পরাস্ত করিতে পারেন না। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কত স্নেহ! কত ভালবাসা! মানুষ কি বিচিত্রজীব! এত ভালবাসিতেও কেহ জানে না, এত কলহ করিতেও কেহ পারে না (২২)।

(২২) ক্ষেত্রজ পুত্র, সমাজের কোন কোন অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অত্যন্ত আবশ্যকতা হইলে সকল দেশেই এইরূপ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের যে শাখা ইউরোপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহাদের মধ্যেও নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রীশ দেশীয় স্পার্টাবাসীরা দীর্ঘকালব্যাপী এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তাহাদের জন-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হয়। এজন্য জন-সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত স্পার্টার রাজকীয় সিনেট সভা যুবকদিগকে যে কোন রূপে পুত্রোৎপাদন করিতে অনুমতি দেন এবং এইরূপে পুত্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হয় (Taylor's Anctient History p. ⅛‡)। বিগত মহাযুদ্ধে ইউরোপের জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় এই সমস্যা পুনরায় উপস্থাপিত হইয়াছে। এ দেশেও মহাবল পরশুরাম ক্রোধে অন্ধ হইয়া ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। তখন দেশোপকারার্থ যুদ্ধকুশল, দেশরক্ষক সেই ক্ষত্রিয়গণের সংখ্যা যে কোনরূপে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইয়াছিল। বৈধ ও অবৈধ, কি উপায় দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা আমরা এই গ্রন্থের ভীষ্মপর্ব্বে গীতার সূচনায় আলোচনা করিব। অধিক কি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যেও নিয়োগপ্রথা ছিল। প্রথমে ২০ প্রকার পুত্র ও তদপরে ১২ প্রকার পুত্র প্রচলিত ছিল [অনুশাসন পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায় ও মনুসংহিতা ৯—১৫৯ (১৬০)] জন সংখ্যার আধিক্যহেতু পরে কেবলমাত্র দুই প্রকার পুত্র অবশিষ্ট থাকে। এখন দরিদ্রতা ও মৃত্যু যেরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহাতে আশা হয়, এই দ্বিবিধ পুত্রও শীঘ্র লুপ্ত হইবে। তখন কেবা লিখিবে? কেইবা দোষ ধরিবে?

তৃতীয় অধ্যায়।—ভীমের জীবন নাশের চেষ্টা।

কুন্তীদেবী বিলাস ও বিশ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণের লালন পালন করিতেছেন; ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দেবী প্রভৃতি গুরুজনের পরিচর্য্যায় রত রহিয়াছেন। সকলেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন।

ক্রমে দুর্য্যোধন জানিতে পারিলেন, এ রাজ্য, এ ঐশ্বর্য্য সকলই পাণ্ডুর; যুধিষ্ঠির তাহার অধিকারী। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি আমরা, শতাধিক ভাই হইয়াও, কেবল মাত্র কতিপয়ের পদানত

হইয়া থাকিব? কতিপয়ের অনুগ্রহে জীবন যাপন করিব? শুধু সংখ্যায় যে কিছু আসে যায় না, তাহা তিনি বুঝিলেন না। আমরাও বুঝি কৈ? ক্রমে সকল ভ্রাতাই পাণ্ডব-বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। দুর্যোধন তখন দুঃশাসন ও মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, মহাবল ভীমকে নিহত করিয়া, তাহার চারি ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজা হইবেন। তখন দুর্যোধন পিতার অনুমতি লইয়া সমুদয় ভ্রাতার সহিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করিতে গেলেন।

গঙ্গাতীরে মনোহর গৃহ ও বিহার-উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই গৃহ মধ্যে জল যন্ত্র সকল জল সঞ্চারণ করিতেছে (২৩)। দুর্যোধন আজ ভীমের সহিত অভিন্ন দেহে, অভিন্ন হৃদয়ে আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছেন, আর স্বহস্তে কত মিষ্টান্ন ভীমের মুখে দিতেছেন। তৎপরে তাঁহাকে জলক্রীড়া করিতে গঙ্গায় লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ভীম অচেতন হইয়া সৈকতে শয়ন করিলেন। তখন দুর্যোধন ভীমের হস্তপদাদি দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া গঙ্গার গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। ভ্রাতৃগণ-সহ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ভীম গৃহে যায় নাই। তখন তাঁহারা বলিলেন, "তবে সে বিনষ্ট হইয়াছে।" অমনি কুন্তীদেবী কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া দীনবন্ধু বিদুর ছুটিয়া আসিলেন। সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "চিন্তা নাই, ভীম নিরাপদে ফিরিয়া আসিবে। তোমরা ইহা লইয়া আর আন্দোলন করিওনা, তাহা হইলে দুর্যোধন আবার তোমাদের অনিষ্ট করিবে।"

কএক দিনের পরেই ভীম হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া জননী ও ভ্রাতৃগণের আনন্দের অবধি রহিল না।

আর দুর্যোধন? তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন. হায়, হায়! এমন কালকূট বিষ, এমন খরতর স্রোত, সকলই বিফল হইল! মকর কুম্ভীর কোথায় রহিল? জল যে বিষের ঔষধি, তাহা তাঁহার মনে হইল না।

দুর্যোধন দমিবার পাত্র নন। আবার তিনি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিলেন। আবার তাহাতে অতি তীক্ষ্ণ বিষ দিলেন। যুযুৎসু ভীমকে তাহা বলিয়া দিলেন। তথাপি ভীম সাবধান হইলেন না। তিনি দুর্যোধনের আত্মীয়তায় ভুলিয়া সেই বিষান্নও রাশি রাশি আহার করিলেন। কিন্তু জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্যোধন নিদ্রিত ভীমকে কালসর্প দ্বারা সর্ব্বশরীরে দংশন করাইলেন (২৪)। তাহাকেও ভীম মরিলেন না। তথাপি দুর্যোধনের জ্ঞান হইল না। হইবে কিরূপে? ষড়রিপু যে তাঁহাকে ধরিয়া নৃত্য করিতেছে, আর বলিতেছে, "আমরাই কাঁধে করিয়া তোমাকে সিংহাসনে তুলিয়া দিব।"

এখন হইতে ভীম অসাধারণ বলবান হইতে লাগিলেন। দুর্যোধন—দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণের সহিত সতত পরামর্শ করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ যতই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, ততই বিদুর নিরপরাধী পঞ্চ পাণ্ডবের পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে সময়ে সাবধান করিয়া, সাহায্য দিয়া, সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন, রাজার কোপানলে পড়িয়া এম সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, তাহা বিদুর একবারও ভাবিলেন না। মহাপুরুষের লক্ষণ এই। প্রবল যে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, তাহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা সতত নিরপরাধী দুর্ব্বলের পক্ষপাতী। তাঁহারা স্বার্থ বুঝেন না, নিজের হিতাহিত ভাবেন না, দেখেন কেবল পরহিত, দেশহিত। একমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই তাঁহাদের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। আবার যেদিন এদেশে এই মহোচ্চ আদর্শ আসিবে, সেইদিন হইতে এদেশ উন্নত হইতে আরম্ভ করিবে; তাহার পূর্ব্বে নয়, পূর্ব্বে নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

(২৩) আদিপর্ব্ব ১২৮—৪০।

(২৪) আদিপর্ব্ব ১২৯—৩৭।৩৮।৬১—১৩৭।

বঙ্গসমাজ।

(১)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ।
মুখে ভাষা মিঠে কথা,
অন্তরে গরল গাঁথা,
সরলতা উদারতা মরিচীকা সাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(২)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ।
করে ধরে বুকে টানি,
পিছু ফিরে (?) কানাকানি,
ভ্রাতা ভগ্নি ভালবাসা ছল-মাখা সাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতেও লাজ।

(৩)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
নিরীহ যে সত্যপ্রিয়
শান্তশিষ্ট নম্র রয়,
বিদ্রূপের পাত্র সে যে সমাজের মাঝ,
আপন ঘরে কথা কহিতে ও লাজ।

(৪)

হায়রে এ পোড়াবঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
কাঙ্গাল হইলে তার
নিস্তার নাহিগো আর
অপমান পদাঘাত সে অঙ্গের সাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে ও লাজ।

(৫)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ।
মেয়েটী বয়স্থা প্রায়,
হয়েছে যাহার হায়,
সর্ব্বনাশ, কি হইবে প্রতিপদে ত্রাস,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(৬)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ।
দীন হীন ঘরে কন্যা
পিতার বক্ষেতে বন্যা
দিনরাত শান্তিহীন মাথে পড়ে বাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(৭)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
বিবাহেতে আঁটাআঁটি
কন্যা চাহি পরিপাটি,
দু'চার হাজার ভিন্ন পাত্রটী নারাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(৮)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
পাশ করা ছেলে যার
গরবে বদন ভার
বসিতেও অপমান সকলের মাঝ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(৯)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
আহা ছেলে দরাদরি,
যেন মাছ তরকারী,
পাইকার আছে তাহে ঘটক সমাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(১০)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
স্নেহের পুত্তলী ছেলে,
বজ্রপলা মেয়ে হলে,
শিহরে পিতার অঙ্গ, মরুহৃদি মাঝ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(১১)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
বার কি ভেরর বাড়া
মেয়েটী রাখিবে কারা
জনকের মাথা হেঁট, মার বুকে বাজ,
আপন ঘরের কথা কহিতে যে লাজ।

(১২)

হায়রে এ পোড়া বঙ্গে হিন্দুর সমাজ!
বড় ঘরের কথা যত
চুপে চুপে হয় গত
দরিদ্রের কথা হলে বাজে বজ্রনাদ,
আপন ঘরের কথা কহিতে ও লাজ।

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।

শ্রাদ্ধিকী।

দেব-প্রয়াণ।

একি নিদারুণ কথা, এ যে বজ্রাঘাত ব্যথা,
মর্ম্ম-প্রপীড়িত,
নব্য-ভারতের সূর্য্য, দীপ্তিমান দেশ পূজ্য,
আজি অস্তমিত!
তেজস্বী মনস্বী ঋষি, উজলিলা দশ দিশি,
মহত্ত্ব প্রভায়,
যৌবনে যুঝিয়া রণে, দুর্জ্জয় দারিদ্র্য সনে,
পরাজিলা তা'য়!
সত্য ধর্ম্মে সদা রত, কর্ম্ম, জীবনের ব্রত,
বিশ্ব হিত-কামী,
অন্যায়ে অনল-দীপ্ত, ন্যায়ে চির-পরিতৃপ্ত
কাজে অগ্রগামী!
"আনন্দ-আশ্রম"করি, শত দীনহীনে ধরি,
সযত্নে পালিলা,
অনুরূপা পত্নীসনে, স্নেহার্দ্র দয়ার্দ্র মনে,
সবারে সেবিলা।
কত অবহেলনীয়, হইল প্রাণের প্রিয়;
লভিল আদর!
কত স্নেহে তুলি বুকে, অমৃতান্ন দিল মুখে,
যেন সহোদর!
সেবাব্রতে চিত্ত স্থির, নিয়ত নির্ভীক বীর,
নির্ভীক লেখনী,
সংযমী, উদার চেতা, নব-ভারতের নেতা,
দেশ গুরু গণি!
কর্ম্মময় অনলস, শুদ্ধ চেতা, আত্ম বশ,
নিত্য নবোদ্যম,
কে বলে"প্রাচীন বৃদ্ধ" দেহ প্রাণ যোগসিদ্ধ
কেশরী বিক্রম!
কঠোর কঠোরতম, কোমল কমলোপম,
পবিত্র হৃদয়,
আসে যায় কত জন, নরকুলে এ তপন,
কদাচ উদয়!
সত্য দেব! গেলে তুমি, ছাড়ি এ মরত ভূমি
অমর ভবনে,
সত্যই কি গেলে তুমি, আঁধারিয়া মাতৃভূমি,
সাহিত্য গগনে?
করিব কি সে বিশ্বাস, "দেশ যোড়া সর্ব্বনাশ
সত্য সত্য তবে?
অসম্পূর্ণ কত কার্য্য, কে করিবে কহ আর্য্য,
কহ কিবা হবে?
সে স্নেহ আদরে কেবা, শিখাবে ভারতী সেবা,
সুশিক্ষা তেমন?
অযোগ্যতা আপনার ভুলি করুণায় কার,
লভিব জীবন?
দেশে আছে যতজন, সবি তব পরিজন,
তুমি যে সবার,
কারো কিছু নাহি ব'লে,কেন তুমি গেলে চলে,
এ কি অবিচার?
আর না লেখনী চলে, নিরুদ্ধ নয়ন জলে,
সত্য তুমি নাই?
"দেবঘরে দেব-প্রাণ, হইয়াছে অবসান,
সত্য তবে তাই?

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

আশৈশব সহচরের স্মৃতি।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী একজন অসাধারণ ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার উদার স্বভাব, নির্ম্মল চরিত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, নির্ভীক কার্য্যকারিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং তাঁহার পরদুঃখ কাতরতা পরোপকার ব্রত স্বজন বৎসলতা ও দেশহিতৈষিতা যথাযোগ্যরূপে বিবৃত করিয়া তাঁহার জীবনী সঙ্কলন করা বিশেষ ক্ষমতাবান লেখকের আবশ্যক। ভরসা করি যথাসময়ে কোনও সুযোগ্য লেখক তাহা করিবেন। আমি এইক্ষণ কেবল তাঁহার বাল্যকালের ও জীবনের কতকগুলি ঘটনা সন্নিবেশিত করিতেছি মাত্র।

দেবীপ্রসন্ন ১২৬০ সালের পৌষমাসে ২৩শে তারিখে, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা তিথিতে এইক্ষণ ফরিদপুর, তৎকালে বরিশাল জেলার অন্তর্গত উলপুর গ্রামে সুবিখ্যাত বসু রায় চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র রায়চৌধুরী, পিতামহ গোপীকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, প্রপিতামহ শিবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বৃদ্ধপ্রপিতামহ নন্দরাম রায়চৌধুরী, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরী এবং অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ রঘুনন্দন রায়চৌধুরী ছিলেন। এই রঘুনন্দন রায়চৌধুরী মুসলমান বাদসাহের আমলে সাহাপুর পরগণার জমিদারী অর্জ্জন করেন এবং উলপুর গ্রাম উক্ত পরগণার মধ্যে স্থিত। দেবীপ্রসন্নের পিতা স্বর্গীয় রামচন্দ্র রায়চৌধুরী অতিশয় নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি দেবপূজা ও আহ্নিকাদি কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। দেবীপ্রসন্নের মাতা অতি বুদ্ধিমতী ও স্নেহশীলা রমণী ছিলেন।

দেবীপ্রসন্নেরা ৬ (ছয়) ভ্রাতা ছিলেন ও তাঁহাদের তিন (৩) ভগ্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রথমে মুনসেফি কার্য্য করিয়া পরে সবজজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে পরলোকগমন করেন। মধ্যম শ্যামাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মোক্তারি কার্য্য করিতেন। তিনি বহুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। দেবীপ্রসন্ন তৃতীয় ভ্রাতা ছিলেন। চতুর্থ রমা প্রসন্ন অতি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। পঞ্চম রাধিকাপ্রসন্ন ও কনিষ্ঠ গিরিজাপ্রসন্ন মাত্র জীবিত আছেন। ছয় ভ্রাতার মধ্যে দেবীপ্রসন্ন ও গিরিজাপ্রসন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও অপর সকলে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। দেবীপ্রসন্নের তিন ভগ্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা যোগমায়া ও কনিষ্ঠা দুর্গাসুন্দরী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী থাকিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। এবং মধ্যমা বিরজা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। বিরজার প্রথমে শৈশবাবস্থায় হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়, পরে দেবীপ্রসন্ন তাহাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন।

১২৭৪ সালের পৌষমাসে উলপুর গ্রামে ওলাওঠার রোগের ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয় সেই মহামারীতে দেবীপ্রসন্নের মাতা ও তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা রমাপ্রসন্ন পরলোকগমন করেন এবং তাহার তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পূর্ব্বেই বাল্যকালে দেবীপ্রসন্নের হিন্দুমতে বিবাহ

হয়। বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের কন্যা কমলকামিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পরে কমলকামিনী স্বামীর সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

দেবীপ্রসন্নের ভবিষ্যৎ জীবনের অঙ্কুর বাল্যকাল হইতেই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তাহার খেলার সঙ্গীগণ সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিলেন এবং তিনি সকলকে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার খেলার সঙ্গীগণের নেতা ছিলেন। তিনি ও তাঁহার খেলার সঙ্গীগণ কেহ ৭বৎসরের কেহ ৮ বৎসরের কেহ ৯ বৎসরের ও কেহবা ১০ বৎসরের বালক ছিলেন। তখন তাঁহারা একত্র হইয়া রামরাবণের যুদ্ধ অভিনয় করিতেন; এবং তিনি রাবণের পদ গ্রহণ করিতেন। অতি অল্প বয়সে দেবীপ্রসন্ন বিদ্যাভ্যাসের জন্য কলিকাতা আসেন এবং প্রথমে তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্যামাপ্রসন্নের শ্বশুর চেতলা নিবাসী দুর্গাদাস সরকার মহাশয়ের চেতলার বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিসনারী স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন এবং তথা হইতে ১৮৭৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চেতলা থাকা কালেই তিনি ঝামাপুকুর ব্রহ্মমন্দিরে কেশববাবুর উপাসনায় যোগ দিতে আসিতেন। চেতলা থাকা সময়ে দেবীপ্রসন্ন একবার জরপ্লীহা রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসায় কোনও ফল না পাওয়ায় তিনি তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাপ্রসন্নের সহিত একমাসের কিছু অধিককাল মুঙ্গেরে বাস করেন, তাহাতেই তাঁহার পীড়া আরোগ্য হয়। এবং সেই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তি প্রস্ফুটিত হয় এবং এবং তিনি লেখনী পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৮৭৪ সালে দেবীপ্রসন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। এবং তখন হইতে কলিকাতার পটলডাঙ্গা ও তন্নিকটস্থ স্থানে ছাত্রনিবাসে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগদান করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হন। যদিও দেবীপ্রসন্ন কয়েকবৎসর কাল মেডিকেল কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মেডিকেল কলেজের কোনও পরীক্ষা দেন নাই। কারণ চিকিৎসা গ্রন্থ অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল না তখন হইতেই সাহিত্য সেবায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি তাঁহার প্রাণের সুহৃদ চাওচানিবাসী ৺ কালীপ্রসন্ন দত্ত ও ৺ শশীভূষণ গুহ প্রভৃতি কয়েক বন্ধুর সহিত একত্রে ভারতসুহৃদ নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু এ পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশিত হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়। এবং এই সময় তিনি তাঁহার রচিত শরৎচন্দ্র নামক প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁহার পত্নী কমলকামিনী ও বালবিধবা ভগ্নী বিরজা উলপুর গ্রামে তাঁহার পিত্রালয়ে থাকিতেন এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় সৌহার্দ্য জন্মে, দেবীপ্রসন্ন যখন বাড়ী যাইতেন তখন মৌখিক উপদেশ দ্বারা এবং কলিকাতা থাকা সময়ে পত্রের দ্বারা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করেন এবং সকল বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় নিয়া নিজের সহিত প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করাইবার সঙ্কল্প

করেন। দেবীপ্রসন্ন কোনও সঙ্কল্প করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন তাহাতে কোনও সংশয় ছিল না এবং কোনও ব্যক্তি বা কোন অবস্থাই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিত না। প্রথমে তিনি তাঁহার বিধবা ভগ্নী বিরজাকে স্বীয় পরিবারবর্গের ও আত্মীয় বন্ধুগণের অমতে কলিকাতায় আনিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত করেন। এই সময় দেবীপ্রসন্নের পুত্র প্রভাতকুসুমের জন্ম হয়। কমলকামিনী পিত্রালয়ে থাকিয়া প্রভাত-কুসুমকে প্রসব করেন। পরে কমলকামিনীর পিতা ও মাতা প্রভৃতির অমতে দেবীপ্রসন্ন তাঁহার বন্ধু৺কালীপ্রসন্ন দত্তের সাহায্যে স্বীয় পত্নী ও শিশুপুত্রকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত করেন এবং বিধবা ভগ্নী বিরজাকে শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র মুখো–পাধ্যায়ের সহিত ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। এই সকল কারণে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাগণের ও হিন্দু সমাজস্থ অপর আত্মীয় বন্ধুগণের বিশেষ বিরাগ ও বিদ্বেষভাজন হন। কিন্তু দেবী–প্রসন্ন তাঁহার উদার স্বভাব, স্বজনবৎসলতা ও পরোপকারিতা দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই এই বিদ্বেষভাব অপনীত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহার হিন্দু সমাজস্থ আত্মীয় বন্ধুগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি যে হিন্দুর পক্ষে বিধর্ম্মী, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল।

দেবীপ্রসন্ন ব্রাহ্মসমাজের একজন অগ্রণী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতেন এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজে ও উপাসনায় যোগ দিতেন। ব্রাহ্মনগুলীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল।

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, যখন, কুচবিহারের মহারাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন তখন ৺আনন্দমোহন বসু প্রমুখ অনেক ব্রাহ্ম উক্ত বিবাহের বিদ্বেষী হন এবং তাঁহা-দের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়। এবং দেবীপ্রসন্ন তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণের সময় ঐ মন্দিরের পার্শ্বে ব্রাহ্ম-পল্লা স্থাপনের জন্য ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয় মন্দিরের উত্তরদিকে কতক জমি অর্জ্জন করেন এবং দেবীপ্রসন্ন উক্ত জমির মধ্যে কতক জমি খরিদ করিয়া মন্দিরের সন্নিকটে নিজ বাটী প্রস্তুত করেন। প্রথম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ থাকে এবং তাঁহার দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের নানাপ্রকার উপকার সাধিত হয়। তিনি অনেক ব্রাহ্ম বালক বালিকা স্ত্রী ও পুরুষগণকে নিজবাটীতে রাখিয়া প্রতিপালন এবং অনেক ব্রাহ্মবালিকা ও যুবতীকে বিবাহ দেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাণিকদহের খ্যাত-নামা ও ধনশালী জমিদার বিপিনবিহারী রায় একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। দেবীপ্রসন্নের সংস্রবে আসিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দেবীবাবুর পরামর্শানু-সারে কাজ করিয়া তিনি নানারূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং দেবীবাবুর পরামর্শ ও উপদেশ মতে কার্য্য করায় তাঁহাদ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের ও ব্রাহ্মনগুলীর অনেক উপকার সাধিত হয়।

ব্রাহ্মগণ যেমন দেবীবাবুর দ্বারা নানারূপে উপকৃত হইয়াছেন তাঁহার হিন্দু আত্মীয় বন্ধু-গণও তাঁহাদ্বারা নানারূপে উপকৃত হইয়া-ছেন। অনেক বালক তাঁহার বাড়ীতে

থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগের মধ্যে অনেককে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছেন। হইল। এতদ্ভিন্ন তিনি বৈদ্যনাথ ও পুরী-ধামে যেসকল বাড়ী করিয়াছেন অনেক আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তিকে তাহাতে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দিয়া উপকার সাধন করিয়া-ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত উলপুর গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান এজন্য ফরিদপুরকে ও ফরিদপুরবাসীগণকে তিনি অতিশয় ভাল-বাসিতেন। ১৮৮৭ সালে বৈশাখ মাসে তিনি তাঁহার কয়েকটী বন্ধু ও ফরিদপুর নিবাসী অপর কয়েক ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ফরিদপুর সুহৃদ সভা স্থাপন করেন তিনি উক্ত সভার সম্পাদক হন। মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত সভার সম্পা-দকের কাজ তিনিই চালাইয়া আসিতেছিলেন প্রতি বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সম্পাদক ও সহকারী সম্পা-দক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, ২।১ বার ভিন্ন তিনিই প্রতিবারেই সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইতেন। উক্ত সভারদ্বারা ফরিদপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, ব্যায়ামশিক্ষা বিস্তার, অনাথা বিধবা-দিগের সাহায্য, মহামারী সময়ে ঔষধ বিতরণ; দুর্ভিক্ষে অন্নদান প্রভৃতি ফরিদপুর বাসী-দিগের নানারূপ উপকার সাধিত হইয়াছে। দেবীপ্রসন্নই তাহার মূলাধার। একমাত্র তিনিই ফরিদপুর সুহৃদসভা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অভাবে এইক্ষণ উক্ত সভার কার্য্য চলিবে কিনা সন্দেহের বিষয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ফরিদপুরে কয়েকবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দুর্ভিক্ষের সময়ে দেবীপ্রসন্ন অনেক চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং ফরিদপুরবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে চাউলাদি বিতরণ করিয়া, অনেক লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। কখনও কখনও নিজে গ্রামে গিয়া ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইয়াছে, তিনি তাহা দৃষ্টিপাত করেন নাই।

নিজ জন্মস্থান উলপুর গ্রামে ১৩০৯ সালে নিজব্যয়ে তাহার পিতা ৺রামচন্দ্রের নামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া নিজ হইতে ডাক্তারের বেতন দিয়া ও ঔষধাদি ক্রয় করিয়া তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত দাতব্য ঔষধালয় চালাইয়া আসিয়াছেন। উলপুরবাসিগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এ সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। উলপুর বাসিগণের ভরসা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ প্রভাত কুসুম ঐ দাতব্য চিকিৎসালয় বজায় রাখিবেন।

দেবীপ্রসন্নের পত্নী কমলকামিনী কলি-কাতা আসিবার পর তাঁহার দুইটী কন্যা সন্তান হয়, তাঁহাদের একটীর নাম অপরা-জিতা রাখিয়াছিলেন, অপরটীর নাম সান্ত্বনা; অপরাজিতা অতি শৈশব অবস্থায় পরলোক গমন করে। দেবীপ্রসন্ন তাঁহার পুত্রকন্যার বিদ্যাশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার ভগিনী বিরজার পুত্র কন্যাগণের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। প্রভাতকুসুম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তিনি তাহাকে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে, তিন বৎসর কাল ইংলণ্ডে রাখেন এবং প্রভাতকুসুম ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাশ করিয়া

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যরিষ্টারী আরম্ভ করে। এবং পরে তাহাকে কুমিল্লার সুপ্রসিদ্ধ গভর্ণমেণ্ট প্লীডার স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা কুন্দনলিনীর সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় বিপিন বিহারী রায়ের পুত্র সুপ্রসন্ন কিছুদিন ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে তাহার সহিত তাঁহার কন্যা সান্ত্বনার বিবাহ দেন। দেবীপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিজা প্রসন্ন হিন্দুসমাজ ভুক্ত ছিলেন। তিনি দেবী-প্রসন্নের উৎসাহে পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি দেবীবাবুর বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকিয়া হাই-কোর্টে ওকালতি করিতেছেন।

সাহিত্য সেবা দেবীপ্রসন্নের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি "শরৎচন্দ্র" হইতে আরম্ভ করিয়া নয়খানি উপন্যাস, দশখানি প্রবন্ধ পুস্তক ও একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এবং ১২৯০ সাল হইতে নব্যভারত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত নব্যভারত এতদিন পর্য্যন্ত তিনি সুদক্ষতার সহিত চালাইয়া আসিয়া-ছেন। এইরূপে তিনি বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। নব্যভারত যাহাতে তাঁহার অভাবেও প্রকাশিত হয় এইরূপ ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিতেন। এবং তাঁহার পুত্রবধু কুন্দনলিনী ঐ পত্রিকা যাহাতে প্রচ-লিত রাখেন এই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়া-ছেন। নব্যভারত পাঠকগণ জানেন, যে তিনি যাহা উচিত মনে করিতেন তাহা ব্যক্ত করিতে কোনও রূপ ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের যে সকল দোষ তাঁহার চক্ষে পতিত হইত তাহা তিনি অকুতোভয়ে নব্যভারতে প্রকাশ করিতেন এবং সেইজন্য তিনি অনেক সময় ব্রাহ্মমণ্ডলীর অপ্রিয় হইতেন। এমন একসময় হইয়াছিল যে কতক ব্রাহ্মগণ ইহা ও চেষ্টা করিয়াছিলেন যে দেবীবাবু ব্রাহ্মপল্লী হইতে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু দেবীপ্রসন্ন ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না এবং কাহাকেও ভয় করিতেন না। তিনি নির্ভীক চিত্তে নিজ কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন এবং যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন ও বলিয়াছেন।

দেবীপ্রসন্ন অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। অনাবশ্যক কাজে তিনি কখনও অর্থব্যয় করিতেন না। বাবুগিরি বা বিলাসিতা তাঁহার চক্ষুর শূল ছিল। বৈষয়িক কার্য্যে তিনি অতিশয় সুদক্ষ ও দূরদর্শী ছিলেন। এজন্য তিনি নানারূপ সৎকার্য্যে ও কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পুরীধামে ২টী বড় বড় দোতালা বাটী ও চারিটী এক-তালা বাটী ও বৈদ্যনাথ ধামে চারিটি বাটি প্রস্তত করিয়াছেন। এই সকল বাটি ভাড়া দিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। এত-ভিন্ন কলিকাতাস্থ সিমলায় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরের নিকট তিনি ২টী বাড়ী করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনিও তাঁহার পুত্র-কন্যাদি পরিবারবর্গ বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন বরিশাল জেলায় নারায়ণ পুরে তিনি একটী বাটি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যখন বৈদ্যনাথ প্রভৃতি সাঁওতাল পরগণার নানা স্থানে বাঙ্গালী ভদ্রলোক স্বাস্থ্য অন্বেষণে আসিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি বৈদ্যনাথ কাস্টেয়ার্স টাউনে অনেকটা জমি লইয়া তাহাতে ক্রমে চারিটি বাড়ী প্রস্তত করেন।

এবং তদ্রূপ পুরীর সমুদ্রতীরে ও তিনি অনেকটা জমি লইয়া তাহাতে ৬টি বাড়ী প্রস্তুত করেন, তিনি বলিতেন যে বৈদ্যনাথ ও পুরী কখনও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া গণ্য না হইলেও চিরকাল তীর্থস্থান বলিয়া তাহার আদর থাকিবে এবং ঐ সকল স্থানের বাড়ীর আদর কখন যাইবে না। ৮

দেবীপ্রসন্ন তাঁহার হিন্দু ও ব্রাহ্ম আত্মীয় ও বন্ধুগণকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সম্পদে বিপদে সর্ব্বদা তাহাদের সাহায্য করিতেন এবং আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়া তাহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। ১৮৭৭ সালে জানুয়ারী মাসে যখন তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িতেন সেই সময় তাঁহার জন্মভূমি উলপুর গ্রামে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হন সেই সময় তাঁহার জেষ্ঠতাত ভ্রাতা ও বাল্যসহচর যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরী উলপুর গ্রামে ভীষণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়, সেই সংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতা হইতে উলপুর চলিয়া যান। তখন খুলনা বা যশোরে রেল ছিল না, কলিকাতা হইতে উলপুর যাইতে অনেক কষ্ট সহিতে হইত এবং অনেক সময় লাগিত; এবং তখন উলপুর গ্রামের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে নিকটস্থ ব্যক্তিগণও পীড়িত আত্মীয়স্বজনকে দেখিতে উলপুর যাইতে সাহস করিতেন না। কিন্তু দেবীপ্রসন্ন নির্ভয়চিত্তে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উলপুর গিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৩২০ সালে কার্ত্তিক মাসে তাঁহার জীবনের চিরসঙ্গিনী ও পত্নী কমলকামিনী পুরীধামে স্বর্গারোহণ করেন। জীবনের চিরসঙ্গিনীকে হারাইয়া তিনি অতিশয় ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের বল এমন ছিল যে কিছুতেই তাঁহাকে কাতর করিতে পারিত না। তাহার পর ১৩২৩ সালে তাঁহার একবার কঠিন পীড়া হয় এবং ডাক্তারগণ তাঁহাকে অনেকদিন প্রায় অনাহারে রাখেন এবং তাঁহাকে চলাফেরা করিতে দিতেন না ঐ সময় পুত্রবধু ফুল্লনলিনী তাঁহার শুশ্রূষায় সদা নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন ঐ ভাবে থাকিয়া তিনি ঐরূপ ভাবে কাল কাটান অসহ্য মনে করিয়া পুরীধামে চলিয়া যান এবং সেখানে গিয়া সুস্থ হন। ১৩২৫সালে তাঁহার জামাতা সুপ্রসন্ন অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, ইহাতে দেবীপ্রসন্ন অতিশয় মনকষ্ট পান তৎপর কন্যা সান্ত্বনা ও তাহার পুত্র কন্যাগণের মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন।

জীবনের শেষভাগে তিনি নানাপ্রকার পারিবারিক অশান্তিভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অটল চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। গত আশ্বিন মাসে বৈদ্যনাথধামে যান; সেখানে তিনি কোনও রূপ পীড়ার যন্ত্রণা সহ্য না করিয়া, ও কাহাকেও কোনও কষ্ট না দিয়া, সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার ন্যায় বৈদ্যনাথ ধামে সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি যেরূপ ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার মৃত্যুও তদনুরূপ হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অনেক কার্য্য করিবার ইচ্ছা ছিল তিনি জীবনে যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ও সৎকার্য্য সমাধা করিয়াছেন তাহা চির প্রচলিত রাখিবার জন্য তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল এবং তাহার ব্যবস্থা করিয়া উইল সম্পাদন করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ সকল কার্য্য করিবেন এইরূপ

তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার জীবনলীলা শেষ হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না, ভরসা করি শ্রীমান প্রভাত কুসুম স্বীয় পিতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি বজায় রাখিবেন।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী।

দেবলোকে দেবীপ্রসন্ন।

ভূদেব যাঁরা ছিলেন হেথা
যাচ্ছেন তাঁরা একে একে
আঁধার ঘেরা ভারতভূমে
আরো নিবিড় আঁধার ঢেকে!
সেদিন মাতা 'তিলক' হারা,
মুছেন আজো নয়ন-ধারা,
আবার একি মায়ের বুকে
দারুণতর পড়্‌ল বাজ,
নরসিংহ দীন-দয়াল
বিদায় 'দেবী' নিলেন আজ!
"নব্যভারত" শূন্য হল,
শূন্য হল সত্য-সেবক,
শূন্য হল অন্যায়ের
প্রতিযোদ্ধা জন-নায়ক!
বীর-মন্ত্রে পূর্ণ-আশ
শূন্য বাণী-ভক্ত দাস
শূন্য হল পতিতবন্ধু
নীরব-কর্ম্মী মহাপ্রাণ!
শূন্য পূত চরিত্রের
পুণ্য-দ্যুতি মূর্ত্তিমান!
এমন স্নেহ এমন প্রীতি
এমন নীতি-সদুপদেশ,
হায়রে বিধি! এমন বিধি,
এক নিমেষেই হল শেষ!
মায়ের ভাঙা-কুটীর মাঝে
যখন আলো অলূবে সাঁঝে
সকল আলো নিভিয়ে দিয়ে
হাস্‌ছে কেবা অট্টহাসি!
কাহার এমন রুদ্র-লীলা
অশ্রু দিয়ে বাজায় বাঁশী!
দেবলোকে দেবের অভাব
ঘট্‌ল কি আজ এমনতর,
হচ্ছে কি তাই ক্ষণে ক্ষণে
ভারতমাতার শূন্য ঘর!
ভুবন-সেরা রতনগুলি
অলক্ষ্যে কে নিচ্ছে তুলি'
ভারতমাতা ধূলায় লুটে
সান্ত্বনা কে দিবে তায়,
শান্তি-আশার ভরসাটুকু
কাল-সাগরে মিলিয়ে যায়!
যাও হে দেব! "আনন্দাশ্রম"
ওই যে রাজে নয়নাভিরাম!
দুঃখ-দৈন্য পূর্ণ ধরা
নয়গো তব যোগ্য-ধাম!
শোক-সন্তপ্ত স্বদেশের
শ্রদ্ধাঞ্জলি অন্তরের
লও হে তুমি যুগ-যুগান্ত
অন্ত করি' হৃদয়-জ্বালা!
আপন-মনে চারণ কবি
রচ্‌বে তায় অশ্রু-মালা!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।
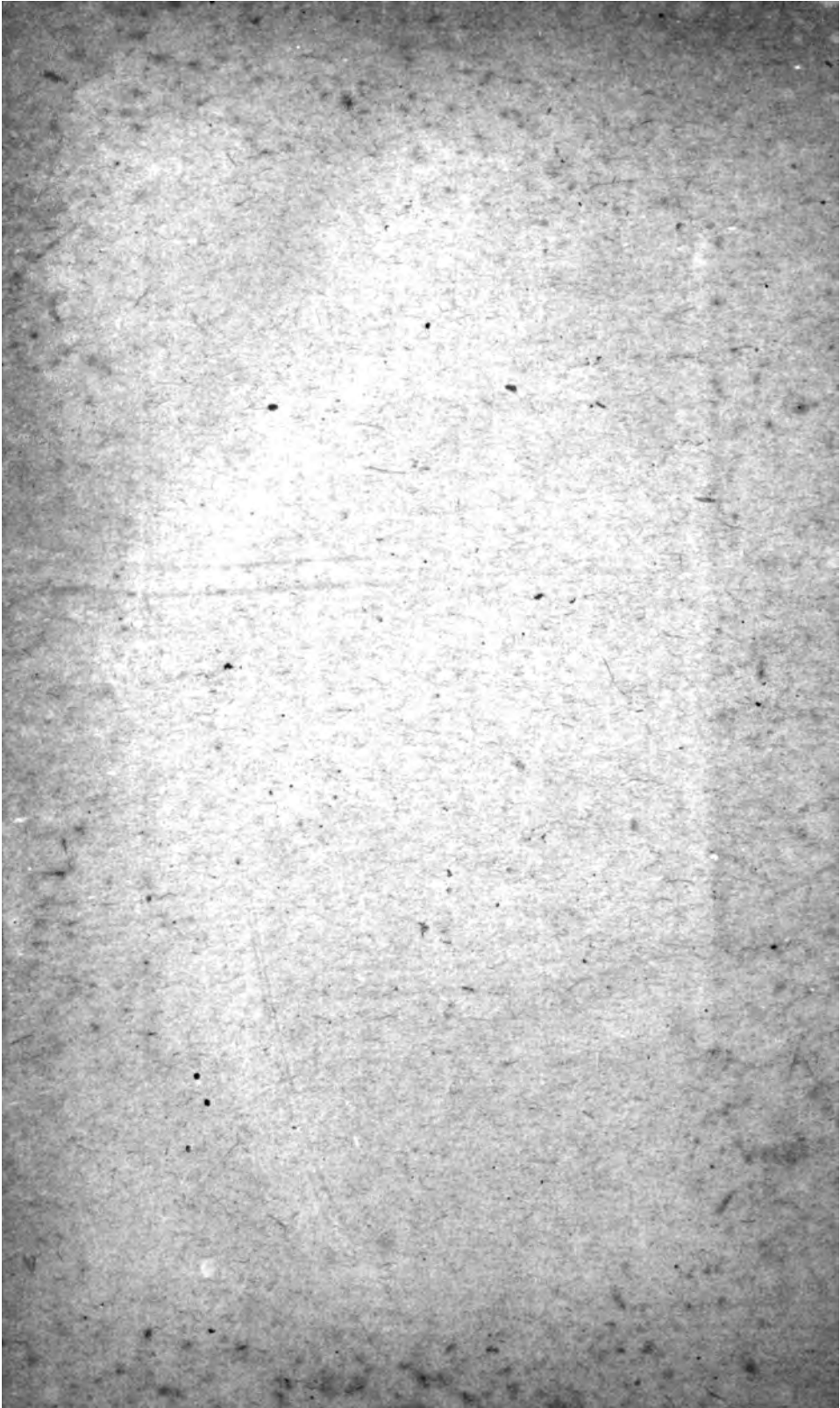
দেবীপ্রসন্ন-স্মৃতি

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গোড়ায়। প্রথম পরিচয়েই বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, আর সেই বন্ধুত্ব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল। খুব সম্ভব, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, কৃষ্ণনগরে, শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার মহাশয়ের মুখে প্রথমে ইহাঁর নাম ও ইহাঁর লেখা একখানি কথা গ্রন্থের নাম শুনি; হয়ত সেই কথাগ্রন্থখানি, লেখকের "শরচ্চন্দ্র"। আমার সহিত যখন পরিচয় হয়, তখন হয়ত দেবীপ্রসন্ন চারিখানি কথাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—শরচ্চন্দ্র, বিরাজ-মোহন, ভিখারী ও সন্ন্যাসী। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে দেবীবাবু একটি ছোট বাড়ীতে নিমুখানসামার গলিতে থাকিতেন। সে বাড়ীও নাই, সে গলিও নাই—এখন সেখানে ইডেন হাঁসপাতাল রোড খুলিয়াছে। দেবীবাবু তখন তাঁহার এখনকার বসতবাড়ীর জমি কিনিয়াছিলেন, ও বাড়ী তৈয়ারির বন্দোবস্ত করিতেছিলেন।

আমি কখনও দেবীবাবুকে তাঁহার জীবনের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করি নাই। কখনও কাহারও জীবনের ইতিহাস বা সংসারের খুঁটিনাটির কথা জিজ্ঞাসা করা আমার অভ্যাস নাই। তবে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় তাঁহার জীবনের অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম, সকল কথাই আমার মনে আছে; কিন্তু যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে কথা জানেন, তাঁহারাই সে বিবরণ লিখিলে ভাল হয়। আমি বিশেষভাবে জানি তাঁহার 'নব্যভারত' পরিচালনের কথা; মুখ্যভাবে তাহাই লিখিব।

একদিন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'ফরিদপুর-সুহৃদসভা'র একটা কমিটির কাজের শেষে দেবীবাবু আমাকে ও তাঁহার চারিজন বন্ধুকে লইয়া বিচার করেন, যে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিবেন কিনা। দেবীবাবুর যে চারিজন বন্ধুর কথা উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের নাম ৺কালীপ্রসন্ন দত্ত, ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গাঙ্গুলী ও ৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়। বিচার অনেক দিন চলিয়াছিল, আমি বরাবরই সাপ্তাহিকের বিরোধী ছিলাম। প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছিল যে, একখানি সাপ্তাহিকই বাহির করা হইবে ও সেখানি সংবাদপত্র হইলেও তাহাতে সাহিত্যের আলোচনা থাকিবে। দেবীবাবু, প্রস্তাবিত কাগজখানির 'বসুমতী' নাম রাখিবেন, ঠিক করিয়াছিলেন। এত উদ্যোগের পরও কিন্তু তিনি সাপ্তাহিক ছাড়িয়া শেষে মাসিক ম্যাগাজিনই প্রকাশ করিলেন। মাসিকপত্র প্রকাশের জন্য জিদ্ ছিল আমার, তাই যখন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে 'নব্যভারত' প্রকাশ হইল, তখন বড় সুখী হইয়াছিলাম। মাট্‌সিনির 'নব্য-ইটালি'র স্মরণ করিয়াই এই মাসিকপত্রের নামকরণ হইয়াছিল। আর্য্যদর্শন-সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের প্রভাবে আমরা তখন অনেকেই নব্যইটালির নেতাদের কথা পড়িতাম, আর দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী তখন

ম্যাটসিনির ভক্ত ছিলেন। এখানে বলিয়া রাখি যে আমি তখন কলেজের ছাত্র ছিলাম আর দেবীবাবু আমার চেয়ে নয় বৎসরের বড় ছিলেন। কখনও দেবীবাবুকে উচ্চপদের বিচারে সুহৃৎ সংগ্রহ করিতে দেখি নাই।

এই সময়ে মাসিকপত্রের যথার্থ অভাব ছিল। আমাদের সাহিত্যের নূতনযুগের প্রবর্ত্তক ও কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' খানি উঠিয়া যায় যায় হইয়াছিল। কেবল 'ভারতী' খানি নিয়মমত চলিতেছিল। 'ভারতী' চিরদিনই সুসম্পাদিত মাসিকপত্র; কিন্তু তখন ঐ পত্রে অবাধে কেহ দেবতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে সুপণ্ডিত সম্পাদকের বিরোধী মত সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন না। একজন লেখক (তাঁহার নাম প্রভাতচন্দ্র, কিন্তু উপাধি মনে নাই) নাস্তিকতা সমর্থন করিয়া 'ভারতী'তে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন; তাঁহাব সেই প্রবন্ধের ২।৪টী করিয়া ছত্র 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইত, আর তাহার তলায় মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত হইত। দেশে যাহা স্বাধীন চিন্তা বাড়ে, সকল শ্রেণীর লোকই অবাধে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে পারে, অর্থাৎ মাসিকপত্রিকা যাহাতে কোন একটা দলের মুখপাত্র হইয়া না দাঁড়ায়, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নব্যভারত' প্রকাশিত হইয়াছিল। সে যুগে কোন পত্রিকায় কোন একটা মত প্রকাশিত হইলেই,পাঠকেরা সম্পাদককেই সেই মতের সমর্থক মনে করিতেন, সেইজন্য নব্যভারতের প্রবন্ধসূচীর মাথার উপর প্রথম হইতেই লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী। প্রভাত বাবুর যে প্রবন্ধটীর কথা উল্লেখ করিয়াছি; উহা 'নব্যভারত' প্রকাশিত হইবার পর প্রভাতবাবু নব্যভারতে সমগ্র ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবীপ্রসন্ন ব্রাহ্মসমাজের লোক, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস খুব দৃঢ় ছিল। কিন্তু তিনি চিরদিনই তাঁহার মাসিকপত্রে সকলশ্রেণীর লোকের মতবাদ অসঙ্কোচে প্রকাশিত হইতে দিয়াছেন। 'নব্যভারত' প্রকাশের পর অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের পরিচালনায় 'নবজীবন' প্রভৃতি মাসিক প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু সে যুগে 'নব্যভারত' ছাড়া সকল পত্রিকাই দল বিশেষের মুখপাত্র ছিল। তাঁহার এই উদারতার জন্য একদিকে দেবীপ্রসন্ন যেমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, তেমনই আবার অন্যদিকে অনেক সুধীব্যক্তির আদর লাভ করিয়াছিলেন।

নব্যভারতে কোন গল্প ছাপা হইবে না, এই কথাই একরকম স্থির ছিল; কিন্তু কথা পাকা হয় নাই বলিয়া ৺ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের একটি ছোট গল্প ও সম্পাদকের 'নবলীলা' প্রথম বৎসরে মুদ্রিত হইয়াছিল। গোড়ার সঙ্কল্প স্মরণ করাইয়া আমি দেবীবাবুকে গল্প না ছাপিতে অনুরোধ করি; আমার কথা তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল, তিনি নব্যভারতে আর গল্প ছাপেন নাই। যে সময়ে অন্যান্য পত্রিকার পসার বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু নব্যভারতের গ্রাহক সংখ্যা তেমন বাড়িল না, তখন দেবীবাবুর অনেক বন্ধু নব্যভারতে গল্প ছাপিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গল্প ছাপিলে যে গ্রাহক বাড়িত,তাহা দেবীবাবু বুঝিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই আপনার সঙ্কল্প ছাড়েন নাই।

'ফরিদপুর সুহৃদসভা' দেবীপ্রসন্নের উদ্যোগেও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আর

চিরদিনই তিনি ঐ সভার প্রধান পরিচালক ছিলেন; এই সম্পর্কে তিনি ফরিদপুর জেলার প্রায় সকল স্থানের ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। 'নব্যভারত' প্রকাশের পর বাঙ্গালার নানাস্থানের সাহিত্যিকদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব ঘটে। ইহার ফলে কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে নানাস্থানের ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইতেন; আর দেবী-প্রসন্ন অতি প্রসন্ন মনে সকলকে আপনার কলিকাতার বাড়ীতে রাখিয়া অতিথি সৎকার করিতেন। কলিকাতায় বাস করিয়া এমনভাবে অতিথিসৎকার করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। দেবীপ্রসন্নের চালচলন সাদামাঠা ছিল। নিজের ঘরের প্রয়োজনে মজুরের কাজও করিতেন, লোকে তাঁহাকে সেইজন্য কৃপণ বলিত। আমি কিন্তু কোন নামজাদা বড় মানুষ দাতাকেও তাঁহার মত অতিথিসৎকার করিতে দেখি নাই।

দেবীপ্রসন্নের সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা কথা বলিব। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, দেবী-প্রসন্ন তাঁহাদের দলে ছিলেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম পরিচয়, তখন তিনি সাধারণ সমাজে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। আমি তখন সর্ব্বদাই কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতাম, ও ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে প্রায় প্রতি রবিবারই উপস্থিত হইতাম। কারণ, কেশবচন্দ্রের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল,—এখনও আছে। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে যখন প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে কথা হইত, তখন ভয়ে ভয়ে কথা কহিতাম; কিন্তু অতি অল্পেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কেশব-চন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। যখন 'নববৃন্দাবন' নাটক অভিনয়ের কথা হয়, তখন ঐ নাটকের লেখক ৺ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় আমাকে ঐ অভিনয়ের কাজে একটু জড়াইতে চাহিয়াছিলেন; সেইজন্য ঐ সম্পর্কের সকল কথা আমার জানা ছিল। দেবীবাবু আমার মুখে সকল বিবরণ শুনিয়া, নববৃন্দাবনের প্রথম অভি-নয়ের দিনে উপস্থিত হইতে চাহেন, কিন্তু সেখানে কিরূপভাবে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন,না জানিয়া একটু সঙ্কুচিত ছিলেন। বিনা টিকিটে যাইতে পারিবেন ও অনাদৃত হইবেন না, একথা তাঁহাকে বুঝাইয়া ছিলাম। আমি দেবীবাবুকে ও ৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম; তাঁহারা উভয়ই সমাদরে সভাস্থ হইয়াছিলেন। এ সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই এই নাটক অভিনয় অন্যায় মনে করিয়া-ছিলেন। ইহার পরে, আমাদের মধ্যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা হইত; তিনি তখন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে একদিনও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখি নাই। সাহিত্যবিষয় হউক, সমাজ সম্বন্ধে হউক, তাঁহাকে সর্ব্বদাই অসাম্প্রদায়িক দেখিয়াছি। এখানে দেবীবাবুর ধর্ম্মসমাজ সম্পর্কে যাহা লিখিলাম তাহা আমার কলিকাতায় কলেজে পড়িবার সময়ের কথা।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের যে সকল কাজের সঙ্গে আমার সংস্রব ছিল,

যাহা আমি তাঁহার কাছে থাকিয়া নিজে দেখিয়া'ছি, তাহারই গোটাকতক কথা লিখিলাম। তাঁহার জীবনচরিতের কথা জানি, তাঁহার গুণাবলীর কথা অনেক বলিতে পারিতাম, কিন্তু সে সকল কথা লিখিবার যোগ্যতর লোক আছেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

তর্পণ।

পূর্ব্ববঙ্গ রত্ন-ওগো সাহিত্য-সন্ন্যাসী,
মহিমায় সমুজ্জ্বল দীপ্তি সাধনার,
বিশ্বের কল্যাণ-কামী,অপূর্ব্ব তেয়াগী,
লহ আজি অশ্রু-ঢালা অঞ্জলি আমার।
দরিদ্র-বান্ধব ওগো দুর্ব্বলের বল,
পতিত-আশ্রয়-দাতা, প্রশান্ত, উদার,
নির্জ্জীবে সঞ্জীবকারী, অতুল-মহৎ,
লহ আজি ভক্তি-মাখা অঞ্জলি আমার!
অনন্ত নির্ভরশীল কঠোর সাধক,
বিপদে নির্ভীক, কামী কৃপা বিধাতার,
বিবেক-বাঞ্ছিত-পথ একান্ত আশ্রিত
লহ আজি প্রীতিময় অঞ্জলি আমার!
দিগন্ত বিস্তৃত ওই জলাকীর্ণ 'বিল',
ওই পদ্ম, ওই হংস দিতেছে সাঁতার,
ওই তব জন্মভূমি,—আমি তারি কাছে,
পূর্ব্ববঙ্গবাসী,—লহ অঞ্জলি আমার!

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

শ্রাদ্ধবাসরে।

অকস্মাৎ সে দিন দারুণ দুঃসংবাদের টেলিগ্রাম পাইয়া, যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতন দেবগৃহের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম, তখন ট্রেণে,সমস্ত রাত, তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় অবধি সমুদায় ঘটনা বায়োস্কোপের ছবির মতন একে একে চোখের সামনে খেলিয়া যাইতে লাগিল! অতি তুচ্ছ খুঁটি নাটি, এত দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও উজ্জ্বলভাবে চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে এমি এক হেমন্তের প্রভাতে ভাই বোনদের সঙ্গে খেলায় মগ্ন আছি, এমন সময় পিতা ডাকিলেন। পিতার আহ্বানে ছুটিয়া গিয়া দেখি, মাতা সেখানে, এবং তাঁহাদের সঙ্গে সৌম্যমূর্ত্তি প্রসন্নবদন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আলাপ করিতেছেন। মাতার আদেশে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম,তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে বলিলেন,"জান মা,আমার মা নাই তাই আমি "আমার মা" খুঁজিতে বাহির হইয়াছি। সেইজন্য পদ্মা মেঘনা পার হইয়া, আজ আমি তোমাদের দেশে আসিয়াছি।"

ক্ষুদ্র বালিকারূপে এ গৃহে প্রবেশ

করিয়াছিলাম। খেলা ধূলা ও পড়া-শোনা ভিন্ন সংসারের কোন ভাব তখনও মনে জাগে নাই। তাহাতেই বিভোর ছিলাম, এমন সময় তিনি স্নেহমুগ্ধস্বরে "মা" বলিয়া ডাক দিলেন। লৌহ যেমন চুম্বকে আকৃষ্ট হয়—বন্যহরিণী যেমন বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়—ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় লইয়া, তাঁহার সেই মধুর আহ্বানে আমি সেইরূপ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শ্বশুর মহাশয়ও প্রথম দৃষ্টিতেই আমার প্রতি কি এক মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। নিতান্ত সংসারঅনভিজ্ঞা বালিকা বলিয়া, আমার পিতামাতার মনে তাঁহাদের আদরিণী কন্যার জন্য অত্যন্ত ভয় ছিল; কিন্তু তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের আভাস পাইয়া শ্বশুর শাশুড়ির নিকট যথোচিত আদর ও সদ্ব্যবহার পাইব আশা করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

তখন দেখিয়াছিলাম, তাঁহার অন্তরের কি কমনীয়তা, অন্য দিকে কি তেজস্বিতা, কি বজ্রের ন্যায় কঠোরতা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কি অক্লান্ত পরিশ্রমের শক্তি! যে একবার তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছে, বা তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে,তাঁহার জন্য প্রাণপণে সাধ্যানুসারে তিনি সব করিয়াছেন। অন্যের সুখ সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কখনও কখনও পরিজনের উপর কঠোর ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমার বিবাহের কিছুকাল পরে তাঁহার একবন্ধু অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া এই গৃহে আসিলেন, তখন দেখিলাম লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া নিবার জন্য তাঁহার কথা বলিবার কি মিষ্ট ভঙ্গি; মিষ্ট কথায় ভুলিয়া সেই রোগীর জন্য রাত্রি জাগিতে ও অবিরত বমি পরিষ্কার করিতে কেহই কুণ্ঠা বোধ করি নাই। আরো দেখিলাম, তাঁহার কি অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি! সেই বন্ধুর জন্য তিনি কি না করিলেন? কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বন্ধু এই গৃহেই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সন্তানদের তিনি নিজ সন্তান নির্ব্বিশেষে গৃহে স্থান দিলেন। বন্ধুর অবর্ত্তমানে তাঁহার সন্তানদের প্রতিপালনের চেষ্টা করা সাধারণ হৃদয়ের কথা নয়।

যখনই যে কেহ এখানে আসিয়াছেন তিনি পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সাহায্যপ্রার্থী তাঁহার নিকট আসিয়া, বিমুখ হইয়া ফিরিয়া প্রায় কেহ যায় নাই। কত অনাথ ও অনাথাকে নিজ গৃহে স্থান ও অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন; ও কত কন্যাকে নিজ কন্যা নির্ব্বিশেষে বিবাহ দিয়াছেন।

এক দিন যাঁহার সহিত পরিচিত বা যাঁহার কাছে উপকৃত হইয়াছেন, তাহা কখনও ভুলিতেন না। আলাপ হইলেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেন। যে দিন প্রথম তিনি শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীকে নিয়া কলিকাতায় আসেন, সে দিন গাড়ী ভাড়া দিবার পয়সা তাঁহার হাতে ছিল না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই ভাড়া দিয়াছিলেন। এই উপকারটী তিনি চিরজীবন মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, ও কত বার আমাদের নিকট একথা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

খাইতে ও খাওয়াইতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। নিজে বেশ খাইতেও পারিতেন। তাঁহাকে যিনি একবার খাওয়াইয়াছেন

তিনিই জানেন তাঁহাকে খাওয়াইয়া কি সুখ ছিল। কিন্তু কোন দিনও রান্না খারাপ বা কম হইলে এতটুকু অতৃপ্তির সহিত খান নাই। সামান্ত শাক ভাতও তৃপ্তি সহকারে খাইয়াছেন।

আহার্য্য দ্রব্যের ভিতর দুধ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যখনই তাঁহাকে দুধ দিয়াছি, নিজে খানিকটা খাইয়া প্রায় প্রতিদিনই আমাকে দিতেন ও খাইতে বাধ্য করিতেন। কতদিন এমন হইয়াছে যে, রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, নীচে রান্নাঘর হইতে দুধের বাটি নিজে হাতে করিয়া আনিয়া আমায় ঘুম হইতে ডাকিয়া জাগাইয়া জোর করিয়া খাওয়াইয়া তবে গিয়াছেন। আমি কত সঙ্কুচিত হইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই ছাড়েন নাই।

বিলাসিতা বা সুখস্পৃহা বলিয়া কোন জিনিষই তাঁহার ছিল না। চিরকাল এক ভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন। কোনদিন ভাল কাপড় বা সাজসজ্জার পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজের বেশভূষায় কোন আড়ম্বর ছিল না। কোন কাজের জন্য পরের উপর নির্ভর করেন নাই। প্রতিদিন স্নানান্তে, শেষদিন পর্য্যন্ত, নিজের কাপড়টী স্বহস্তে ধুইয়াছেন। নিজের শোবার ঘরের আসবাবও আফিস ঘরের টেবিল চেয়ার প্রভৃতি প্রতিদিন স্বহস্তে ঝাড়িতেন, মুছিতেন। কোথাও এতটুকু ভাঙ্গিলে বা রং উঠিয়া গেলে নিজ হাতে মেরামত করিয়াছেন। যে কোনরূপ ময়লা নিজে পরিষ্কার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যেমন আত্মনির্ভরশীল তেমনি অক্লান্তকর্ম্মী! কার্য্যে উচ্চ নীচ জ্ঞান করিতে নাই, কথায়ও কার্য্যে প্রতিনিয়ত তাহা দেখাইয়াছেন। (Dignity of Labour) পরিশ্রমের মর্য্যাদা যেন তাহাতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

গত ১৩১৩ সালে ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ে যখন খুব দুর্ভিক্ষ হয়, তখন তিনি Relief Committeeর পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় ছয়মাস সময় লাগিয়াছিল। তাহার ভিতরে দুই মাস, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারিয়াছিলেন; আর বাকি ৪মাস কখনও একবেলা খাইয়াছেন, কখনও বা সারাদিন অনাহারে গিয়াছে। চাউল বিতরণের সময় (তাঁহার নিজ মুখেও শুনিয়াছি এবং ওখানকার স্থানীয় লোকের মুখেও শুনিয়াছি) একাদিক্রমে ২০ ঘণ্টা ত মধ্যে মধ্যেই হইয়াছে.দু-একদিন ২৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত একাসনে বসিয়া তাহা বিতরণ করিয়াছেন। এই ২০ ঘণ্টা বা ২৭ ঘণ্টার মধ্যে আহার নিদ্রা বা একটু উঠা কিছুই করেন নাই। ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় একাসনে বসিয়া অবিরত চাউল বিতরণ করিয়াছেন। ১৩১৩ সালের কার্ত্তিকমাসের নব্যভারতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা না থাকিলে এরূপ কেহ কি করিতে পারে? খাল বিলের অপরিষ্কৃত অবিশুদ্ধ জলে ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। সে স্থানে গিয়া, তথাকার লোকদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, তাদের সঙ্গে সমান ভাবে থাকা, যেন তাদেরই একজন, এইরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শরীর তাঁহার অন্যতম প্রধান সহায় হইলেও ইহাতে মনের কতখানি জোরের দরকার সহজেই বোঝা যায়। দুর্ভিক্ষে দীন দুঃখীর সেবা করিতে পারিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় খুব ইচ্ছা ছিল যে যদি কোন সুবিধা হয়, দুর্ভিক্ষের কাজ করিতে যাইবেন, কিন্তু সে সুবিধা হয় নাই, সে জন্য অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ফরিদপুর সুহৃদসভা ও উলপুর রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার জলন্ত প্রমাণ। তাঁহার জন্মভূমি উলপুরে আমরা একবার যাই তাঁহার খুব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সেখানে থাকিবার সেরূপ সুবিধা না থাকায়, আমরা কোন অসুবিধা বোধ করিয়া পাছে তাঁহার জন্মভূমিকে সেই চক্ষে দেখিতে না পারি, এই আশঙ্কায়, আমরা যাইতে চাহিলেও নিয়া যান নাই। বলিয়াছিলেন, "ডাক্তারখানাটী পাকা করিয়া নেই, তোমাদের থাকিবার মত ভাল বন্দোবস্ত করিয়া তোমাদের নিয়া যাইব।"

ব্যক্তিত্ব তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়াতে, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল বলিয়াই, নিঃসম্বল কপর্দ্দকহীন অবস্থায় পতিত হইয়াও, নিজের পায়ের উপর এমন করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তিত্ব যখন অন্যের মতের সহিত প্রতিহত হইত, অশান্তির মাত্রাও তখন সেইরূপই তীব্র হইত; তাহাতে অনেকের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হইয়াছে। সেই হিসাবে, বিশেষতঃ পুত্রবধূ আমি, আমার কোন প্রতিবাদ সহ্য করিবার মতন শক্তি তাঁহার মতন প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমানীর না থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু জানিনা কেন, সর্ব্বদাই কোন প্রবন্ধ বা কাহারও জীবনী লিখিয়াই আমাকে পড়িতে দিয়াছেন। ও মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি তাহাতে কত সময় মনে মনে গর্ব্বও অনুভব করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে কোন আপত্তির কারণ ও স্থান দেখাতে সাহস করিয়াছি। অবশ্য সকল সময় আমার কথা তিনি শোনেন নাই; কিন্তু অনেক সময় আমার আপত্তি অনুসারে বদলাইয়াছেন ও পরিবর্ত্তনের বলিয়াছেন, 'দেখ, তুমি একথাটি ব'ললে, তাই তোমার কথার সম্মান রাখিবার জন্য এটা এরূপ করিলাম বা ছাড়িয়া দিলাম।" প্রতিবারই আমি ভাবিয়াছি, ইহার পরে আর কোন লেখা আমায় দেখাইবেন না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা দেখাইয়া লইয়াছেন। কত সময় ভাবিয়াছি শক্তিতে ও সম্পর্কে কত ছোট আমি, কিন্তু স্নেহে তিনি কত উচ্চ স্থান দিতেছেন!

আমার দ্বিতীয় পুত্র প্রণবের মৃত্যুর আকস্মিক আঘাতে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় ও মনে মনে ঈশ্বর বিদ্রোহী হইয়া উঠি। তিনিও এ আঘাতে অত্যন্ত শোক পাইয়াছিলেন। আমার বিবাহের পর এই ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আনন্দের মাত্রা এত অধিক ছিল যে, তিনি উপাসনার সময়, সর্ব্বদাই বিশ্বজননীকে, 'প্রসন্নময়ী জননী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু ইহার পর, আর তাহা করিতে পারেন নাই। মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে প্রণবের মৃত্যু হয়; সেই হইতে প্রতি মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে তিনি নিয়মিতরূপে একাকী আমায় নিয়া সমানে উপাসনা করিয়াছেন। শরীরের জন্য দীর্ঘ আটমাস কাল দেওঘরে ছিলাম, তখন আমার একরাত্রে জ্বর অত্যন্ত বেশী হয়। সমস্ত রাত শ্বশুর মহাশয় আমার শিয়রে বসিয়া কাটান। কিছুদিন আমার একটি পা ফুলিয়া ছিল, আমার শত সঙ্কোচ সত্ত্বেও, তিনি

গরম জলে ফোমেণ্ট করিয়া, প্রায় মাসাধিক কাল প্রত্যহ নিজে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছেন। তারপর ২।৩ বার পায়ে আঘাত লাগিয়া ঘা হইয়াছে, তিনি দেখিতে পাইলে পায়ে হাত দিয়া ঘা ধুইবেন ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবেন এই সঙ্কোচে তাঁহাকে লুকাইয়া চলিতে কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তীক্ষ্দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই। সর্ব্বদা নিজ হাতে ধোয়াইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঘা শুকাইলে তবে ছুটি দিয়াছেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ আমার খুব বেশী জ্বর হয়। আমি জ্বরাক্রান্ত হইতেই, কাছে বসিয়া সমস্তক্ষণ মাথায় জল বরফ দিয়াছেন,নিজ হাতে বমি পরিষ্কার করিয়াছেন, মুখ ধোয়াইয়া দিয়াছেন। আমার এক মাসীমা তখন কলিকাতায় ছিলেন; তিনি আমার আরোগ্য লাভের পর বলিলেন, "তোমার শ্বশুরের তোমার প্রতি স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমি দেখিয়া অবাক হইয়াছি ঠিক মায়ের মতন তোমার সেবা করিলেন; এই বয়সের একজন পুরুষের, বিশেষতঃ শ্বশুরের,এইরূপে তোমার বমি পরিষ্কার করা সহজ কথা নয়।"

বৎসরাধিক পূর্ব্বে একদিন দুপুরে হঠাৎ তাঁহার heart এর অসুখ হয়। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া ঘাম ও সমস্ত শরীর ঘামিতে থাকে। তখন বাড়ীতে কেহই ছিল না। নিজেই আমায় ঔষধের নাম বলিয়া দিলেন, আমি সেই সেই ঔষধ দিলাম। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র মহাশয়কে ডাকিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, "আজ আপনি আসার পূর্ব্বে যে আমার মৃত্যু হয় নাই, সে কেবল বৌমা-রের জন্য। আজ এতক্ষণ সে-ই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। এখন আপনি রক্ষা করুন," বলিয়া কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাকে কোন কারণে আমাকে একটু শক্ত কথা কহিয়াছিলেন সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ইহাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি, কখনও তিরস্কার করিনা. বিশেষতঃ ইহার পিতার মৃত্যুর পর সে যাহাতে সেই অভাব অনুভব না করে সমানে সে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সেদিন তাহাকে এমন তিরস্কার করিয়াছি" বলিতে বলিতে একেবারে উচ্ছসিত হইয়া ছেলে মানুষের মতন কাঁদিয়া ফেলিলেন। বড় ছোটকে তিরস্কার করিয়া থাকেন, হয়ত কখনও অন্যায়রূপেও হইতে পারে, কিন্তু ছোটর সম্মুখে কে তাহা অন্যের নিকট স্বীকার করিয়া কাঁদিতে পারে? নাতি ও নাতিনীদের প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তাহাদের কান্না শুনিলে যেখানেই থাকুন, শতকাজ ফেলিয়া, এমন কি অধিক রাত্রিতেও শয্যা হইতে উঠিয়া আসিতেন। তাহাদের ছাড়া তাঁহার খাওয়াই হইত না। নিজের প্রিয় জিনিষ কখনই একা খাইতে পারিতেন না। সর্ব্বদা ওদের তো ভাগ দিতেনই, আমাকে পর্য্যন্ত ভাগ না দিয়া তৃপ্তি পাইতেন না।

বঙ্গ ভাষা তাঁহার জীবনের সাধনার ধন ছিল। সর্ব্বদাই বলিতেন, সাহিত্যের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয়। কত চিঠি যে পাইয়াছি, কত লোক যে বলিয়াছেন, যখন তাঁহারা প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন, হয়ত লেখা তেমন বিশুদ্ধ হয় নাই. তবুও, তিনি উৎসাহ দিয়াছেন, 'নব্যভারতে' লেখা ছাপাইয়া মাতৃভাষার সেবক

হইবার জন্ম উৎসাহিত করিয়াছেন। শেষ দিকে, বার্দ্ধক্যে,নিজের ছাপাখানার অভাবে, 'নব্য ভারত' যে কষ্টে চালাইয়াছেন তাহা বলিবার নয়। কিন্তু তাহা ছাড়িতে পারেন নাই। 'নব্য-ভারত' আর বোধ হয় রাখিতে পারিলাম না, বলিতে গিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।

দেশের উন্নতির জন্ম তাঁর প্রাণ অত্যন্ত কাঁদিত ; প্রায়ই বলিতেন, দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্র হইয়া না মিশিতে পারিলে, তাহাদেরও উন্নতি হইবে না, দেশেরও উন্নতি হইবে না। তাই তিনি দরিদ্রের সঙ্গে সমভাবে মিশিয়াছেন। বাজারে দোকানে লোকদের নিকট হইতে জিনিষ কিনিতে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে কি মিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন! বয়স্ক ও বৃদ্ধ লোকদের পর্য্যন্ত গায়ে মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়াছেন (আমরা অনেক সময় তাহা দেখিয়া হাসিয়াছিও) এবং তাহাদের প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এজন্য সেদিন বিচালিওয়ালা, মিস্ত্রী, দপ্তরী প্রভৃতি লোকেরা আসিয়া কি কান্নাই না কাঁদিতেছিল।

আত্মনির্ভরশীল ছিলেন বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেন না। তাহাতে অনেক বিরোধও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে ও অনেক সময় অনেককে হয়ত অন্যরকম মনে করিয়াছেন। কিন্তু যখনই তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়াছেন আবার একেবারে গলিয়া গিয়াছেন। জামাতার মৃত্যুর পর তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার শোক তাঁহার নিকট তীব্র মর্ম্মঘাতী হইয়াছিল। তাহার পর নানাদুঃখে হৃদয়ের সরসতা আর সেইরূপ রাখিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত নানারূপ বিরোধ হওয়া সত্বেও ব্রাহ্মসমাজকে তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছেন। প্রায় চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সেদিন যখন প্রথম heartএর অসুখের প্রবল আক্রমণ হয়,সেদিন সমস্ত রাত জাগিয়া আমাদের কত কথাই বলিয়াছিলেন। "তোমরা কখনও ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িও না। যদিও আমার সহিত নানা বিষয়ে বিরোধ হইয়াছে,তথাপি—নিশ্চয় জানিও,ব্রাহ্মসমাজ আমার প্রাণের প্রিয় জিনিষ।"

সেই রাত্রেই পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"আমি জানি তুমি বউমাকে যত্ন কর, আদর কর—তবুও যদি এবার আর না উঠি—আর যদি বলা না হয়, তাই বলি—আমি অনেক সাধ করিয়া, অনেক অনুসন্ধান করিয়া, মেঘনার ওপার হইতে "আমার মা" আনিয়াছি, তাহাকে একটুও অযত্ন বা অবহেলা করিও না। করিলে পরলোকেও আমি প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইব।"

বিবাহের পূর্ব্বদিন তিনি আমার পিতৃগৃহে যাইয়া আমাকে তাঁহার বধূমাতা রূপে বরণ করিয়াছিলেন। সেই 'বধূমাতাবরণ' যেন গদ্যে একখানি কবিতা। তাহাতে এক জায়গায় আছে—"আমি বাল্যকাল হইতে মাতৃহীন ; তুমি আজ মাতৃহীনের মাতা হইয়া একবার জগতের দ্বারে আত্মত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া দাঁড়াও। তুমি আজ এই বরণ-মণ্ডপে এই মাতৃত্ব-সাধন ব্রত গ্রহণ কর এবং আমাকে অভয় দেও যে, আমি শত অপরাধ করিলেও কখনও তাহা মনে রাখিবে না এবং আমাকে স্নেহ আশ্রয় দানে কৃতার্থ করিবে।" আজ অশ্রুজলে স্নাত হইয়া সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে অন্তরের শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, তিনি

আমার মুখ রক্ষা করিয়াছেন, কত সময় একান্ত দুঃখে মন অভিভূত হইয়াছে, কিন্তু, অসহায়ের সহায় পরম পিতা নিজে হাতে ধরিয়া, আমাকে কর্ত্তব্যপথে স্থির রাখিয়া চালাইয়াছেন। আজ তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা আমার নাই।

'নব্যভারত' এক ফর্ম্মা ছাপান বাকি রাখিয়া ৪।৫ দিনের কথা বলিয়া তিনি দেওঘরে যান। এত বৎসরের ভিতর কখনও 'নব্যভারত' শেষ ও বাহির না করিয়া কোথাও যান নাই। সে কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন ৪।৫ দিনের জন্য যাইতেছি। ইহার পর পুরীতে গিয়া বেশী দিন থাকিতে হইবে। তুমি ইহার মধ্যে শেষ ফর্ম্মাটী করাইয়া রাখিও, আমি আসিয়া কাগজ ডাকে দিব ও তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া পুরী গিয়া কিছুদিন থাকিব।" দেওঘরেও সকলের নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন।

শেষ ফর্ম্মা, তাঁহার আদেশ মত আমাকেই করাইতে হইল, কিন্তু 'নব্যভারত' বাহির করা যে তাঁহার চিরদিনের মতন শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা জানিতাম না। ৪।৫ দিন পরে আসিব বলিয়া, একজন লোকও সঙ্গে নিলেন না; স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই—সেই বিদায় চিরজন্মের মতন বিদায়—সেই যাওয়াই তাঁহার শেষ যাওয়া, আর তিনি তাঁহার এত সাধের "আনন্দ আশ্রমে" ফিরিয়া আসিবেন না।

দেবগৃহে গিয়া, গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, গৃহের ভিতর যে দৃশ্য দেখিয়াছি—মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা আমার তীক্ষ্ণশলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্য ও সেই অনুভূতি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এখনও মনে করিতে সমস্ত শরীর মন শিহরিয়া উঠিতেছে। পরিবারের সকল ও বাহিরের কত লোক যাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত,এতটুকু অনাদরে যাঁহার অভিমানে আঘাত লাগিত, সেই দুর্জ্জয় অভিমানী, তেজীয়ান পুরুষ, অনাদরে অযত্নে কঠিন পাষাণের উপরে, মরণের কোলে গা ঢালিয়া চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন! এ পৃথিবীর রঙ্গালয়ে তাঁহার অভিনয় চিরদিনের মত শেষ হইয়া গিয়াছে! নিজের চোখ ও নিজের মনকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না—যিনি কখনও কোন জিনিষ বিনা বিচারে গ্রহণ করেন নাই এবং যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা শেষ না করিয়া ছাড়েন নাই, সেই ব্যক্তি, এই পৃথিবীতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বে, কি করিয়া বিনা বিচারে ও নির্ব্বিরোধে মৃত্যুর দূতের হস্তে, পরাজয় স্বীকার করিয়া, আত্মসমর্পণ করিলেন, এ প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

রহস্যময় বিশ্বদেবতার প্রহেলিকা ভেদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি, একবার যে তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া শেষ আশীর্ব্বাদ চাহিয়া নিবার সময় ও সুযোগ পাইলাম না। আমার অতি সামান্য ত্রুটি হইলে অভিমানে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত; এই দীর্ঘকাল আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতন রাখিয়া শেষকালে যাওয়ার সময় ফাঁকি দিয়া গেলেন। শেষ মুহূর্ত্তে প্রিয়জনের মুখ দেখিবার আশীর্ব্বাদ-বাণী শোনাইবার সেবা পাইবার জন্য তাঁহার দেহমন না জানি কতই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল! এ দুঃখ এ ক্ষোভ যে রাখিবার ঠাঁই নাই। আজ তাঁহার চরণে সকল

অপরাধ ও সকল ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। বিদেহী তিনি আজ আমাদের সঙ্গে একাত্মক হইয়া আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। বিশ্বপিতা তাঁহাকে স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় ও চিরশান্তি দান করুন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পুণ্যভূমি দেবঘরে, প্রকৃতিমাতার ক্রোড়ে
কে তুমি শুয়েছ দেব? অন্তিম শয়নে!
বীরের বাঞ্ছিত নিধি, তোমারে দিলেন বিধি,
সার্থক হইল পূজা মহাসন্ধি-ক্ষণে!
আনন্দ-আশ্রম-বাসী, অকাতরে ভালবাসি,
কত দে'ছ স্নেহ দয়া আত্ম-বিতরণ।
অন্নহীনে অন্নদিয়া, ক্ষুধাতুরে বাঁচাইয়া,
মুছালে চোখের জল ঘুচালে বেদন।
কর্ম্ম-বীর কর্ম্ম-লাগি', ভীষণ শ্মশানে জাগি',
দুর্ভিক্ষ দানবে কত, করিয়াছ জয়।
অবিচার অত্যাচারে, কঠিন নিগড় ভারে
ভাঙিয়া পড়েনি কভু ও বীর হৃদয়!
তোমার স্নেহের চক্ষে, ও তব বিশাল-বক্ষে,
ঠাঁই পেয়ে ধন্য হল কত অভাজন!
জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে, ডাকিয়াছ ভালবেসে,
আনন্দ-আশ্রম মুক্ত সবারি কারণ।
ভাগবতী তনু লয়ে, যাও দেব! নিজালয়ে
ঘুচে যেন যায় তথা হৃদয়-বেদন।
ধরণীর দুঃখ দ্বেষ, সবি যেন হয় শেষ,
অনন্ত শান্তির জলে হয়ে নিমগন।

অনন্ত নীরধি-নীরে, জীবন-তরণী ধীরে
প্রেমের বাদাম তুলি' যাইল ভাসিয়া।
ভব কর্ণধার যিনি, আপনি লইলা তিনি,
কর্ম্মবীর পুত্রে তাঁর, বাহু প্রসারিয়া।
দুঃখ জ্বালা অবসান, হইল হে মহাপ্রাণ!
পোহাল তোমার এবে জীবন যামিনী।
জয়মাল্য লয়ে করে, দাঁড়ায়ে তোমার তরে,
আছেন সেথায় দেবী কমল-কামিনী!
হে দেবি! প্রসন্ন হয়ে, লয়ে তব প্রেমালয়ে
দেখাও তোমার চির-প্রসন্ন আনন!
যত ব্যথা হাহাকার, করে দাও চুরমার।
বহাও জীবন-মূলে প্রীতি প্রস্রবণ!
বরিষ আশীষ-রাশি, হে আনন্দ-ধাম-বাসী!
খেলা সাঙ্গ হলে যবে মুদিব নয়ন।
তব পদ চিহ্ন ধরি', তব পথ অনুসরি,
তেয়াগিতে পারি যেন এ ভব-ভবন!
আজি এ শ্রদ্ধা-অঞ্জলী, লহ দেব পুষ্পাঞ্জলী,
হোক্ দীন অধমের, সফল জীবন!
পদ-ধূলি লয়ে শিরে, সময়-সাগর-তীরে,
জীবনের মহাপূজা করি সমাপন।

শ্রীনগেন্দ্রবালা ঘোষ।

দেবীপ্রসন্ন ও "নব্যভারত"।

দেবীপ্রসন্ন তিরোধান করিয়াছেন, তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার মত লোক ত সারা বাঙ্গালায় খুঁজিয়া পাইনা। কর্ম্ম ও বচনের সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি যে মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এদেশে একান্তই দুর্ল্লভ। 'নব্যভারতে'র মধ্য দিয়া দেবী-প্রসন্নকে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি, কর্ম্ম-ক্ষেত্রেও দেবীপ্রসন্ন সেই দেবীপ্রসন্নই ছিলেন। এমন উদার চেতা এমন নির্ভীক, এমন সত্যনিষ্ঠ, এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্ম্মীও সাহিত্যিক বাঙ্গালা দেশের পক্ষে, বিধাতার এক অভিনব দান।

নানা প্রতিবন্ধকের মধ্যদিয়াও দেবীপ্রসন্ন যেভাবে কিঞ্চিন্ন্যূন চল্লিশ বৎসর কাল 'নব্যভারত'কে চালাইয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর সাহিত্যানুরাগ এবং চিত্ত দৃঢ়তারই পরিচয় পাওয়া যায়। জন-তুষ্টির দিকে দৃষ্টি, রাখিয়া যে এক চঞ্চল ব্যবসাদারী সাহিত্য,এদেশে ভরিয়া উঠিতেছে সেরূপ সাহিত্যে গা ভাসাইয়া তিনি ব্যক্তি-ত্বকে বিসর্জ্জন দিতে যান নাই। যুগস্রোতের উর্দ্ধে তাঁহার লক্ষ্যকে ধ্রুব নিশ্চল রাখিয়া তিনি চলিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যকে সাহিত্যের সার্থকতার দিক হইতেই দেখি-তেন। ব্যক্তিগত হীন লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ আনিয়া বিপণি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তাঁহাতে ছিল না। আজ এই লঘু সাহিত্য-প্রীতির যুগে এদেশের কতকগুলি মাসিক পত্র যে ভাবে পাঠক সাধারণের মন যোগাইয়া আসিতেছে, তাহাদের সহিত ভাব করিয়া চলিতেছে, সেরূপ চেষ্টা করিলে হয়ত 'নব্যভারতে'র বিক্রয় শতগুণ বৃদ্ধি পাইত; কিন্তু দেবীপ্রসন্ন সেই লাভের মাঝে আয় বিক্রয়ের লোকসানকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাই 'নব্যভারত' সাধারণ চক্ষের চাকচিক্যকে বাদ দিয়া তাহার জীবনারম্ভের লক্ষ্যকে একই ভাবে বহিয়া লইয়া চলিয়াছিল। 'নব্যভারতে'র কথা বলিতে বসিয়া আজ আমাদের দুঃখ হয়, যে, বাঙ্গালী তাহার মনকে কেমন হালকা করিয়া গড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে লঘু সাহিত্যেরই প্রচার দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এদেশের পাঠক গল্প বা উপ-ন্যাসেরই পাঠক। আনাচে কানাচে, হিন্দুর ঘর ছাড়াইয়া মুসলমানের সুদৃঢ় পর্দ্দার ভিতর পর্য্যন্ত গল্প উপন্যাস্ প্রবেশ করিয়া আরামের সামগ্রীরূপে পূজিত হইতেছে। গল্পোপন্যাসের প্রেমের নেশার আরামকে আমরা যে পরিমাণ বরণ করিয়া লই, কোন রূপ মস্তিষ্ক পরিচালনার ক্লেশ হইতে সেই পরিমাণেই তফাৎ থাকিতে চেষ্টা করি। সেইজন্যই দর্শন বিজ্ঞানাদি সাহিত্য আমা-দের দেশের বাজারে অচল। মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা খুলিলে দেখিতে পাই, যতগুলি নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহার পনর আনাই গল্প বা উপ-ন্যাস। অবশ্য সুরচিত গল্প বা উপন্যাসের যে সাহিত্যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তাই বলিয়া ইহাই সাহিত্যের যথা সর্ব্বস্ব নয়। এক

বৎসরের ভিতর একজন গ্রন্থকারেরই বারো খানা উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। 'ছয় আনা সংস্করণ,' 'বারো আনা-সংস্করণ,' 'টাকা-সংস্করণ' প্রভৃতিতে যত পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, উহার সমস্ত গুলিই উপন্যাস বা গল্প।

দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসাদি সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ ত এইরূপ সংস্করণ নামে প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। এইরূপ কোনো সংস্করণ বিশেষের বিজ্ঞাপন দেখিলেই যেন ধরিয়া লইতে হইবে যে, উহাতে হয়ত গল্প, নয়ত উপন্যাসের তালিকা। সংস্করণের নামে এমন সংস্কারত অন্য কোন দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে জন্মেনা। সে সব সংস্করণে যেমন গল্পোপন্যাস আছে, তেমন অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাদিও আছে, আমাদের দেশে যে অন্যরূপ হয়, তাহার কারণ, আমরা সাড়ে পনরো আনাই গল্পোপন্যাসের পাঠক; আমরা কেবল গল্পোপন্যাসই চাই। তাই যেমনি চাহিদা তেমনিই যোগান্। অন্যান্য দেশে যে গল্পোপন্যাস কম কিংবা সেরূপ সাহিত্যের প্রতি লোকের রুচি বা আদর কম, তাহা নয়, তবে সেই তুলনায় বিভিন্ন সাহিত্যের প্রচার কিংবা পাঠক সংখ্যা আমাদের দেশের মত এমন সাংঘাতিক রকমে কম নয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই দেবীপ্রসন্ন 'নব্যভারত'কে গল্পোপন্যাস হইতে মুক্ত রাখিয়া এক শ্রেণীর পাঠক সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন। দেশের একদল লোকও উপন্যাস প্লাবনের মধ্যে এইরূপ একখানা মাসিক পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। 'নব্যভারত' ব্যতীত আরও অল্প সংখ্যক কয়েক খানা মাসিক পত্র এইরূপ লক্ষ্য লইয়া দেখা দিয়াছিল। উহাদের কয়েকখানা 'নব্যভারতে'র অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াও অচিরেই বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু 'নব্যভারত'কে দেবীপ্রসন্ন তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শত বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। 'নব্যভারত'কে জীবিত রাখিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেশের লোকের নিকট কত কাতর ক্রন্দন করিয়াছেন। তথাপি সহজ পন্থা অবলম্বনে জন-তুষ্টির ব্যবস্থা করিয়া 'নব্যভারতে'র অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসী হন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'নব্যভারতে' ব্যবসায়ের গন্ধমাত্র ছিল না। সাধারণ কাগজে, ও বহুবার যুগ্ম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উহার গ্রাহক সংখ্যা তত অধিক ছিল না। তথাপি যা' তা' বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিবেন না বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দৈন্যের দায় হইতে 'নব্যভারত'কে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সেই প্রতিজ্ঞা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠা দেবীপ্রসন্ন চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার। কি সংসারে, কি সাহিত্যে, কি কর্ম্মে, কি বচনে এইরূপ দুইটী শ্রেষ্ঠ উপাদানের অভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের মনুষ্যত্ব কিরূপ ম্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে, তাহা ভাবিতে যাইয়া মনে হয়, "দেবীপ্রসন্ন, আজ দেশে, তোমার একান্তই প্রয়োজন"। আমাদের জাতীয় জীবনে সত্যোপাসনার অভাব, তাই আমাদের সাহিত্যিকের মনের কথায় প্রাণের জোর নাই। আমাদের সাহিত্যে কেমন একটা দ্বিধা, একটা সঙ্কোচ, একটা ভীরুতা।

রাজনীতিকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি যে কোনো বিভাগেরই উল্লেখ করিনা কেন, জীবনের লক্ষণ কোথায়ও পাওয়া যায় না।

কেবলই দাসত্ব; অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র আমাদের দাসত্বের রজ্জু। আধুনিক সাময়িক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই নিতান্ত ভাল মানুষীই ইহাদের অধিকাংশের লক্ষ্য। ভিড়ের মাঝে যাইয়া পাছে পরের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়া ব্যবসায় নষ্ট হয় এই ভয়ে নিতান্ত বাঁধা বুলিতে ইহারা চলিতেছে। সত্যসেবীর স্বাধীন মত প্রচারের প্রয়াস মোটেই নাই। ইহাতে যেমন একটা অসাড়তা তেমন সঙ্কীর্ণতাও দৃষ্ট হয়। এরূপ নির্জ্জীবতা ও সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেবীপ্রসন্নের 'নব্যভারতে' ছিল না। দেবীপ্রসন্ন তাহাতে সকলকেই স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দিতেন। গোড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিভিন্ন মতকে অবহেলা করিতেন না। সর্ব্বপ্রকারের ব্যক্তিগত স্বার্থ বর্জ্জন করিয়া সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা বিমুক্ত হইয়া তিনি নিজে যেমন নির্ভীক চিত্তে কথা বলিতেন অন্যকেও সেইরূপ কথা বলিবার অধিকার দান করিতেন। এমন কি, বিভিন্ন মাসিকপত্রিকা হইতে প্রত্যাখ্যাত অনেক সমালোচনা 'নব্যভারতে' স্থান লাভ করিত। প্রকৃত কথা, সত্যপ্রতিষ্ঠাই ছিল 'নব্যভারতের মূলমন্ত্র। দেবীপ্রসন্ন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দাসত্ব বা গোলামী করিবেন না; সেই প্রতিজ্ঞা সংসারক্ষেত্রে যেমন অটুট রাখিয়াছেন, সেই মন লইয়াই তিনি 'নব্যভারত'ও পরিচালনা করিয়াছেন। সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, আজ বাঙ্গলা সাহিত্যে নব্যভারতের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। আজ বাঙ্গলা সাহিত্যিকের প্রাণে 'নব্যভারতে'র সত্যোপাসনার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সত্যই, সাহিত্যের প্রাণ, একথা যতদিন না মানুষ বুঝে, ততদিন তাহার প্রকৃত সাহিত্য গঠিত হয় না। সাহিত্য, ব্যষ্টির স্বার্থ লইয়া নয়, সমষ্টির স্বার্থেই সাহিত্য। যেখানে সমষ্টির স্বার্থ, সেখানেই মিথ্যা, সেখানেই সত্যোপাসনার অভাব অনিবার্য্য। আজ সত্যের উপাসক, সাহিত্যের অকৃত্রিম ভক্ত দেবীপ্রসন্ন মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি তাঁহার পবিত্র শক্তিমান্ আত্মা বাঙ্গলায় সাহিত্যিকবৃন্দের দুর্ব্বল হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করুক।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

স্বর্গীয় সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দীন দরিদ্রের পিতা তুমি
কাঙ্গাল দুখীর বাপ্,
তোমার তরে আজি সবার
দারুণ শোক-তাপ।
কোথায় তুমি গেলে চলে
দীন দুখীদের ফেলে,
থাম্‌বেনা এ হায় হাহাকার
তোমায় নাহি পেলে।
দীনের জন্য কে দেয় অন্ন
এমন্ কে আর আছে?
ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র পরাণ
কেম্‌নে তবে বাঁচে?
তুমি ছিলে দয়ার সাগর
উদার মহান্ অতি,
দানে তুচ্ছ তোমার কাছে
কোটী লক্ষপতি।
কাঁদিতেছে সাহিত্যিক সব্
তোমায় হয়ে হারা,

এমন শিক্ষা পাবে কোথায়
বঙ্গদেশে তারা?
গদ্যে ছিলে সুপণ্ডিত
ভাবে ছিলে কবি,
তোমার মাঝে একাধারে
ছিল যেন সবি।
দিবানিশি সাহিত্যের
কর্‌তে তুমি সেবা,
তোমার মত দেশের মাঝে
বল আছে কেবা?
কর্ম্ম-জীবন ছিল তোমার
ধর্ম্মে ছিল মতি,
অল্পেতেই তুষ্ট ছিলে
যেমন পশুপতি।
তোমার তরে এদেশ যুড়ে
উঠ্‌ছে হাহাকার।
দীন দুখীদের চেয়ে দেখ
খুলি স্বর্গদ্বার।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

দেবীবাবু।

বাঙ্গালার অসংখ্য লেখকশ্রেণীর মধ্যে খাঁটী সাহিত্যসেবী দেখিতে পাই মাত্র দুই জন। প্রথম ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, দ্বিতীয় 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। সকলে সাহিত্য সেবা করেন, নিজ নিজ বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অবসর সময়ে, আর ইঁহারা করিয়াছেন, 'শয়নে, স্বপনে, জাগ্রত নয়নে'। অন্য কর্ম্মী হইয়া তাই শুধু ইহারা দুইজনই কেবলমাত্র সাহিত্য সেবার উপর নির্ভর করিয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রজনী বাবু বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। দেবী বাবু ছিলেন, তিনিও গেলেন; সুতরাং বাঙ্গালীর এক্ষেত্রে গৌরব করিবার আর কেহই থাকিলেন না।

দেবীবাবু বহু গ্রন্থের রচয়িতা, কিন্তু 'নব্যভারতে'ই যে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্যক পরিস্ফুটন হইয়াছে একথা বলিতেই

হইবে। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া বন্ধুর প্রশংসা, শত্রুর নিন্দা, উপকৃতের সকৃতজ্ঞ করুণ দৃষ্টি, অত্যাচারীর রোষ-কষায়িত ভ্রুকুটী কিছুতেই অধীর বা বিষণ্ণ না হইয়া নিজের সুর বজায় রাখিয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় 'নব্যভারতের মধ্য দিয়া তিনি যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহা কখনই বিস্মৃত হইবেনা।

এই ছবি উপন্যাস ও রঙ্গরস পূর্ণ চটুল-ক্ষেত্রে কি করিয়া কি অমানুষিক শক্তি ও সাধনা বলে যে তিনি নীরস কঠোর কর্ত্তব্যের দৃত 'নব্যভারতকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তাহা ভাবিতেও ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে স্বতঃই আমাদের মস্তক তাঁহার উদ্দেশে অবনত হইয়া আইসে।

গত ১৫ বৎসর ধরিয়া ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া আমরা সাহিত্যসেবায় ব্রতী হইয়াছি। প্রধান অপ্রধান প্রায় সমস্ত মাসিকপত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তবুও এতকাল মধ্যে 'নব্যভারতে কোন প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহস পাই নাই। আশঙ্কা, পাছে অনুপযুক্ত বলিয়া উহা ফেরৎ আইসে। যাহাহউক অবশেষে ১৩২৬ সালে ঝড়ের পূর্ব্বে 'আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতি বিষয়ক একটী প্রবন্ধ দেবীবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। আশা আমার, প্রবন্ধের দোষ ত্রুটী যাহাই থাকুক সাহিত্য রথীর নামের সংস্পর্শে উহা চলিয়া যাইবে। হইল ও তাহাই। প্রবন্ধ পাইয়া দেবীবাবু লিখিলেন, 'আপনার 'স্মৃতিপূজা' ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল। উহা এই সংখ্যায়ই যাইবে। এই শ্রেণীর আরও প্রবন্ধ সাদরে প্রকাশিত হইবে।

দেবীবাবুর এই আশ্বাস বাক্যে ও আশ্বিনমাসের 'নব্যভারতে' আমার প্রবন্ধ মুদ্রিত দেখিয়া আমার ভয় ভাঙ্গিল। ক্রমে 'অন্ধ কবি বরদাচরণ মিত্র' ও 'সখাপ্রবর্ত্তক প্রমদাচরণ সেন' শীর্ষক আর দুটী প্রবন্ধ পাঠাইলাম। দেবীবাবু এই উভয় প্রবন্ধই গ্রহণ করিয়া 'নব্যভারতে'প্রকাশ করিলেন। তারপর গত পূজার পূর্ব্বে একদিন আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়া উহা পাঠাইতে যাইতে-ছিলাম, এমন সময় আমাদের স্বগ্রামবাসী আত্মীয় শ্রীযুত গিরিজানন্দ সেন মহাশয় আসিয়া বলিলেন—'ওহে, শুনেছ, দেবীবাবু মারা গিয়াছেন ?" আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলাম 'কোন দেবীবাবু ?" তিনি উত্তর দিলেন—'আবার কোন দেবী-বাবু! 'নব্যভারত' সম্পাদক বাবু দেবী-প্রসন্ন রায়চৌধুরী'। দেবীবাবুর সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ কোন দিন হয় নাই, কাগজে প্রবন্ধ লেখার সম্পর্কে চিঠিপত্রের ব্যবহারও হইতেছে মাত্র এই এক বৎসর; তবুও এই সংবাদে আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল। দেবীবাবুর মৃত্যু আমার পরমাত্মীয় বিয়োগ মনে হইল। আর আমার অন্তঃস্থল মথিত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বাহির হইল 'একটা মানুষের মত মানুষ চলিয়া গেলেন'।

গিরিজাবাবু আমার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন 'একটা মানুষের মত মানুষই বটে'। এই বলিয়া তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনে কলিকাতা অবস্থান কালীন দেবীবাবুর প্রথম জীবনের অনেক কথা বলিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে মহিলা কুললক্ষ্মী কবি মানকুমারীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত অতীত ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্যসেবিগণ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। দেবী বাবুর কথা উঠিতেই তিনি বলিলেন—'হাঁ, খাঁটী সাহিত্যসেবী ছিলেন একজন, এই দেবীবাবু। এমন কায়মনোবাক্যে সাহিত্য সেবা করিতে আর বড় কাহাকেও দেখি নাই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও এমন অতি কম দেখিয়াছি যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে তিনি বজ্রাদপি কঠিন হইয়া অচল অটলভাবে নিজ-কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, কোন বাধা কোন প্রলোভনই তাঁহাকে সঙ্কল্প বিচ্যুত করিতে পারে নাই। আবার যেখানে অত্যাচার পীড়িতের ক্রন্দন, বিপন্নের করুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে সেখানেও কুসুম কোমল হৃদয় লইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই অগ্রসর হইতে দেখিয়াছি। পাপকে তিনি চিরকালই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু পাপীকে কোনদিনই ত্যাগ করেন নাই। দেবীবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে কোন দিনই স্পর্শ করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলার আর একটীমাত্র লোকের নাম করা যাইতে পারে; তিনি সিটীকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তাই মনে হয়, দেবীবাবুর স্থান আর সহজে পূর্ণ হইবে না।"

কবির সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও বলি—'দেবীবাবুর স্থান সহজে পূর্ণ হইবার নয়'। তবে ভরসা করি, তাহার পুত্র প্রভাতকুসুম বাবু পিতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কায়মনোবাক্যে দেশের ও দশের সেবা করিয়া পিতার যোগ্য সন্তানের গৌরব-লাভে সমর্থ হইবেন।'

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

১৮৮৫ কি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মাণিকদহ গ্রামে স্বর্গীয় বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোৎসবে দেবীপ্রসন্ন বাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় এবং আলাপ হয়। তিনি আমার অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। তবু তাঁহার সহিত আমার আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার পরে, এই ৩০।৩৫ বৎসর কাল ব্যাপিয়া বহুস্থলে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে হইয়াছে। এই মিলন এবং তাঁহার জীবনব্যাপী সেবা ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া,তাঁহার বিশেষত্ব কোথায় এবং দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা যেন অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। পরলোকগত আত্মার গুণাবলী উল্লেখ করিয়া সমুচিত শ্রদ্ধার্পণেই কল্যাণ হয়। দুর্ব্বলতার দিকগুলি উল্লেখে, সত্যের অপলাপ না হইলেও, তাহাতে জনসমাজের বিশেষ মঙ্গল হয় না।

দেবীপ্রসন্ন বাবুর প্রকৃত প্রকৃতি ছিল

পরদুঃখানুভূতির ভিতরে। এই মৌলিক সমবেদনা হইতেই বন্ধুপ্রীতি। লোকের দারিদ্র্যমোচন, দুঃস্থের সেবা, স্বদেশ ও জন্মভূমির হিতসাধনকল্পে দীনতা, জীবনে কৃচ্ছ্র সাধন প্রভৃতি ফুটিয়াছিল। এই সহানুভূতি ও সমবেদনাপূর্ণ প্রাণ লইয়া দেবীবাবু বহু নিরাশ্রয় ব্রাহ্মযুবক এবং ব্রাহ্মকন্যাকে পালন করিয়াছিলেন। যাহার কোথায়ও স্থান মিলে নাই, দেবীবাবু তাকে স্থান দিয়াছেন। দেবীবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা তাঁর সর্ব্বপ্রকার সাহচর্য্য, সাহায্যে এবং সুকোমল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। যিনি ইহাঁর উপরে নির্ভর করিয়াছেন, দেবীবাবু তাঁর জন্য সবই করিয়াছেন।

নিঃসহায় পাঠ্যাবস্থায় উদার ও অগ্নিময় ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণে তাঁর জীবনে অদম্য স্বাধীনতার স্ফুরণ হইয়াছিল। এই স্বাধীনতা বহুদিকব্যাপিনী। ইহারই বলে তিনি জীবনে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজে,উপাসকমণ্ডলীতে, বন্ধুতার স্থানে বিদ্রোহ আসিয়াছে, বিচ্ছিন্নতা এবং গভীর বিষাদও ঘটিয়াছে। একাকিত্বের ভিতরে গভীর মর্ম্মবেদনা সহিয়াও তিনি উদ্যমের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া দেশের ভিতরে বিশিষ্ট ও চিহ্নিত হইয়াছিলেন। একটিদিক লক্ষ্য করিয়াছি এই যে, এই অদম্য স্বাধীনতা তাঁকে সংহত ও সংযত করিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রই যেন মাথা উঁচু করিয়া তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। বিচ্ছিন্নতা ও গভীর বিষাদের মূলসূত্র এখানে। দশের সঙ্গে মিলিয়া তিনি বিশেষ কার্য্য করেন নাই। যাহা করিয়াছেন, তাহা অনেকটা নিরপেক্ষ ভাবেই, স্বাধীনতার সঙ্গেই।

সাহিত্য-সেবাতে তাঁহার আদর্শ অতীব পবিত্র এবং উজ্জ্বল ছিল। আজ সাহিত্যের ভিতরে কত লঘুতা ও তরলতার তরঙ্গ আসিয়া যুবক যুবতীদিগকে হাসিকান্নার ভিতরে চিন্তাহীন অসার করিয়া তুলিতেছে। সেইদিনে দেবীবাবুর 'নব্যভারত' আড়ম্বর বিহীন চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী সমানভাবে চিন্তাশীলের চিন্তার অন্ন যোগাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আজ সে স্থান, কে পূর্ণ করিবে? দেবীবাবুর উপন্যাস গ্রন্থগুলির ভিতরে বঙ্গীয় সমাজের অনেক প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি বিষয়ে দেবীপ্রসন্নবাবু যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। লেখা পড়িয়া মনে হইত, সঙ্গোপনে একজন পুরুষ দেশের, সমাজের এবং শিক্ষাক্ষেত্রের কথা সত্য ও নিঃস্বার্থভাবে ভাবিবার জন্য রহিয়াছেন। তাঁহার স্থান সর্ব্বপ্রথম শ্রেণীতে না হইলেও দেশেরও, দশের দৃষ্টি তাঁহার দিকে ছিল।

জীবিতকালে যে সকল ধর্ম্মবন্ধু ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা তিনি করিয়াছেন,—যাহাতে অনেক অনর্থ ঘটিয়াছে,—আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদের দেহাবসানে দেবীবাবু প্রত্যেককেই স্বর্গের দেবতা না করিয়া ছাড়েন নাই। অনেক দিন ধরিয়া এ বিষয়ে ভাবিয়াছি, ইহার হেতু কি? এখন বুঝিতেছি, তিনি স্বাধীনতার সরল পথ

ধরিয়া যখন যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। ইহাতে দায়িত্বপূর্ণ গভীর চিন্তার দিক তেমন না থাকিলেও, অভিসন্ধির অবিশুদ্ধতা ছিল না।

দেবীবাবু সংযমী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দৈহিক কান্তি, মনের উত্তম এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। পরিহাস পটুতা, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও গল্পে তাঁহার বিলক্ষণ যোগ ছিল। একত্রে অনেক স্থানে গিয়া আহারে বিহারে এবং শয়নে এগুলি অনুভব করিয়াছি।

পুরুষকারের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া, দারিদ্র্যকে পদদলিত করিয়া, কালে প্রচুর ধনাগমের পন্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিলাসব্যসনের ত্রিসীমায় তাঁর জীবন ছিল না। নিজহস্তে না করিয়াছেন এমন কোন কর্ম্ম ছিল না। দেবীবাবুর মিতব্যয়িতা সকলের পক্ষে আদর্শ না হইলেও, তাহা বহু অপব্যয়ী পুরুষের পক্ষে এক শিক্ষনীয় বিষয়।

দেশে স্পষ্টবাদী লোকের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। দেবীবাবু স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। উপরে উপরে লোকের কাছে ইহাতে অপ্রিয় হইলেও, স্পষ্টবাদীর সত্যের শক্তি চিরকালই অমোঘ ও মঙ্গলজনক।

মানুষ ধর্ম্মরাজ্যে, সেবাক্ষেত্রে, ধনাগমের সূত্রে, কৃতিত্বের সোপানে বিশিষ্ট হইলেও, বহুদিন গত না হইলে এবং ধর্ম্মসাধন সত্য ও সফল না হওয়া পর্য্যন্ত জীবনের একটা বড় বিষয় ধরা পড়ে না। সে বিষয়টী হইতেছে—আমিত্ব। এই আমিত্বের, অথবা অভিমানের বিষদন্ত ভাঙ্গিতে না পারিলে, এ জগতে শান্তির সম্ভাবনা নাই! বহু ধর্ম্মসাধক, দেশনায়ক, সমাজের পরিচালককে এখানে বিধ্বস্ত হইতে হইয়া থাকে। আজ দেবীবাবু স্বর্গলোকে। এ জগতে থাকিতে, তাঁহাকে ঐ স্বাধীনতার সূত্রে, এই আমিত্বের ভূমিতে, মনে হয় যেন,অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু আবারও বলি, তিনি অভিসন্ধি শূন্য, সরল, সাহসী পুরুষ ছিলেন। আজ তিনি এক মহাসভার মধ্যে সাম্যের ভূমিতে দ্বন্দ্বাতীত রাজ্যে আনন্দ লাভ করিতেছেন। তাঁহার প্রেমপূর্ণ সবল আত্মা আজ আনন্দনীরে স্নাত ও বর্দ্ধিতই হইতেছে, বিশ্বাস করি।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

পুণ্যাত্মার মহাপ্রয়াণ।

কি শুনিলাম? হায় ২৩শে আশ্বিনের 'বঙ্গবাসী' *। এ কি বজ্র হানিলে? 'নব্যভারত' প্রকাশে বিলম্ব হইলে আতঙ্কিত হৃদয়ে পত্র লিখিয়া যাঁহার সংবাদ লইয়াছি, তাঁহার কালব্যাধির কোনও কিছু জানিতে পারিলাম না! অকস্মাৎ দরিদ্রবন্ধু স্বর্গের দেবতা স্বর্গে চলিয়া গেলেন! একে একে সুহৃদগণ প্রস্থান করিয়াছেন। কুস্থানে বাসহেতু নিত্য-ঝটিকা সঙ্কুল এ জীবনের একমাত্র সাহস-ভরসা সান্ত্বনাস্বরূপ চির-প্রসন্ন দেবীপ্রসন্ন আজ নিত্যধামে। আমরা কাহার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিব? মহানগরীর বক্ষঃস্থিত 'আনন্দ-আশ্রম' আজ যেরূপ নিরানন্দ, রবিকর-বিরল বংশ-বন-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র কুটীরখানিও সেই সঙ্গে সেইরূপ শোকমগ্ন!

মহাপুরুষের মহৎ জীবনের আলেখ্য চিত্র অকপট নির্ভীকতাদর্শ পুরুষপুঙ্গবের বিয়োগে এ বঙ্গে কে না ব্যথিত হইবে? তাঁহার চরিত্রের আন্তরিকতা, তাঁহার রচিত সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হইত। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীতে এবং তাঁহার পরিচালিত ও সম্পাদিত "নব্যভারতে" এ কথার সার্থকতা পদে পদে প্রমাণিত। তিনি চরিত্রে যেমন, সাহিত্যেও তেমনই চির নির্ভীক। আটত্রিশ বৎসরকাল তাঁহার পরিচালিত মাসিকপত্র "নব্যভারতে" ইহার প্রমাণ দিয়া আসিতেছে। স্বাস্থ্যোদ্ধার সংকল্পে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি দেওঘরে গিয়াছিলেন; কিন্তু দেওঘরের মৃত্তিকায় বাহাত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। যুগধর্ম্মের হিসাবে বলিতে হয়, তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন; কিন্তু দেশের ও সাহিত্যের দিকে চাহিলে মনে হয়, দেবীপ্রসন্ন! তুমি আরও বাঁচিলে না কেন? এ বঙ্গ সাহিত্যে যে এখনও তোমার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বলিলে কি হয়, নিয়তিরোধ কে করিবে? এখন তাঁহার কৃতীপুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাত কুসুম পিতার গুণানুবর্ত্তী হইয়া পিতৃ-কীর্ত্তি স্মরণীয় করিয়া রাখুন। ইহাই শোকে শান্তি।"

---

* 'বঙ্গবাসী', ২৩শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩২৭ সাল তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশ করেন—

"পরলোকে দেবীপ্রসন্ন।—এ বৎসর বঙ্গের সাহিত্য সত্য সত্যই শোকের সাগর। বিয়োগ বিধুরা বঙ্গ জননী আর একটী কৃতি পুত্র-হারাইলেন। গত সোমবার বেলা দুইটার সময় একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক "নব্যভারত"-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় দেওঘরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; আত্মবিশ্বাসমতে ইনি যেরূপ অকপটচিত্তে আত্মধর্ম্ম পালন করিতেন, এ বঙ্গে আধুনিক ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ বিরল। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত দোষ-নির্দ্দেশে এবং সে দোষপ্রক্ষালনপ্রয়াসে যেরূপ নির্ভীক চিত্তে আলোচনা সমালোচনা করিতেন, সেরূপ ত এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের বহু আত্মম্ভরী ব্রাহ্মের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। তিনি ব্রাহ্ম হইলেও অন্য ধর্ম্মীর যেটা সুসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন, তাহার অনুকরণের প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য নিত্য উদ্যত-লেখনী হইয়া থাকিতেন। এ হেন নিত্য হৃষ্টচিত্ত

করিতে সুযোগ্য শত তুলিকা অগ্রসর। তাহার মধ্যে এ অযোগ্য লেখনীর ব্যর্থ প্রয়াস কি জন্য? চির নিরুদ্ধ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এমন অবসর আর কি মিলিবে? তাই ভক্তবৃন্দের চিত্ত-সরসী-জাত সরস-ভক্তি সরোজচয় যে চরণোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইতেছে, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিও শুষ্কবন-দূর্ব্বাদলে অঞ্জলি পূরিয়া সেই চরণে অর্পণ করিতে উৎসুক হইয়াছে।

যখন আমরা কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী) স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ প্রভৃতির হিন্দুধর্ম্মের বক্তৃতাস্রোতে আকণ্ঠ নিমগ্ন, সেই সময়ে কানাইপুরের কোনও বিজ্ঞব্যক্তির মুখে "নব্যভারত" কাগজের ও সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন বাবুর নাম শুনিতে পাই। আমার বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় রসিকলাল রায় ফরিদপুর জেলা স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া, কলিকাতা রিপণ কলেজে প্রবিষ্ট হইলে, দেবীবাবুর সহিত ক্রমে ক্রমে তাঁহার ঘনিষ্টতা জন্মে। তখন তাঁহার মুখে দেবীবাবুর সুখ্যাতি শুনিতে পাই। পাঠকগণ অবগত আছেন,—উলপুর ফরিদপুর জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম। উলপুরের বসুবংশীয় রায় চৌধুরী মহাশয়েরা জমিদার এবং বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন। শুনিয়াছি, দেবীপ্রসন্ন জাতিচক্রে বিপন্ন হইয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত হন। স্বর্গীয়া কমলকামিনী দেবীর জীবনীতে তাহা বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, ঐ সময়ে দেবীবাবুর কোনও জ্ঞাতি, কার্য্যোপলক্ষে, কয়েকবার আমাদের বাটীতে যাতায়াত করেন। লোকটী শিক্ষিত, কিন্তু ধূর্ত্ত। তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। যখন রসিকলাল দেবীপ্রসন্নের গুণমুগ্ধ ভক্ত, তখন ঐ ভদ্রলোক দেবীবাবুর অজস্র কুৎসাধারা আমাদের কর্ণে বর্ষণ করিতেন। সুতরাং,এ সময়ে আমরা দেবীপ্রসন্ন সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছু স্থির করিতে পারি নাই। তাঁহাকে কখন চক্ষেও দেখি নাই। বিশেষতঃ, আমরা চিরদিন হিন্দু আচারের একান্ত পক্ষপাতী। তখন, ষ্টিমারে কি রেলপথে ভ্রমণ করিতে হইলে, হয়ত দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাস করিতাম। ঐ সময়ে আমরা দেশীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মকে প্রায় এক শ্রেণীস্থ মনে করিতাম। প্রতিবাসী মুসলমানের বিধবা-বিবাহ অকাতরে সমর্থন করিতাম। কিন্তু, হিন্দু বিধবা-বিবাহের নাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতাম। সুতরাং, রসিকলালের কথিত দেবীবাবুর ব্যক্তিগত অশেষ গুণে আমরা তৃপ্ত থাকিলেও, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মোচিত কার্য্যাবলীতে বিদ্বেষ পোষণ করিতাম।

১৩০২ সালের, মাঘ মাসে, আমরা চাকরী অন্বেষণে কলিকাতা যাইয়া ২৯নং হ্যারিসন রোডের মেসে, রসিকবাবুর সহিত একত্র অবস্থান করি। রসিক তখন ফোর্থইয়ার ক্লাসে। আমার কলিকাতা যাওয়ার কয়েকদিন পরেই, দেবীপ্রসন্নের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের শুভ-বিবাহ হয়। ঐ বিবাহে রসিকলালের নিমন্ত্রণ ছিল। শুধু নিমন্ত্রণ কেন? রসিকলালকে শুভকর্ম্ম সম্পাদন—সমিতির একজন দক্ষ সদস্য বলিলেও বলা যায়। রসিক আমাকে বিবাহ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্ম-

বিবাহ কিরূপ প্রণালীতে হয়, তাহা দেখিবার জন্ম আমরাও কৌতুহলী ছিলাম। সুতরাং, দ্বিরুক্তি না করিয়া, রসিক রায়ের 'সবান্ধবে'র পর্য্যায়ভুক্ত হইলাম। বিবাহ দিবস অপরাহ্নে রসিকবাবুর সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম মন্দিরের পার্শ্বস্থ গলির মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—গৌরবর্ণ, শ্মশ্রুলকান্ত-কান্তি একটী ভদ্রলোক আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। আমি রসিকলালের পশ্চাতে। আমাকে দর্শনমাত্র ভদ্রলোকটী গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। আমি ত অবাক। জানিতে বাকী রহিল না যে তিনিই সদানন্দ মহাপুরুষ, দেবীপ্রসন্ন!

ব্রাহ্মমতে বিবাহ পদ্ধতি যাহা দেখিলাম, তাহা হিন্দু প্রথার রূপান্তর মাত্র। বরযাত্রাকালে বক্তৃতার মুখে আশীর্ব্বচন। গোত্র-প্রবর উল্লেখে হিন্দুর মতই কন্যা সম্প্রদান। আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পৌরহিত্য করিলেন। কুশণ্ডিকার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র কয়েকটি বিবাহ সময়ে পঠিত হইল। তবে মন্ত্রগুলি সংস্কৃতে না হইয়া, বাঙ্গলায় উচ্চারিত হইল। হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল কি না, স্মরণ হয় না। গড়ের এক সাহেব সম্প্রদায় ইংলিশ ব্যাণ্ড বাজাইয়াছিল।

ঐ দিবস হইতে আমরা দেবীবাবুর বন্ধুমধ্যে গণ্য হইলাম। কিছু পরে 'নব্যভারতের' গ্রাহক ও 'সুহৃদ্ সভার' সভ্য হইলাম। দেবীপ্রসন্ন ব্রহ্ম মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক হইয়াও কস্মিনকালে আমাদিগকে হিন্দু-সমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম হইতে উপদেশ প্রদান করেন নাই। ১৩০৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'নব্যভারতে "৺মদনমোহন" নামে আমার একটি বৃহৎ কবিতার স্থান দিয়া উৎসাহিত করেন। তাহাতে মনে হয়, তিনি স্বয়ং নিরাকারবাদী হইয়াও, সাকারসাধনতত্ত্বে অশ্রদ্ধা পোষণ করেন নাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, ভক্তিরসে তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুপ্লুত হইয়া আসিত।

১৩০৪ সালের আষাঢ় মাসের শেষভাগে দারুণ দুর্ভিক্ষে ফরিদপুরবাসী ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। কচু, ঘেচু, পাটপাতা, ইত্যাদি দ্বারা জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছিল। অর্দ্ধাহারে,অনাহারে থাকিয়া থাকিয়া প্রতিনিয়ত মরণ-মুখে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে দেবীপ্রসন্ন 'সুহৃদ্ সভার' পক্ষ হইতে আমাদের অঞ্চলে ধান চাউল বিতরণ করিতে আসিয়াছিলেন। ফরিদপুরের স্কুল সাব-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় সঙ্গে ছিলেন। আমরা তখন রাজসাহী জেলায় চাকরী করি। দেবীবাবুর আগমন সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগদান করিলাম। গ্রামবাসী বহু ভদ্রলোক তাঁহার মহৎ কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। উক্ত সনের 'সুহৃদ্-সভা'র কার্য্য বিবরণীতে তাহা বিবৃত রহিয়াছে। কত বুভুক্ষিত নরনারী এই অন্নদানের ফলে জীবনরক্ষা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। এই উপলক্ষে দেবীবাবু দিবসত্রয় আমাদের ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে ধন্য করেন।

উক্ত বৎসরের শেষভাগে পালং কোটালীপাড়া প্রভৃতি স্থানে বিসূচিকা-রোগে মহামারী উপস্থিত করে। তখন আবার দেবীপ্রসন্ন বাবু ঔষধপূর্ণ বাক্স ও মাণিকদহের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় বিপিনবিহারী রায়ের গৃহ-চিকিৎসক মহা-

শয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে ধাবমান হন। ফরিদপুর আসিয়া আমার অরের সংবাদ শুনিয়া,চৈত্রের খররৌদ্র শিরে ধরিয়া, সুদীর্ঘ নয় মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া আমাকে দেখিয়া যান। আমার জ্বর অতি সামান্য। দরিদ্র বন্ধু আমাদের গৃহে নারিকেল মুড়ি ও শর্করা মাত্র জলযোগ করিয়া, তখনই আবার ঐ পথ ভাঙ্গিয়া প্রস্থান করেন। বলিয়া যান, জ্বর গুরুতর বুঝিলে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া মাত্র ডাক্তার সহ উপস্থিত হইবেন।

ঐদিন হইতে বুঝিলাম, সংসারে আমরা নির্বান্ধব নহি। বন্ধুহীনের বন্ধু, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতা, পিতহীনের পিতা, দরিদ্রবৎসল দেবী প্রসন্ন অভয়-হস্ত প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। সেইদিন হইতে সারাজীবন যখন যে বিপদে পড়িয়াছি, তাঁহার উপদেশে পরিচালিত হইয়া উদ্ধার পাইয়াছি। সারাজীবন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিয়াছি।

মহাত্মা আত্ম-জীবনের মমতা না করিয়া মরণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দক্ষিণ ফরিদপুর শ্মশানে পরিণত! তেমন নিদারুণ উলাউঠা বুঝি বা পৃথিবীর কুত্রাপি কখন উপস্থিত হয় নাই। গৃহে গৃহে মুমূর্ষু রোগীর আর্ত্তনাদ! জলটুকু দিবার লোক নাই। বাড়ী বাড়ী শব। সৎকার করিবার কেহ নাই। কতলোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কতজন পথে ঘাটে মাঠে পড়িয়া মরিয়া আছে। এইক্ষেত্রে, দেবীপ্রসন্ন নির্ভীক বীরের মত, কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকবার তিনি এই নিদারুণ ব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দুইবার রসিকলাল সঙ্গে ছিলেন।

আমরা যতবার কলিকাতায় গিয়াছি, সর্ব্বপ্রথম "আনন্দ আশ্রমে" উপস্থিত হইয়া দেবীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি বহুদিনের সঞ্চিত জ্বালা তাপ তাঁহার সকাশে ঢালিয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সুস্নিগ্ধ সান্ত্বনা পীযুষে পরিষিক্ত হইয়া ফিরিয়াছি। এইরূপ কতবার হইয়াছে। একবার কুমুদবাবুর সহিত কলিকাতা গিয়াছিলাম। কুমুদ বড় লোকের ছেলে; বড়ই শান্তশিষ্ট। দেবীবাবু তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। প্রথম সাক্ষাৎ দিনে-তিনি বলিয়া দিলেন, বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে আর একবার যেন অবশ্য দেখা হয়। বাড়ী ফিরিবার দিন, অপরাহ্নে দেখা করিতে গিয়া শুনিলাম, তিনি শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া উপরের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন। আমরা সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, পিতৃবৎসল শ্রীমান্ প্রভাত-কুসুম বিনয়সহকারে তাঁহার অসুখের কথা জানাইয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিতেছিলেন, আমরাও ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিয়াছিলাম; এমন সময়,সিঁড়িতে জুতার-শব্দ শুনিলাম। সুহৃদ্-প্রেমিক মহাত্মা, দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া, আমাদিগকে দর্শন দিলেন। তাঁহার অসুস্থতার জন্য সত্বর বিদায় লইতে আমরা ব্যস্ত হইলেও, তিনি ধীর ও স্থিরভাবে বহুক্ষণ বসিয়া কত আলাপ করিলেন। দরিদ্র সংসারের খুঁটি-নাটি তিনি যেমন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এমন আর দ্বিতীয় দেখি নাই। অনেক সময়ে নিজ জীবনের কাহিনী অকপট-চিত্তে আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট যতটুকু সময় অবস্থান করিতে পারিয়াছি, সেই সময়টুকুই বেশী মূল্যবান্ মনে করিয়াছি।

দেবীবাবুর ঈশ্বরে অটল নির্ভর ছিল। একদিন আমার বালক ভৃত্যটীর আসিবার বিলম্ব দেখিয়া আমি বড়ই বিচলিত হইয়া উঠি। তিনি আমার ভাবগতিক দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে রাখিলে এইরূপেই উদ্বেগ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ভগবানে নির্ভর করুন, কোনও চিন্তা নাই।" তাঁহার এই বাক্যের অর্দ্ধঘণ্টা পরেই, ভৃত্যটী আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাঁহার বিশ্বাস দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম।

দেবীবাবু স্নেহ করুণায় রমণীর ন্যায় কোমল-স্বভাব হইলেও,কর্ত্তব্য-পালনে বজ্রাদপি

কঠিন হৃদয় ছিলেন। তাঁহার কার্য্য নির্ভুল! সেইজন্য প্রতিবাদ সহিতে পারিতেন না। একদা আমি ও রসিক 'নব্যভারত' কার্য্যালয়ে দেবীবাবুর পার্শ্বে বসিয়া আছি। শ্রীমতী সান্ত্বনা তখন ৯।১০বৎসরের বালিকা। জানিনা কি অপরাধে, দেবীবাবু সহসা উঠিয়া গিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন, এবং কার্য্যালয়ের একপার্শ্বে দাঁড় করিয়া রাখিলেন। রসিক,ভাব বুঝিয়া, গম্ভীর হইয়া বসিলেন। আমি সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলাম। দেবীবাবু স্থিরভাবে'নব্যভারতের' প্রুফ দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আমাদের অপরিচিত, দেবীবাবুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক, একটী ভদ্রলোক কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। এবং দুই একবার 'আহা', 'উহু' করিয়া সান্ত্বনাকে সাপটিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিলেন। বুদ্ধিমতী মেয়ে পিতার প্রকৃতি সেই বয়সেই জ্ঞাত ছিলেন। কাজেই যাইতে আপত্তি করিলেন। ভদ্রলোক শুনিলেন না। ভদ্রলোকটী দেবীবাবুর জ্ঞাতি কি কুটুম্ব, আগন্তুক কি প্রতিবেশী, তাহা জানিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই। দেবীবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে। মূর্ত্তি, স্থির—ভীষণ! হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন এবং পুনর্ব্বার সান্ত্বনাকে ধরিয়া আনিয়া পূর্ব্ববৎ দাঁড় করাইলেন। এবার কিঞ্চিৎ প্রহার প্রয়োগও হইল। দেবীপ্রসন্ন আবার নিজাসনে বসিয়া কার্য্যে মনোযোগী হইলেন। কিন্তু, কাজ আর চলে না। অন্তরে প্রলয় ঝটিকা! আমরা স্থির নির্ব্বাক্! দেবীবাবু আমাদিগের দিকে চাহিয়া ভদ্রলোকের ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! আমাপেক্ষা স্নেহ বেশী তাঁর?" রসিক মৃদু সায় দিলেন। আমি বলিলাম—"ভদ্রলোকের মুরব্বিয়ানার ফলে নিরপরাধা বালিকার দ্বিগুণ দণ্ডভোগ।" দেবীবাবু তখন বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকাইলেন। আমি প্রমাদ গণিলাম। ভাবিলাম—"এই বার বুঝি, আমার পালা।" কিন্তু আমার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। হঠাৎ আগ্নেয়গিরি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দেখিলাম, নেত্রকোণে করুণাশ্রু দেখা দিয়াছে। এই শুভ অবসরে, সান্ত্বনাকে ক্ষমা চাহিতে ইঙ্গিত করিলাম। সান্ত্বনা সভয়ে নিকটস্থ হইলে, কন্যাবৎসল পিতা একেবারে তাহাকে কোলে তুলিয়া বলিলেন—"আর এরূপ করিস না, মা!" সান্ত্বনা কাঁদিয়া বলিলেন—"আজ আমাকে ক্ষমা করুন্। আমি আর অন্যায় কিছু করিয়া আপনাকে কষ্ট দেব না বাবা!" সান্ত্বনা আর বালিকা স্বভাব-সুলভ অপরাধ করিয়াছিলেন কি না,জানি না। কিন্তু দেবীপ্রসন্নের সুবৃহৎ জীবননাট্যের এই ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্কের অভিনয় টুকু কল্য-দৃষ্ট চিত্রবৎ মনে জাগিয়া রহিয়াছে।

দেবীবাবুর পরিবারিক বিধিব্যবস্থা আদর্শ ছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী হইলেও স্ত্রী স্বাধীনতার ততদুর পক্ষপাতী ছিলেন না। আনন্দ-আশ্রমের কোনও পুরমহিলার পিতা স্বামী বা সহোদর ভ্রাতা ভিন্ন অন্য কাহাকে কোনও পত্রাদি লিখিতে হইলে তাঁহাকে জানাইয়া লিখিতে হইত। বাহিরের পত্র সকল তাঁহার হাতে আগে আসিত। তিনি দেখিয়া ভিতরে পাঠাইতেন। বাহিরের কোনও ব্যক্তি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোনও পুরনারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। সাধের আনন্দ আশ্রমের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। কিন্তু তথাপি দুই একবার উহা আবিলতায় পূর্ণ হইয়াছে। এক সময়ে 'ফরিদপুরের' কোনও বিখ্যাত পরিবারের এক ব্যক্তি, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে সঙ্গে লইয়া আনন্দ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং ভ্রাতৃবধূকে পত্নী পরিচয় দিয়া দ্বিতল গৃহে সুখে বাস করিতে থাকেন। দৈবক্রমে ফরিদপুরের একজন স্কুল সাব্ইন্স্পেক্টর আনন্দ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এই ব্যাপার জানিতে পারেন। তিনি ফরিদপুর হইতে জানিয়া যান যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অঘটন ঘটাইয়া পলাতক হইয়াছেন। বস্তুত কথায়, দেবীবাবু, নরপ্রেতকে গৃহমুক্ত করিলেন।

দেবী প্রসন্ন পবিত্র পুরুষ ছিলেন। আর তাঁহার সহধর্ম্মিনী সাধ্বী কমল কামিনী আদর্শ হিন্দু মহিলা ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্ম সমান আদরে তাঁহাদের গৃহে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। হিন্দুদের অসহনীয় কুল-গর্ব্বে যেমন তাঁহার বিরাগ ছিল, ব্রাহ্ম সমাজের অনেক বাড়াবাড়িতে তেমনই তিনি ঘৃণা পোষণ করিতেন।

আমার বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় রসিকলাল রায়কে তিনি সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রসিকও সারাজীবন তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে দুই একবার সামান্য মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। শেষবার এই মনোমালিন্যের অবস্থায় রসিকলাল জ্যৈষ্ঠের বন্ধে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়া কঠিন জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া আসেন। তখন তিনি অখিল মিস্ত্রীর লেনে একমাত্র পুত্র-সহ বাস করিতেন, ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে মাষ্টারী করিতেন। রসিকের জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে দন্তমূল হইতে প্রভূত শোণিত নির্গত হইতে থাকে। দেবীপ্রসন্ন জানিবামাত্র তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া 'আনন্দ আশ্রমে' লইয়া আসেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারী ও কবিরাজীর চরম চিকিৎসা করান। বিপদ কখন একাকী আইসে না। এই সময়ে দেবীবাবুর সহোদরা ভগ্নী, যিনি সম্পদে বিপদে সম-সুখ-দুঃখ ভাগিনী ছিলেন, স্থানান্তরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র দারুণ টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পিতা মাতার ও পিতামহের মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। ভগবানের অশেষ কৃপায়, বহু চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পর প্রসূন রক্ষা পাইল। রসিকের জন্য দেবীবাবুর যত্ন শুশ্রূষা, চিকিৎসা সকলই ব্যর্থ হইল। রসিক 'আনন্দ-আশ্রমে' দেহ রক্ষা করিলেন। দেবীবাবু রসিকের জন্যই সমধিক মনোযোগী ছিলেন, বলিয়াছিলেন—"প্রসূনকে দেখিবার জন্য তাহার পিতা মাতা আছে, রসিকবাবুকে আমি না দেখিলে, দেখিবে কে?"

দেবীবাবুর কার্য্যালয়ে স্বর্গীয় দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসু অক্ষয় কুমার, কালীপ্রসন্ন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জগদীশ গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের এবং জাতীয় মহাসমিতির সারথি বর্গের প্রতিমূর্ত্তিতে পরিশোভিত দেখিতাম। আর দেখিতাম, নানাস্থানের স্বভাব জাত লতা পুষ্প ও সুন্দর সুন্দর শ্বেত কৃষ্ণ উপল খণ্ড। কার্য্যালয়টি ক্ষুদ্র হইলেও, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাঁহার জীবনে কোনও আড়ম্বর ছিল না; অথচ তিনি যাহা করিতেন, তাহাই সুন্দর—তাহাই অনুকরণ যোগ্য।

দেবী প্রসন্নের প্রতিভা অসাধারণ ছিল। ভাষাসম্বন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই সমধিক প্রশংসা করিতেন। তিনি ইংরেজী কি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন না সত্য, কিন্তু কত এম, এ, পাস বাবু ও মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কত খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও যশোমণ্ডিত কবি সর্ব্বদা তাঁহার 'আনন্দ আশ্রমে' যাতায়াত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। আবার, বিষয়-বুদ্ধিও তাঁহার অনন্য-সাধারণ ছিল। কত বড় বড় ষ্টেটের ম্যানেজারেরা তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। কত মোকদ্দমার পক্ষগণ তাঁহার যুক্তিমত কাজ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। স্বয়ং স্বেচ্ছায় মধ্যস্থ হইয়া কত জটিল মোকদ্দমা মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষকে ধন-দণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত সমস্ত উপন্যাস পাঠ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। "পুণ্য-প্রভা" মুদ্রিত হইলে একখণ্ড আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার "মুরলা" পাঠ করিয়া আমাদের অভিমত লিখিয়া জানাই। বুঝিতে পারিয়াছিলাম—মুরলার "অরবিন্দ" ও পুণ্যপ্রভার "প্রেমাঙ্কুর" তাঁহারই জীবনের ছায়া। আমরা তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম—'অরবিন্দ' খাঁটী সোণা! বহু মণি-মুক্তা-সংযোগে 'প্রেমাঙ্কুর'-চরিত্র রচিত বটে, কিন্তু তাহার মূল্য নির্ণয় করা ও তাহার দীপ্তি সহ্য করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। 'অরবিন্দ' যেন স্বভাবজাত সুমিষ্ট অমৃত ফল। আর 'প্রেমাঙ্কুর' নানা মসলা ও তৈল-ঘৃত সংযোগে প্রস্তুত গুরুপাক পলান্ন!" এই কয়েকটী কথা পড়িয়া তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

দেবীপ্রসন্ন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যাহা, শেষ হইল। আমরা তাঁহার জীবনের কতটুকু কিইবা জানি, বলিবই বা কি? তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তাঁহার ন্যায় কোমলে কঠোরে গঠিত বীরাত্মার সহিত এ সংসারে আর পরিচয় হয় নাই। পরকে দৃষ্টিমাত্র হৃদয় মন ঢালিয়া তিনি যেমন ভালবাসিতে পারিতেন, এমন আর দেখি নাই। তাঁহার নিকট ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সুন্দর, কুৎসিত, বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলের সমান আদর! সকলেই তাঁহাকে আপন হৃদয়ের অভিন্ন অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া মনে করিত। এই গুণেই তিনি জগৎ মাতাইয়া ছিলেন। যদিও শেষ বয়সে রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য বশতঃ সর্ব্বকার্য্যেই অশক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, তথাপি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্লান্ত মনে "নব্যভারত" ও "সুহৃদ্ সভা"র সেবা করিয়াছেন। কর্ম্মী-পুরুষ কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলেন, কর্ম্ম সমাধা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীর দুঃখ দারিদ্র্য দেখিয়া যত কাঁদিয়াছেন, দুর্নীতি দেখিয়া ততোধিক কাঁদিয়াছেন। বলিতেন, "যতদিন ভারত-বাসীর পঙ্কিল চরিত্র সংশোধিত না হয়, ততদিন শত চেষ্টা করিলেও এ দেশ জাগিবে না।"

তবে যাও মহাপুরুষ! এ ধরার কলুষ-প্রবাহ এড়াইয়া যাও সেইস্থানে, যেখানে মহৎ চরিত্রের নিত্য পূজা হয়, যেখানে পরের দুঃখ পরে বুঝে, পরের অশ্রুজল সযত্নে পরে মুছাইয়া দেয়! যাও দেব, সেইস্থানে, যেখানে সাধ্বী কমল কামিনীদেবী পারিজাত মাল্য হস্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছেন, যেখানে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ তোমার আলিঙ্গন-আশায় লোলুপ-দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান। যাও মঙ্গল-নিকেতনে! কিসের "আনন্দ আশ্রম?" কিসের পুরীর বা বৈদ্যনাথের নশ্বর কুটীর-নিচয়? যে আনন্দ মন্দিরে সারা বিশ্বের পবিত্র সত্ত্বা সমূহ একত্র মিলিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের জয় গাহিতে গাহিতে বিশ্বেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, তুমিও সেই মন্দিরে সেই মহানে মিলিয়া যাও। বিশ্বের দুঃখে কত জ্বলিয়াছ, এখন অনন্ত শান্তি-ধামে শান্তি সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হও।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র বসু।

কর্ম্মবীর দেবীপ্রসন্ন।

পুণ্যচরিত্র, মাতৃভূমি মাতৃভাষা এবং মাতৃজাতির অকৃত্রিম সেবক,অতিথিবৎসল, বিশ্বাসী, জিতেন্দ্রিয়, কর্ম্মবীর, নীরবসাধক, স্বনামধন্য পুরুষসিংহ, 'নব্যভারতে'র সুবিখ্যাত সম্পাদক, পিতৃস্থানীয় আমার মাতুল দেবীপ্রসন্নের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই নিদারুণ সংবাদ সহরে বাহিরে প্রচারিত হইয়াছে, এবং যোগ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার জীবনের কথা লিখিয়াছেন এবং লিখিতেছেন। আজ সেই নিদারুণ সংবাদ ঘোষণা বা সেই কর্ম্মময় ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী জনসমাজে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করি নাই। তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবনের দুই একটী অতি সাধারণ কথা বিবৃত করিতেছি মাত্র।

১২৬০ সনের ২৩শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমার দিন, বরিশালের অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে উলপুরের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার বসুবংশে তাঁহার জন্ম হয়। পিতৃদেব ৺রামচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী ও মাতৃদেবী ৺চন্দ্রকলা। যৌবনে তিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নূতন ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারস্থ সকলে বিমুখ হয়েন। তাঁহার মতি ফিরাইবার জন্য কতরূপ নির্য্যাতন করা হইয়াছে, কতদিন অনশন বা অর্দ্ধাশনে যাপন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মবিশ্বাসীর প্রবল ধর্ম্মানুরাগ অটল রহিয়াছে; যে কোন কাজ তিনি ভাল বলিয়া বুঝিতেন জীবন পণ করিয়া তাহার উদ্‌যাপন এবং সম্পাদন করিতেন; শত বাধা বিঘ্ন বা প্রিয় পরিজনের চোখের জল তাঁহাকে তাঁহার অটল সংকল্প হইতে কখনই বিচ্যুত করিতে পারে নাই। 'প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর, এই ভাবে দিন কাটুক তোমার'—ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। জীবনে ইহা পালন করিতে অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন। চারণের মুখে মুখে অতীত যুদ্ধ গৌরব কাহিনী গীত হইত বলিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী যতবার শুনিয়াছি, ততবারই ভাবিয়াছি, ইহাও কিছু সামান্য নহে, ভাবিয়াছি, সাধারণ হইতে তাঁহার হৃদয়বল কত পরিমাণে অধিক ছিল। হিন্দুসমাজ এবং আত্মীয়ের বক্ষ হইতে প্রথমে তাঁহার অনুজাকে (আমার পরলোকগতা মাতৃদেবী) এবং পরে তাঁহার পরলোকগতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ও এক বৎসরের শিশু পুত্রকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করিতে অনেক নির্য্যাতন সহ্য ও বহু বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। একদিন নহে, দুদিন নহে, কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত ধন-জন-বিহীন অবস্থায় জীবন সংগ্রামে যে বিশ্বাস ও হৃদয়বলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উল্লেখযোগ্য। রিক্ত হস্তে তিনি জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু অতুল বিভবের অধিপতি হইয়া দশজনের একজন হইয়াছিলেন, ইহা ক্রম সাধনার ফল নহে। মায়ের প্রসাদে তাঁহার হাতের ধুলামুষ্টি যেন সোণায় পরিণত হইয়াছে। গৃহহীন অবস্থায় একাকী গৃহের বাহিরে,—শুধু গৃহের বাহিরে নহে—পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে আসিয়া তিনি যে প্রেমপরিবার গঠন করেন, তাহাতে অতিথি অভ্যাগত, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, অনাথ অনাথা এপর্য্যন্ত সমানভাবে গৃহ এবং আশ্রয় পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, রামমোহন, মহর্ষি,

শাস্ত্রী এবং অন্যান্য প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের জন্মস্থান বলিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছিল; কিন্তু জন্মভূমিকে একদিনও তিনি বিস্মৃত হয়েননাই। ফরিদপুরের উন্নতি সাধন তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। দুর্ভিক্ষের সময়ে দুভিক্ষ-পীড়িতের সেবায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন; নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারের জন্য 'ফরিদপুর সুহৃদ সভা'র সংগঠন করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে বরাবর কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন; নিজ গ্রামে তাঁহার জনকের নামে 'রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ বহু সদনুষ্ঠান করিয়া এ যাবৎকাল মাতৃভূমি, মাতৃ-ভাষা এবং মাতৃজাতির সেবা করিয়া আসিয়া-ছেন। হিন্দু সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজ, যে সমা-জেই হউক, তাঁহার সহিত যাহার পরিচয় হই-য়াছে, তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন এবং সুমিষ্ট আলাপে সকলেরই মন বিমুগ্ধ হইয়াছে।

পরিচ্ছন্ন-প্রিয়তা তাঁহার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য সংগুণ। গৃহে, প্রাঙ্গনে যে কোন আবর্জ্জনা দেখিতেন, নিজহস্তে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করিতেন। সেলাই, মিস্ত্রীর কাজ, রোগীর সেবা, গৃহপালিত পশুর তত্ত্বাবধান তিনি না করিতেন এমন কাজই খুঁজিয়া পাই না। তাঁহার বেশভূষা, চালচলন অতি সামান্য লোকের মতই ছিল। জীবনে চিরকাল সক-লের সেবাই করিয়া আসিয়াছেন, কখনও কাহারো সেবাগ্রহণ করিতে চাহেন নাই; মৃত্যুতেও নহে। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা; কিন্তু, অনেককেই তিনি পুত্রকন্যা নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন। তাঁহার অকস্মাৎ তিরোধানে কত জন চোখের জলে ভাসি-তেছেন, তাঁহার অভাবে কত গৃহে হাহাকার উঠিয়াছে। যিনি কর্ম্ম এবং চরিত্রের আদর্শে সকলের হৃদয়ে সমানভাবে বিরাজমান, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তাঁহার বিয়োগে আমাদের শোক করিবার কারণ যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার পুণ্যস্মৃতিতে গৌরবের কারণ ততোধিক বিদ্যমান রহিয়াছে; এখন ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

পদব্রজে আমার বাড়ীতে আসিয়া, তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, আমার কন্যারা তাঁহার সেবা করিতে গেলে নিবারণ করিয়া বলি-তেন—'এখন দরকার নাই, মৃত্যুকালে আমার মুখে জল দিও'। ইদানীং কত-বার ঐ একই কথা বলিয়াছেন। সে আদেশ পালন করিবার অবসর না দিয়া, অতুল ধন-জন-পতি, দেওঘরে প্রভাত-কুটীরের একটী কক্ষে, যখন শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পুত্র, কন্যা, বধূ, পৌত্র দূরে থাক্, একজন আত্মীয়ও কাছে ছিল না যে সেই অন্তিমসময়ে মুখে জল দেয়। রোগাক্রমণের এক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হইয়া গেল; তবু সেটুকু সময়ও, তাহার মাথায় বরফ দূরে থাক্, বাতাস ও জল দিবার জন্য কোন আত্মীয় কাছে ছিল না। 'জন্মিলে মরিতে হবে'—সকলেই জানে, কিন্তু যত বৃদ্ধ বয়সেই হউক, পিতামাতা বা যে কোন প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটিলে, শোকাবেগে প্রাণ অধীর হয়ে পড়ে। তারপর যখন ভাবি তিনি আত্মীয়-শূন্য অবস্থায়, কিরূপে দেহত্যাগ করিয়াছেন—নাজানি কত যন্ত্রণাই ভোগ করিয়াছেন, সেবা করার জন্য মালী ভিন্ন দ্বিতীয় লোক ছিল না, তখন চোখের জল সংবরণ করিতে পারি না। বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায়, অকস্মাৎ, একেবারে শেষ খবর লইয়া কলিকাতা এবং গিরিডিতে যখন তারের বার্ত্তা পৌছিল, তাঁহার চির 'সুহৃদ

ভগ্নীপতি রোগজরাজীর্ণ দেহ লইয়া ভগ্নপ্রাণে পাগলের মত বৈদ্যনাথে গিয়াছিলেন ; কিন্তু, হায়, তখন সকলই শেষ হইয়াছে! তাঁহার অতি সাধের বৌমা এবং স্নেহের 'সান্ত্বনা' মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাঁহার অন্তিম সংকার করাইবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাঁহার পুত্রসম স্নেহের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর সংবাদ পাইয়াই অস্থির প্রাণে দেওঘরে ছুটিলেন ; গিয়া দেখেন, চিতায় প্রায় সব শেষ হইয়াছে। একমাত্র পুত্র সুদূর বোম্বাইয়ে; তিনি আমাদেরই মত হতভাগা ; শেষ দেখাও দেখিতে পাইলেন না। না জানি কোন অভিমানে আমাদের সকলকে এবং এত যে সাধের 'আনন্দ-আশ্রম' তাহাও পরিত্যাগ করিয়া সেই অক্লান্ত-কর্ম্মী নির্জ্জনে দেওঘরে চির-সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শিখিলাম,—ভাল করিয়াই শিখিলাম—যে সংসার অসার ; আর, শির পাতিয়া গ্রহণ করিলাম—তাঁহার মঙ্গলবিধান। সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে, বিরহে মিলনে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। আজ সেই বিদেহী আত্মার জন্য কি আর প্রার্থনা করিব? তাঁহার চির-ঈপ্সিত শান্তিময়ী মায়ের চরণে তিনি ত স্থানলাভ করিয়াছেন ; তাঁহার প্রিয়জনের সহিত মিলিয়াছেন। তবু বলি, তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক। মঙ্গলময় আজ সেই মুক্ত আত্মার কল্যাণ করুন্ এবং আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই প্রার্থনা।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

পবিত্রতা-সাধক দেবীপ্রসন্ন।

মানুষ আমরা, "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। যদি তাই হয়, তাহা হইলে সকলের আদি এই অমৃতের সন্ধান পাওয়া দরকার। সাধারণতঃ সকলে সে চেষ্টা করে না, এবং সেই চেষ্টা না করার কারণ দেখাইতে গিয়া, আমরা বলি "মায়া।" কিন্তু মাঝে মাঝে এক এক জন ব্যক্তি এই সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ফেরে। কেহ বনে যাইয়া বনস্পতির পত্রশিহরণের মধ্যে সেই সাড়া পায়, কেহ বা জনকোলাহল মুখরিত সমাজের পূর্ণপথে, দুঃখ ব্যথার আর্ত্তনাদের মধ্যে, সেই বজ্রধ্বনি বুকে বুকে অনুভব করে ও করায়। সেই জন্যই বলা যায় যে খ্রীষ্ট ও কনষ্ট্যান্টাইন, প্লেটো ও পেরিক্লিস, চৈতন্য ও শিবজী, প্রতাপ ও নানক, উইলবারফোর্স ও আব্রাহাম লিঙ্কন, রামমোহন ও রামকৃষ্ণ সকলেরই গতি ও লক্ষ্য ছিল একই সেই ধারা-বিগলিত প্রস্রবনে অবগাহন করা, যদিও প্রত্যেকে ছিলেন ভিন্নপথযাত্রী। দেখা গিয়াছে, ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ব্রতকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া, নিজ নিজ জীবনে সেই ব্রতের মন্ত্র প্রাণপণে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দেবীপ্রসন্ন যে এইরূপ শ্রেণীরই একজন ব্যক্তি ছিলেন, একথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জীবনে বিশেষ ব্রত ছিল—পবিত্রতা ও সেবা। একবার এই ব্রত গ্রহণ করিয়া, তাহার উদ্‌যাপনে জীবনে কখনও কাতর বা পরাঙ্মুখ তিনি হন নাই। এই বিরাট আদর্শ সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বলিষ্ঠ কার্য্যতৎপরতার দ্বারা জীবনে আশ্চর্য্য সফলতা প্রাপ্ত হইয়া

ছিলেন। তাই তাঁহার 'সুহৃদসভা'র দীক্ষামন্ত্র ছিল—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কঠোর ভাবে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কিঞ্চিন্যূন চারি বৎসর পূর্ব্বে একবার তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময় একদিন আমাদের উপস্থিতিকালে তাঁর স্নেহময়ী পুত্রবধূকে বলিয়াছিলেন—"বৌমা, আমি মরে গেলে আমায় চিতায় স্থাপন করবার আগে চন্দন দিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গে লিখে দিও—পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা।" কঙ্কালকঠোর রূঢ় মূর্ত্তিতে মৃত্যুর দূত যখন মরণের সিংহদ্বারের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া মানুষকে পথ দেখাইতে থাকে তখন, যে দেশে গেলে অনন্তকালের অনুবীক্ষণে জীবনের সকল সত্যমিথ্যা ধরা পড়িয়া যাইবে, সেই দেশের দ্বারপথে দাঁড়াইয়া মিথ্যা দাম্ভিকতার বাক্‌চাতুর্য্য বিস্তার করিতে পারে, এমন লোক জগতে কেহই নাই। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্ভীকচিত্তে জোর করিয়া উপরিউক্ত কথাগুলি বলায়—দেবীপ্রসন্নের চরিত্রে যে কতখানি নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না; ইহা দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহার মনের জোর শরীরের উপর কতখানি ছিল। ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য লাঞ্ছিত, গৃহবিতাড়িত ও কপর্দ্দকহীন হইয়া যখন তিনি কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার (তাঁহারই কথায় বলি) "দুই পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কেটে গিয়েছে।" সেই সময় আবার পিত্রালয়ের বাধা, অনুযোগ ও ভীতি-প্রদর্শন তুচ্ছ করিয়া দেবীপ্রসন্নের সহধর্ম্মিনী প্রাতঃস্মরণীয়া সাধ্বী কমলকামিনী কিরূপে স্বামীর সহিত সম্মিলিত হন, সে এক অদ্ভুত উপন্যাস! প্রাগোক্ত, পীড়ার সময় আর এক দিন উক্ত সময়কার ঘটনা বিবৃত করিতে করিতে বলেন—"আমার প্রথম সন্তান প্রভাতের জন্ম হলে তার মাকে আমি বলি—'দেখ, আমাদের এই দারিদ্র্যের মধ্যে ছেলে-পিলে বেশী হলে দুই দিক দিয়েই বড় কষ্টকর হবে। এখন থেকে আমাদের সংযমী হ'তে হবে।' তাই আমার প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানের জন্মকাল মধ্যে ১২ বৎসরের ব্যবধান।" যাঁর এইরূপ ভীষণ আত্মসংযম, সংসারে থাকিয়াও প্রবৃত্তিকে যে এইরূপভাবে কঠোর তাড়না করিতে পারে, সে কি মহাযোগী নয়? পাশ্চাত্য দেশে যখন দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের মধ্যে অনিয়মিত পরিবার বৃদ্ধির সমস্যা উৎকট হইয়া উঠে, সেই সময়, নীতি-বিশারদ ম্যালথস্ ব্যবস্থা দেন যে প্রত্যেক দম্পতির সংযমী হইয়া সন্তান সংখ্যা নিয়মিত করা উচিত। নৈতিক চারিত্র্যের উপরই তিনি এই নীতি প্রতিষ্ঠা করিতে চান। কিন্তু ভোগ-লোলুপ, লালসা-পরায়ণ কূটবুদ্ধি ইউরোপ, শারীরিক ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিয়া কৃতকর্ম্মের কঠিন দায়িত্বের হাত এড়াইবার জন্য, বৈজ্ঞানিক রীতির উদ্ভাবন করিল। অন্ন ও দারিদ্র্য সমস্যার জটীলতার সঙ্গে সঙ্গে, এই ভীষ্মবীরের দেশেও, ঐ সব অমানুষিক জঘন্য প্রণালীর প্রচলন দেখা দিয়াছে। ভীষ্মের মতই আত্মজয়ী দেবীপ্রসন্নের চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদের কিছু লাভ হইবে কিনা, কে জানে!

"সেবাধর্ম্ম" হিন্দুর ধর্ম্মনীতির এক বিরাট অঙ্গ। সেবার মধ্যে দেবীপ্রসন্নের জীবন

বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। অনাহারখিন্ন, রোগক্লিষ্ট দেশবাসীর ব্যাকুল আর্ত্তনাদ যে কি বেদনার করুণ কম্পন তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রে শিহরণ তুলিয়া দিত, আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দেশবাসীর বেদনা দূর করিবার জন্য অক্লান্তকর্ম্মীর কি অদম্য চেষ্টা—তাহা বাঙ্গলার, বিশেষ করিয়া ফরিদপুরের, অধিবাসীরা মর্ম্মে মর্ম্মে জানে ও স্বীকার করে। এখনও ফরিদপুরের লোক দেবচরিত্র দেবীপ্রসন্নকে দেবতার আসনে স্থান দিয়া থাকে। একবার কোটালিপাড়ার জনৈক ভদ্রলোক বলেন—"সেবার দুর্ভিক্ষের সময় দেখিয়াছিলাম দেবীবাবুর কর্ম্মশক্তি! ভোর চারটে থেকে পরদিন সকাল আটটা পর্য্যন্ত একজায়গায় একভাবে বসে চাল বিতরণ করলেন। এর মধ্যে মুখে অন্নজল নেই, এমন কি মলমূত্র ত্যাগেরও অবসর নাই। রাত্রে সেইখানেই একটা ছেঁড়া মাদুরে অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে নিতেন।" সাধারণতঃ আমাদের নেতৃবৃন্দ আফিস ঘরে বসিয়া কাজ করেন—সহচরেরা উপদেশানুযায়ী চলে। ইঁহাদের মতে, সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রের মারকাটের মধ্যে থাকিলে চলিবে না, পশ্চাতে বসিয়া ইঙ্গিত করিবেন, পদ্ধতি বলিয়া দিবেন, আর সুকুমার বালক ও যুবকবৃন্দ জল ভাঙ্গিয়া, নদী সাঁতরাইয়া বিপন্নের সেবা করিবে। দেবীপ্রসন্ন এই ধরণের নেতা ছিলেন না। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে যখন অবতীর্ণ হইতেন, নিজে আগে চাকায় কাঁধ দিয়া অপরকে আহ্বান করিতেন। ৺পিতৃদেবের* মুখে শুনিয়াছি, একবার ফরিদপুরে যখন ওলাউঠার অত্যন্ত প্রকোপ হয়, মহামারীর মহাগ্রাসে গ্রাম জনশূন্য হইতে থাকে, চিকিৎসার অভাবে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে—তখন দেবীপ্রসন্ন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স বগলে করিয়া পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চিকিৎসা করেন। বর্ষাকালে দেশ জলে জলময়; কোথাও নৌকাযোগে, যেখানে নৌকা চলে না, সেখানে হাঁটিয়া, এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া, অন্ধকারে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া, অনাহারে সারাদিন ঔষধ দিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার অনুচর ও সহকর্ম্মীরা তাঁহার এই কর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত ও প্রবুদ্ধ হইতেন। জীনার সমরক্ষেত্রে শত্রুর ভীষণ গোলাবৃষ্টির মুখে সঙ্কীর্ণ সেতুর উপরে স্বয়ং অগ্রগামী হইয়া নেপোলিয়নের সৈন্য চালনার বীরত্ব ও দেবীপ্রসন্নের এই আচরণ কি একই জাতীয় নয়?

তাঁহার 'সুহৃদসভা' যে ফরিদপুরের কত জলের অভাব, চিকিৎসার অভাব, যাতায়াতের সুবিধার অভাব ও জ্ঞানের অভাব দূর করিয়াছে তাহা ফরিদপুর-বাসী মাত্রেই জানেন। অবরোধ-প্রথার বাধা অতিক্রম করিয়া, অর্থ-সমস্যা সমাধান পূর্ব্বক মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার যে কত দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেবীপ্রসন্ন তাহা বুঝিয়া, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবনপূর্ব্বক, ঘরে বসিয়া পরীক্ষা দিবার সুযোগ দান করিয়া, ফরিদপুরের অন্তঃপুরচারিণীদের অল্পদিনের মধ্যেই সহজে শিক্ষিতা—অন্ততঃপক্ষে লিখিতে পড়িতে অভিজ্ঞা—করিয়া তোলেন। দেবীবাবুর এ কাজটিই তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে।

বন্ধুদের অথবা বাড়ীর কাহারও অসুখ করিলে, তিনি বয়স ও সম্পর্ক নির্ব্বিশেষে, কি ভাবে সেবা করিতেন, তাহা যে না দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না। বন্ধুপ্রীতিও তাঁহার

* স্বর্গীয় রসিকলাল রায়।

অসাধারণ ছিল। লোককে তিনি ব্যবহারে ও কথায় পরিতুষ্ট করিয়া, একেবারে অনুগত করিয়া ফেলিতে পারিতেন। একবার 'ঢোল-সমুদ্র' পার হইবার সময় তাঁহার নৌকা নিমজ্জনোন্মুখ হয়। আমার ৺পিতৃদেব নাকি তীরে দাঁড়াইয়া, যতক্ষণ নৌকা দেখা গিয়াছিল, এক-দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন এবং সাশ্রুনয়নে কর-জোড়ে ভগবানের নিকট দেবীবাবুকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কবি গোবিন্দদাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে দেবীবাবুকে লেখেন—"আমি জানিতাম, একা আমিই দেবীবাবুকে ভালবাসি, সেদিন দেখিলাম আর একজনও আমার মতই আপনাকে ভক্তি করেন।" আমার পিতৃদেব সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে, তিনি দেবীবাবুকে যে কতখানি ভালবাসিতেন তাহাই আমাকে বুঝাইবার জন্য ঐ ঘটনা দেবীবাবু স্বয়ং আমার নিকট বিবৃত করেন। আজ মনে হইতেছে—আমার পিতৃদেব অশিক্ষিত ছিলেন না—অন্ধভক্তের দলভুক্ত তিনি ছিলেন না—স্বার্থান্বেষীও তিনি ছিলেন না; কিন্তু, দেবীবাবুর চরিত্রের এমনই একটা দিক ছিল, যাহা দেখিয়াই তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবং আরও অনেকে ছিলেন, এবং আছেন যাঁহারা দেবীবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহাকে ঐরূপ ভাবেই শ্রদ্ধা করিতেন।

দেবীপ্রসন্নের জীবন হইতে আর একটি খুব বড় জিনিস শিখিবার আছে, তাহা কোনরূপ শারীরিক কর্ম্মে পশ্চাৎপদ না হওয়া। যখন অর্থ তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যদ্বারা ধনী-সমাজে তাঁহার আভিজাত্য স্বীকৃত হইয়াছে, তখনও দেখিয়াছি, বাড়ীর কোথাও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলে, স্বয়ং তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। চাকরেরা কাজে ব্যস্ত, নিজেই কোঁচার একপ্রান্ত গায়ে জড়াইয়া, একটি পেরেক কিনিতে ঠনঠনিয়ার মোড় পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন। যদি এমন কোনও কাজ থাকিত যাহা ভৃত্যদের করিতে বলিলে তাহারা অপমানিত বোধ করিতে পারে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সে কার্য্য তিনি স্বয়ং করিতেন, তাহা যতই হীন কাজ হউক না কেন। একদিন বাটীর ভিত্তিগাত্রে কে কফ-মিশ্রিত নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করে; তিনি তাহা দেখিয়া,নিজেই ঘটিতে জল লইয়া স্বহস্তে ঘষিয়া পরিষ্কার করেন। কাহাকেও আজ্ঞা করিলেই কাজটি হইত; কিন্তু, পাছে কেহ ক্ষুণ্ণ হয়, সেই জন্য তাহা করিলেন না। মানুষ কতটা উন্নত হইলে, তাহার চরিত্রে এই বিশেষত্ব দেখা যায়, তাহা ভাবিবার বিষয়।

তিনি পুরুষ-সিংহ ছিলেন, তাঁহার বলিষ্ঠ ন্যায়-পরায়ণতা ছিল। যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহা বলিতেন; যাহা বলিতেন, তাহা আবার করিতেন। কাহাকেও এজন্য ভয় করেন নাই; সর্ব্বতোভাবে আপনাকে ও আপনার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টার সম্মুখে, সকল বাধা হয় মস্তক অবনত করিত, নয় চূর্ণ হইয়া যাইত।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানপত্র বিহীন হইয়াও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজের নামের স্থান আদায় করিয়া লইয়া ছিলেন। এই অ-সহযোগিতার হিড়িকে, স্কুল কলেজের বিদ্যা ব্যতীত কি করিয়া খাইব, এই আশঙ্কায় যে সকল ছাত্র ভীত হইতেছে, তাহারা দেবীবাবুর জীবনী একবার আলোচনা করিয়া দেখিলে পারে। ত্যাগ, সততা, একনিষ্ঠতা ও ঈশ্বরভক্তি থাকিলে, যে কোনও প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িলেও, মানুষ

ধনে, মানে ও জ্ঞানে নিজেকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, দেবীবাবুর জীবন তাহার দীপ্ত সাক্ষী।

সরস্বতীর সাধনা তিনি সারা জীবন এক-নিষ্ঠ ভাবে করিয়াছেন ; অর্থ চান নাই, মানও চাহেন নাই। বাগ্দেবী কিন্তু তাঁহাকে এই দুইটাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছিলেন। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় বাম হস্ত উদরে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে পূজারীগণ বাণীর চরণে অঞ্জলি অর্পণ করেন। দেবী-প্রসন্নের পূজাপদ্ধতি এরূপ ছিল না তা' বিশেষ করিয়া বলাই বাহুল্য। তিনি হয়ত কোনও নূতন ভাবে ও নূতন পথে সাহিত্যের ধারা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, হয়ত তিনি কোনও একটা বিশেষরূপে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই ; কিন্তু তিনি যথেষ্টরূপে সাহিত্যের পালন, পোষণ ও সেবা করিয়া-ছেন—শুদ্ধভাবে ও শুদ্ধচিত্তে।

গৃহীব্যক্তি মাত্রেরই জীবন যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে অনেক দোষই তাহাতে পাওয়া যাইতে পারে। দেবী-বাবু সম্বন্ধে যে একথা খাটে না, তাহা বলিতে চাহি না। তিনিও মানুষ ছিলেন ; দোষ ত্রুটির অগম্য তিনি ছিলেন না। কিন্তু দূর হইতে আমরা দশজনে যখন নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য কোনও ব্যক্তির জীবন আলোচনা করি, বিশেষতঃ সেই সব ব্যক্তির, যাঁহারা কালের বুকে অমর পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দোষগুলি আমাদের চোখে স্পষ্ট ছায়াপাত করে না। সূর্য্যের মতই তাঁহারা তেজ ও দীপ্তিতে ভাস্বর—সূর্য্যের অদৃশ্য অঙ্গব্রণের মতই তাঁহা-দের দোষও গুণরাশির অন্তরালে নেপথ্যে অব-স্থান করে। দেবীবাবু যে মন্ত্রবলে জীবন উদ্-যাপিত করিয়াছিলেন, যে সাধনা দ্বারা জীবন সার্থক করিয়াছিলেন, সেই আগুণের স্ফুলিঙ্গ মাত্রও যদি আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়া কর্ম্ম ও সাধনার জলন্ত আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগাইয়া দেয়, আপনাকে তাহা হইলে ধন্য মনে করিব। তাই আজ সেই স্বর্গগত মহা-পুরুষকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সত্যনিষ্ঠ জীবনকে ধ্যান করিয়া, আপনাকে আপনি আহ্বান করিতেছি—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ নিবোধত।"

শ্রীসুধীন্দ্র লাল রায়।

পরলোকে দেবীপ্রসন্ন।

যখন গত আশ্বিন মাসে পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রৈলোক্য নাথ কবি-ভূষণ মহাশয়ের পত্রে পরম শ্রদ্ধাভাজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং সতত শুভানুধ্যায়ী দেবীপ্রসন্ন বাবুর ইহলোক পরিত্যাগের হৃদয়-বিদারক সংবাদ পাইলাম, তখন সেটা এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে আঘাত আমাকে অবসন্ন করিয়া দিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ সাংঘাতিক কোন পীড়া হয় নাই, সুতরাং এরূপ সংবাদের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান কে রোধ করিবে? কখন কি ভাবে যে কাহার উপর মৃত্যু তাহার কঠোর হস্ত

বিস্তার করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং; সুতরাং, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু দেবীপ্রসন্নের এই হঠাৎ মহাপ্রস্থানে আমরা যে কি এক অমূল্য-রত্ন হারাইলাম, তাহা ভাবিতে গেলেই শোকে হৃদয় অবশ হইয়া আসে। আমাদের হতভাগ্য ফরিদপুরের এমন একনিষ্ঠ সেবক কি আর আছে? দেবীপ্রসন্নের তিরোধানে ফরিদপুরের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। এজন্য ফরিদপুর-সন্তান আমাদের, তাঁহার মৃত্যুতে আরো বেশী শোকের কারণ ঘটিয়াছে।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে ফরিদপুর জেলার উলপুর গ্রামের বিখ্যাত কায়স্থ রায় চৌধুরী বংশেই তাঁহার জন্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহাকে উলপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাতে স্থায়ী বাসস্থান করিতে হইলেও, তিনি সারা জীবন ফরিদপুরের চিন্তাকেই জপমালা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাতে কখনও ত্রুটি করেন নাই। দুর্গম পথ, ম্যালেরিয়া, পচা জল-পূর্ণ খানা, ডোবা ও পুকুর কিছুই তাঁহাকে পশ্চাদপদ করিতে সক্ষম হয় নাই; ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া তিনি অশেষ অসুবিধা এবং কষ্ট সহ্য করিয়াও ফরিদপুরের নানা গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্টের কথা বাসিন্দাগণের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়াছেন; তাহার প্রতিকার-কল্পে উদ্যুক্ত হইয়াছেন।

'ফরিদপুর সুহৃৎ-সভা' তাঁহারই অক্লান্ত সাধনার ফল এবং তিনিই ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইহার জন্য তিনি আর্থিক ক্ষতি অনেক সহ্য করিয়াছেন, শারীরিক কষ্টও যথেষ্ট পাইয়াছেন। আমরা ফরিদপুর জেলাবাসী অনেকেই মৌখিক সহানুভূতি দেখাইলেও, কাজে বড় একটা কেহই কিছু করি নাই। বার্ষিক ১৲ টাকা মাত্র চাঁদার টাকাও কত কত সভ্যের বহু বৎসরের বাকী পড়িয়া আছে, তাহা চাঁদার হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে। দেবীপ্রসন্ন বাবু কিন্তু সভার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ, পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; যাঁহারা ভিতরের খবর জানেন, তাঁহারা বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। এই 'সুহৃৎ সভার' দ্বারা ফরিদপুর জেলার অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষাবিধানের জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা যদি সম্যক্ ফলবতী না হইয়া থাকে, তবে সে পক্ষে আমাদের ঔদাসীন্যই তাহার কারণ; তাঁহার ঐকান্তিকতার অভাব নহে।

আমি যখন আট কি দশ বৎসরের বালক, সেই সময় হইতেই দেবীপ্রসন্নের নামের সহিত পরিচিত হই। আমার জন্মভূমি যশাই গ্রামের নিকটবর্ত্তী, হাবাসপুর গ্রামের জ্যেষ্ঠ সোদর-তুল্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র নাগ মহাশয়ের নিকট হইতে আমি দেবীবাবুর প্রণীত শরচ্চন্দ্র, সন্ন্যাসী, ভিখারী, বিরাজমোহন প্রভৃতি পুস্তক পাইয়া, সেই সময়ই উহা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করি; এবং তাহার পরই, তাঁহার "নব্যভারত" প্রকাশিত হইলে, তখন হইতেই আমি উহারও নিয়মিত পাঠক ছিলাম। সেই সময় হইতেই, আমাদের ফরিদপুরের এই গৌরবরত্নটির প্রতি আমার হৃদয় শ্রদ্ধাবনত হইয়া

পড়ে। তারপর ক্রমে, আমার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অন্যান্য পুস্তকাবলীও আমি পাঠ করিতে থাকি, এবং তাঁহার নানা সদ্গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, স্বতঃই হৃদয় তাহার প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট হয়।

অতঃপর কলিকাতাতে বি,এ, পড়িবার সময় তাঁহাকে প্রথম দেখিবার সৌভাগ্য হয় এবং তাঁহার সঙ্গে সামান্য পরিচয়ও হইয়া যায়।

তখন হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ অজস্রধারে আমার উপর বর্ষিত হইয়াছে। তাঁহার স্বভাব এমনই অমায়িক ছিল, এমনই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে তিনি জানিতেন, যে তাঁহার স্নেহপাত্রগণের প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে তাঁহাকেই তিনি সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পড়িয়াছিলাম মনে হয়, যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ-পূত-হৃদয়া গোপকামিনীগণের প্রত্যেকেরই মনে এই অভিমান ছিল, গোপাল তাঁহারই প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত। এমনই তাঁহার প্রাণ দিয়া প্রেম-সঞ্চার করিবার প্রভাব।

দেবীবাবুর বিষয়েও কতকটা এই ভাবের অভিমান তাঁহার স্নেহপাত্রগণের মনে ছিল বলিয়া আমার ধারণা; কারণ, এইরূপ কয়েক-জন বন্ধুর সহিত আলাপে, এই ভাব প্রত্যে-কের মধ্যেই দেখিয়াছি।

যিনি 'আনন্দাশ্রমের' সেবক, দেবী-হৃদয়া কমল কামিনীর স্বামী, পতিত, ত্যক্ত, দুঃস্থ অনাথের আশ্রয়স্থল, তাঁহার হৃদয় এইরূপ উদার প্রেম-প্রবণ হওয়াই ত স্বাভাবিক।

নীরবকর্ম্মী দেবীপ্রসন্নের, ধর্ম্ম-প্রাণ দেবী-প্রসন্নের, নির্ভিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সমালোচক ও সম্পাদক দেবীপ্রসন্নের, প্রবীণ সাহিত্য-সেবক দেবীপ্রসন্নের, দেশভক্ত স্বাবলম্বন-পন্থী দেবী-প্রসন্নের, বন্ধু-বৎসল দেবীপ্রসন্নের, সত্যৈক-ব্রত দেবীপ্রসন্নের দীর্ঘ কর্ম্মময় বিচিত্র ঘটনা-বহুল জীবনের সমুদয় কাহিনী বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য; আমি তাহা করিতেও আসি নাই। তদ্বিষয়ে আমাপেক্ষা বহুগুণে যোগ্যতর অনেক বন্ধু আছেন। আমি কেবল তাঁহার বিয়োগ-স্মৃতির তর্পণস্বরূপ দুই চারি বিন্দু অশ্রু অঞ্জলি প্রদান করিতে আসিয়াছি মাত্র। তাঁহার যে সব গুণে আমি তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলাম, তাহারই দুই একটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া তাঁহার মহত্ব বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।

যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, তিনি কিরূপ সাদা সিদা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। সাদা ধুতি, সাদা জামা ও চাদর, শীতের দিনেও ছাই রঙ্গের একখানা আলোয়ান, এই তাঁর পোষাক ছিল।

সাদা বাফ্‌তা কি জিনের কোটও সময় সময় ব্যবহার করিতেন কিন্তু সবই সাদা সিদা। সুগন্ধি এসেন্সাদি কখন তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দেখি নাই। পুণ্যবতী সাধ্বী কমল কামিনী তো একেবারে সেকেলে হিন্দু-ঘরের মেয়েদের আদর্শ ছিলেন। লালপেড়ে মোটা শাড়ী আর হাতের শাঁখা তাঁহার তাঁহার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারের প্রধান উপকরণ ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। একবার এই বিলাসিতার সম্বন্ধে দেবী-বাবুর সহিত আমার কথা হইতেছিল। সেই প্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে তাঁহাদের ব্রাহ্ম-সমাজে এই বিলাসিতার স্রোতটা বড় বেশী পরিমাণে প্রবাহিত

হইতেছে এবং সেজন্য ব্রাহ্ম-সমাজ নিজের পূর্ব্ব পদ-গৌরব হইতে অধঃপতিত হইয়াছেন। পুরুষদিগের অপেক্ষাও রমণীগণ এ বিষয়ে বেশী অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখন ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে ধর্ম্মাদর্শের পূজা রহিত হইয়া, বিলাস-বাহুল্যের পূজাই বেশী চলি-তেছে। দেবীবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,— "সেই জন্যেই তো আমার সমাজের অনেকে আমাকে দেখিতে পারেন না; কারণ আমিও ঠিক আপনার এই সব কথাই তাঁদের বলি! কি দেখে এখন লোকে ব্রাহ্ম হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে? না আছে সত্যের মর্য্যাদা; না আছে চরিত্র, না আছে কিছু! কেবল যেনতেন প্রকারেণ স্বার্থ-সাধন, আমোদের পূরণ, বিলাস-লীলা, উচ্ছৃঙ্খলতা, আর পরচর্চ্চা। যাঁরা এ সব ভালবাসেন না, তাঁরা দূরে সরে যেতে চান—এ সবের মধ্যে তাঁদের পোষায় না! তাই আমি কোন সমাজেরই নই, কোন সমাজেই মিশিনা; উচিত কথা বল্‌লেই লোকে চ'টে যায়; কি করি বলুন।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে নিজ মনোবেদনা ব্যক্ত করিয়া নীরব হইলেন।

ধর্ম্মের গোঁড়ামি তাঁহাতে মোটেই ছিল না। সত্য-ধর্ম্ম-বোধে তিনি নিজ কৌলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অশেষ নির্য্যাতন এবং ক্লেশ সহ্য করিয়াও, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া, ধর্ম্মান্তর-বিদ্বেষ তাঁর মধ্যে ছিল না। হিন্দু-ধর্ম্মের আচরণ-কারীগণের মধ্যে ভাল লোক পাইলে, তাঁহা-তিনি শুধু আদর নহে, রীতিমত ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাদের কাছে কত শিক্ষনীয় বিষয় আছে তাহা উৎসাহের সঙ্গে বিবৃত করিতেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুগণের বাড়ীতে কোন পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইলে, তথায় যাইতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। আমার দাদার কলিকাতার বাসাতে একবার শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠান করা হয়; দেবী বাবুকেও নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হইয়াছিল। পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি তাঁর বাসাতে দেখা করিতে যাই; তিনি তখন অসুস্থ। আমাকে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেখুন, দাদা আমাকে পূজার নিমন্ত্রণ দিয়াছেন, আমিও আনন্দের সহিত যাইতাম; কিন্তু আমি অসুস্থ, ডাক্তার আমাকে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাই বাধ্য হইয়া এ স্নেহ-আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অক্ষম হইলাম। দাদা যেন, আর কিছু মনে করে, কষ্ট বোধ-না করেন। দাদা যে পূজা কচ্ছেন, সেও তো সেই জগন্মাতারই পূজা। যে রূপেই যাঁর বিশ্বাস, সবই তো সেই একেরই উদ্দেশ্যে। সুতরাং, আমার যেতে আপত্তি বা বাধা হতেই পারে না, দাদাকে বুঝিয়ে বল্‌বেন।"

একবার আমাদের একটি বাসা খোঁজ করার দরকার হওয়াতে, দেবীবাবু তাঁহার আত্মীয় একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের বাড়ীর এক অংশ আমাদিগকে লইতে পরামর্শ দেন, এবং সেই বাড়ী দেখার জন্য আমাকে সেখানে যাইতে বলেন। আমি গিয়া, বাড়ীটির যে অংশ ভাড়া দেওয়া হইবে, তাহা দেখিলাম। তারপর, বাড়ীর অধিকারীর সহিত কথা-প্রসঙ্গে জানিলাম যে, আমরা হিন্দুমতে সময় সময় যে পূজা অর্চ্চনা করিব, তাহার শঙ্খ, ঘণ্টাদির বাদ্যে তাঁহাদের অসুবিধা হইবার সম্ভব। আমি সেই কথা দেবীবাবুকে আসিয়া বলাতে তিনি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য কথা! আপনারা কি রঙ্গ-

রসের গান বাজনা করিবেন, না মদ খাইয়া ঢলাঢলি করিবেন, যে অসুবিধা হইতে পারে? ও সব কোন কথাই নহে, আমি সে সব ঠিক করিয়া দিব। পণ্ডিত মশায় ঋষি-তুল্য লোক, তাঁর সঙ্গে একত্রে বাস তো পুণ্যের কথা, ভাগ্যের কথা!" ইহাতেও তাঁহার সেই উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমার কন্যার বিবাহের সময়ও তিনি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন। আবার আমার কনিষ্ঠ তৃতীয় ভ্রাতার সাংঘাতিক পীড়া হইলে, পুরীতে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবার কথা হয়, তখন তিনি সাগ্রহে তাঁহার পুরীর বাড়ীর একখণ্ড আমাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, স্বাস্থ্যকর স্থানে কয়েকটা বাড়ী করিয়া রাখিয়াছি তো এই জন্যই, যে সময় সময় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণের দরকার মত একটু উপকার করা যাইতে পারে। নিজেরাও ত সময় সময় থাকিতে পারি। আর ভাড়া দিয়া যাহা পাওয়া যায়, তার দ্বারা উহাদের মেরামত আদি কাজ চলিলেই যথেষ্ট। সত্য সত্যই দেবীবাবু যে কতদূর পর-দুঃখ কাতর ছিলেন, পরের বিপদে নিজেকে কতদূর বিপন্ন মনে করিতেন এবং কিরূপ উৎসাহের সহিত প্রাণপণে পরের দুঃখ-কষ্টে সাহায্য এবং সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, তাহা যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না।

বন্ধুবর ৺ রসিকলাল রায় মহাশয় যখন পীড়িত হইয়া অখিল মিস্ত্রীর লেনের মেসের বাসাতে ছিলেন, সে সময় আমি কলিকাতাতে ছিলাম। সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে দেখিতে গিয়া দেখিলাম যে দেবী প্রসন্ন বাবুও সেখানে উপস্থিত আছেন। তিনি রসিক বাবুকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। তখন রসিকবাবু যাইতে সম্মত হন নাই; দেখা যাউক কিরূপ দাঁড়ায়, এইরূপ বলিয়াছিলেন। আমি ও দেবীবাবু একত্রেই তথা হইতে ফিরিলাম। পথে, তিনি, রসিকবাবু কেন এত সঙ্কোচ বোধ কচ্ছেন, এই বলিয়া বড় দুঃখ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তার পরদিনও রসিক বাবুকে দেখিতে গেলাম এবং তাঁহাকে দেবীবাবুর বাড়ীতে যাইতেই পরামর্শ দিলাম। তার ২।১ দিন পরেই রসিকবাবু দেবী বাবুর বাড়ীতেই আসিয়া ছিলেন। সেখানে আসার পরও আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি; তাঁর পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্র লালও তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। সেখানে দেবীবাবু এবং তাঁর পরিবারস্থ সকলে রসিক বাবুকে যেরূপ যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁর কাছেই আমি শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় যে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও, রসিকবাবু কাল-কবল হইতে রক্ষা পান নাই।

দেবীবাবু নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপর এতদূর দৃঢ় ছিলেন যে তাহার বিরুদ্ধ-কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই পরিপন্থী-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন; তাহার জন্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কাহারও অসন্তুষ্টি, ভ্রূকুটি, পীড়ন কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। এভাব তাঁহার দীর্ঘ-জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যে দেদীপ্যমান দেখা যায়।

এই জন্যই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইয়াও সে সমাজের দোষ ত্রুটি, বিচ্যুতি প্রভৃতির প্রতিবাদ বরাবর তীব্রভাবে তিনি করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রিয় বন্ধুর কার্য্যও,

অন্যায় বুঝিলে, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তিনি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। আবার অপর ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে সদ্‌গুণ, ধর্ম্মভাবের বিকাশ, ঐকান্তিকতা প্রভৃতি দেখিলে তাহার প্রশংসা শতমুখে করিয়াছেন। ৺ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিরদিন্ ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সেই ইন্দ্রনাথের পরলোক-গমনে, দেবীবাবু যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ইন্দ্রনাথের গুণস্তুতি বিষয়ে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রবন্ধ আমি বোধ হয় আর কোন কাগজে দেখি নাই।

সহজ বিশ্বাস এবং ভক্তির সহিত যে কোন ভাবে ভগবানকে ডাকিলেই যে মুক্তি-পথ প্রশস্ত হইতে পারে, এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করিতেন। আমি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে 'যমুনা'-নামক পত্রিকাতে "বিশ্বনাথ মন্দিরে" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমরা হৃদয়ে সন্দেহ এবং দ্বৈধভাব লইয়া বিশ্বনাথ মন্দিরে যাই, পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া পূজার্চ্চনা করি না, নিরক্ষর মূর্খ লোকেরা হৃদয়ের প্রবল বিশ্বাস ও ভক্তি লইয়া সেখানে যায়, সুতরাং, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীবিশ্বনাথের দর্শনলাভ করে, এই ভাবের কথা ছিল। সেই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে দেবীবাবু আমাকে বলেন "আপনার প্রবন্ধটা আমার বেশ লেগেছে। প্রকৃতপক্ষেই, আমি যখন দেখিতে পাই ঐরূপ সহজ বিশ্বাসী ভক্ত তাহার পাথরের ঠাকুরটির নিকট প্রাণের বাসনা জানাইতেছে, তাহার সম্মুখে দরবিগলিত ধারে অশ্রুপাত করিতেছে, তাহাকে খাওয়াইয়া, পোষাক পরাইয়া, শোওয়াইয়া পরম শান্তি পাইতেছে, তখন প্রাণে বড়ই কষ্ট হয় যে আমি কবে ঐরূপভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইব। তার কাছে তো ওটা পাথর নয়। তার শুদ্ধা ভক্তি যে উহাতে অমর প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে! আহা!"—তাঁর চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

সাধন-রাজ্যে তিনি অনেক দূরই অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া আমি মনে করি, যদিও সে সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু নিজজ্ঞানে জানি না। তবে সংসারের নানা ঝড় ঝঞ্ঝা তাঁহার উপর দিয়া প্রবলভাবে বহিয়া গিয়াছে, শোক, তাপ, অনাটন, উৎপীড়ন তাঁহাকে অনেক ভয় দেখাইয়াছে, কিন্তু তিনি প্রশান্ত অটল অচলভাবে তাহা সহ্য করিয়াছেন; ইহাতেই তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠার পরিচয় ভালরূপই পাওয়া যায়।

যাঁহারা নিয়মিতভাবে তাঁহার 'নব্যভারত' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতেই তাঁহার চরিত্র বিশিষ্টতার অনেক পরিচয় পাইবেন। ইদানীং কিছুকাল তিনি যে 'সঙ্কলিকা' লিখিতেছিলেন, তাহা হইতেও তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত ভাল রূপেই জানা যাইত। তিনি রাজনীতিতে ভিক্ষার পথের পথিক ছিলেন না, গরম দলের মতই তাঁহার ছিল, তাহা আমরা জানি। আর 'সঙ্কলিকা'তে তাহা স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কুটিল কটাক্ষে ভীত হইবার লোক ছিলেন না। কখনও কাহারও খোসামোদ করিতে যান নাই, বা অনুগ্রহ-প্রার্থী হন নাই। দেহ মনে পবিত্রতা রক্ষার আগ্রহ তাঁহাতে প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। এদিকে তিনি আবার পরম উদার, শিশুর ন্যায় সরল, অমায়িক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম হইলেও তাঁহার 'নব্যভারতে' সকল সম্প্রদায়ের লেখকগণের স্বীয় স্বাধীন-মত প্রকাশিত হইত। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা তাঁর কাছে ছিল না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেবীবাবুর প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। তিনি অনেক উপন্যাস,

প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। সমস্তগুলিই সদ্ভাব-উদ্দীপক এবং তাহার দ্বারা অনেকের জীবনের গতি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা জানি।

যাহারা সাহিত্য-চর্চ্চা করেন, এমন যুবক-গণকে তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। আমার ন্যায় নগণ্য অযোগ্য সাহিত্য-সেবকের অনেক প্রবন্ধের এবং প্রকাশিত পুস্তক দুইখানির সম্বন্ধেও তিনি খুব প্রশংসা করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার 'বান্ধবে' বহুকাল পূর্ব্বে (বোধহয় এখন হইতে ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে) আমি 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উহা প্রকাশিত হইবার পর, আমার সঙ্গে যখন দেবীবাবুর দেখা হয়, তখন ঐ প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া আমাকে এরূপ প্রীতি-প্রফুল্ল ভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন যে, আমি বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

মধ্যে মধ্যে সমালোচনার্থ যে সব পুস্তক পাইতেন, তাহাও আমাকে পড়িতে দিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র মতামতও জানিতে চাহিতেন; কোন কোন স্থানে তাঁহার মতের সঙ্গে আমার মত না মিলিলে, আমার যুক্তি দেখাইতে বলিতেন এবং নিজ যুক্তি ও প্রদর্শন করিতেন। মাইকেল জীবনী প্রণেতা, পৃথ্বীরাজ ও শিবাজীর প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য তিনিই আমাকে বিশেষ করিয়া বলেন এবং তাঁর পরামর্শমতই যোগীন্দ্র বাবুর বাটীতে গিয়া তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়া কৃতার্থ হই।

বেশী কি আর বলিব। কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে, কি সমাজ-সংস্কারে, কি ধর্ম্ম-প্রাণতায়, দেবী-প্রসন্ন যে স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার অভাবে তাহার শূন্যতা পূর্ণ হওয়া কঠিন।

তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম বাবুর এ বিয়োগ বেদনাতে স্বীয় বেদনার অশ্রু-সেচন করা ভিন্ন আমাদের আর কি করণীয় আছে? দেবী বাবু ব্রহ্মপদে চির-শান্তি লাভ করিয়াছেন। প্রভাত বাবু সেই দেবোপম কর্ম্মী মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনু-সরণ পূর্ব্বক, সংসারে পরম প্রতিষ্ঠা-লাভ করুন, ভগবৎ চরণে এই প্রার্থনা।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

"দেবী"-বিয়োগে।

হে বঙ্গজননী! তুলি ফুল সাজি ভরে
প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-পূত পবিত্র অন্তরে
অর্পিলা জীবন-অর্ঘ্য যে মহান্ প্রাণ
আজি সে নীরব হেথা, নীরব প্রয়াণ!
'মুরলা' 'সন্ন্যাসী' চিত্র অমল ভাষায়,
আঁকিয়া নিঁখুত ছবি সরলতাময়;
কে ভুলাবে কে কাঁদাবে বাঙ্গালীর মন
আজি সে নীরব বীণা, নীরব এখন।
কোলাহলময় এই সংসারের কাজে
তোমারি প্রতিভা-দীপ্তি সতত বিরাজে;
সাধিয়া মহান্-ব্রত, হে মৌন, মধুর,
লভিলা বিশ্রাম এবে পুণ্য দেব-পুর
দেব-গৃহ কোলে। মরণ?—মরণে মিলন
এ যে তার প্রাণভরা সুখ-সম্মিলন।

ভারতী মায়ের স্নিগ্ধ জ্ঞান-দীপ্তি নিয়ে
হে "দেবীপ্রসন্ন", তুমি সব প্রাণ দিয়ে
সাধিলে যে দিন সেই একেশ্বর কথা,
রহিবে স্মরণ তাহা মরমেতে গাঁথা ;
সত্য-ধর্ম্ম, জ্ঞান-মর্ম্ম মহিমা প্রচার,
করিবে তোমার কীর্ত্তি, অক্ষয় অপার।
তোমারি বিহনে হায়, ভারতী মাতার
দুটি চোখে ঝর্ ঝরে নয়ন আসার।

তাই মোর শেষ ভিক্ষা, হে মহান্ ঋষি,
সাম্য-প্রেম-মৈত্রী পথে মাতাইয়া দিশি,
শিখাতে একের মন্ত্র ভাই ভগ্নীগণে—
আবার আবার পুনঃ এসো এ ভুবনে।

* * * * * * * *

সবি তো নিবিয়া গেল, নিবিল রে আলো,
ধন্য আমি—ধন্য তাঁরে বাসিয়াছি ভালো।

শ্রীপ্রফুল্লশেখর মিত্র।

দুটি দুই কথা।

তিনি নাই। তাও কি হইতে পারে? তিনি আছেন, তিনি উচ্চতর লোকে গিয়াছেন। হতভাগ্য আমরা, তাঁহার সেই সৌম্য, সেই উৎসাহ-দীপ্ত-মূর্ত্তির দর্শন-লাভে বঞ্চিত হইয়াছি।

দেবীপ্রসন্নের সহিত আমার পরিচয় প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে। তিনি তখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক, আমি সবেমাত্র কলেজে প্রবেশ করিয়াছি। বয়স ও অবস্থাগত পার্থক্য তিনি অনুভব করিতে দিলেন না। তাহার পর, কতবার, কত সময়, কত উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে, বরাবর কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতন দেখিয়াছেন। কত সুখ দুঃখের কথা কহিয়াছেন, দেশের কত কথা আলোচনা করিয়াছেন, 'নব্য ভারতে' লেখার জন্য কত উৎসাহিত করিয়াছেন। সেরূপ আন্তরিকতা আর কোথায় পাইব।

দেশের ও দশের সেবা, বিলাসিতা-বর্জ্জন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি বলিতেন, যখন দেশের লোকের অবস্থা দেখি, উদরান্নের অভাব দেখি, কত আত্মীয়স্বজনের অর্থ-কষ্ট দেখি, অমনই মনে হয় বিলাসিতায় অধিকার নাই। তিনি স্ব-গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, স্ব-গৃহে 'আনন্দাশ্রমের' অনেকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্ব-জেলায় দুর্ভিক্ষ বা মারীভয় উপস্থিত হইলে তখনই সেবাব্রতে লাগিয়া যাইতেন ; কিন্তু নিজেরও নিজ পরিবারের জীবনে, চিরকাল তাঁহার আদর্শ ছিল, plain living and high thinking। কখনও তাঁহাকে পায়ে মোজা ব্যবহার করিতে দেখি নাই ; পরিচ্ছদ সর্ব্বদাই নিতান্ত সাদাসিধে রকমের ছিল ; খাদ্য দ্রব্যে কখনই অপব্যয়ী ছিলেন না।

পুত্র প্রভাতকুসুমের বিবাহের পর, তাঁহার পুত্রবধূর পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে দেখাইতে আনিয়াছিলেন ; তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলেন,—'উহা আমাকে দেখান কেন, আমার নিকট ছাই মুষ্টিও যাহা, এ অলঙ্কার-সমষ্টিও তাই'। গল্পটি তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছিলাম। সূত্রধরের যন্ত্রাদি তিনি নিজে রাখিতেন ও ব্যবহার করিতেন। দেওয়ালে চুণের লেপ দিয়া, সেই অপরিষ্কৃত হস্তে বৈঠকখানায় কথা কহিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি।

তাঁহার দেবী প্রতিমা সহধর্ম্মিণী তাঁহারই দৃষ্টান্ত ও উপদেশে অনুপ্রাণিতা ছিলেন।

একমাত্র পুত্র প্রভাত কুসুমকে বিলাত পাঠাইবার সময়ে তিনি দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার, দেশীয় ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি বদ্ধ করিয়া লন। দেশী ভাষার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কত বড় বড় সাহেবী ধরণের বাঙ্গালীর ইংরেজী চিঠির তিনি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তর দিয়াছেন। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও, তিনি "নব্যভারত"কে কখনও হস্তচ্যুত করেন নাই। এত দীর্ঘকাল, এক হস্তে, কোনও মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালা দেশে পরিচালিত হয় নাই। নব্যভারত চিরকাল একভাবে চলিয়াছে। কখনও গল্প বা উপন্যাসের সমাবেশ দ্বারা ইহার গুরুত্বের লাঘব করেন নাই। গল্প ও উপন্যাস না থাকিলে মাসিক পত্রিকা এ দেশে বেশী কাটে না, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু সামান্য অর্থের জন্য কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সাহিত্যের গতি নিয়মিত করিবেন, তরল সাহিত্যের আশ্রয়স্থল করিয়া নব্যভারতের আসন নিম্নে নামাইবেন না, ইহা তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। অনেক বিজ্ঞাপন প্রতারণা-মূলক ও বিলাসিতা বর্দ্ধক বলিয়া তিনি (মলাটের পৃষ্ঠায় সামান্য কয়েকটী ব্যতীত) নব্যভারতের দেহ কখনই বিজ্ঞাপনদ্বারা ভারাক্রান্ত করিতেন না। বিজ্ঞাপন যে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পক্ষে একটী বিশেষ লাভজনক ব্যাপার তাহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু বিলাসিতা ও প্রতারণা নিবারণ তিনি গুরুতর কর্ত্তব্য মনে করিতেন। নব্যভারতের কাগজ ও ছাপাও এইজন্য বরাবর বিলাসিতা বর্জ্জিত রহিয়া গিয়াছে। তরল-সাহিত্যের অঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বারবণিতার অভিনয় চিরকাল তাঁহার ঘৃণার বিষয় ছিল। সাধ্যমত কায়িক পরিশ্রমে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ঘরে কলি ফিরান ও সূত্রধরের কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি। নব্যভারতের উপরে গ্রাহকের ঠিকানা পর্য্যন্ত তিনি স্বহস্তে লিখিতেন। প্রত্যেক গ্রাহকের হিসাব তিনি নিজে রাখিতেন।

তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম জীবনে ধর্ম্মবিশ্বাসের উত্তেজনায় গৃহ ও গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। স্বাধীন ভাব ও সত্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থার অশেষবিধ তাড়নার মধ্যেও কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হন। শুনিয়াছি তিনি এই অবস্থা হইতে প্রথমে যে অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কোনও সমশ্রেণীর দুরবস্থাপন্ন বন্ধুকে, আলুর ব্যবসায়ের জন্য দেন। বন্ধুটী এই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ফরিদপুরের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা কোন কালেও ভুলিবার নয়। সুহৃদ্ সভা তাঁহার অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত ছিল। রুগ্নদেহে পুনঃ পুনঃ ইহার সম্পাদকীয় ভার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেও ফরিদপুরবাসী তাঁহাকে ছাড়ে নাই। জানি না তাঁহার অবর্ত্তমানে ইহার কি হইবে।

সত্যকে মূল সূত্র করিয়া তিনি জীবন-ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, স্বাধীন ভাবের প্ররোচনায় তিনি যে কখনও পার্থিব বিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করেন নাই এ কথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার শ্রেণীর লোক সেদিকে লক্ষ্য রাখে না। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া

উঠিতেন। পূর্ব্বপুরুষের সমাজের নিগ্রহ মস্তক পাতিয়া লইয়া তিনি যে সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী সময়ে সত্যের অনুরোধে অনেক সময়ই জলন্ত ভাষায় তাহার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার সেই স্বাধীন ভাবের প্ররোচনায় তাহা হইতে কতকটা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার সৌম্য মুখশ্রী বক্তৃতা-কালে অনেক সময় আন্তরিক তেজে অগ্নিময় হইয়া উঠিত। বোধ হইত যেন তাঁহার প্রতি বাক্যে বিশ্বাস মূর্ত্তিমান হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য-সেবক ভক্ত দেবীপ্রসন্ন।

বঙ্গের সাহিত্যাকাশ হইতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল! বঙ্গের সাহিত্য কাননে প্রস্ফুটিত কুসুম "নব্যভারত" শ্রীহীন হইলেন! দেবী প্রসন্নের বৈদ্যুতিক লেখনী নীরব হইল! ভক্ত দেবী ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন! যে সাহিত্যাকাশ হইতে "অক্ষয়", "ঈশ্বরচন্দ্র", "বঙ্কিম" প্রভৃতি মনীষীগণ চলিয়া গিয়াছেন, সেই সাহিত্যা-কাশ হইতে সাহিত্য সেবক "ভক্ত দেবী" চলিয়া গেলেন! মাতা বঙ্গভূমি তাঁহার এক পুত্র রত্ন হারাইলেন! ব্রাহ্ম সমাজের কক্ষ হইতে যে সকল সাহিত্যানুরাগী মহাশয়গণ তাঁহাদের সুলেখনী প্রসূত গ্রন্থ ও সাহিত্য-পত্র দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের সেবার জন্য দাঁড়াইয়া-ছিলেন, ভক্ত দেবী তাঁহাদের মধ্যে একজন। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জলন্ত ও নবীন উৎসাহের সহিত যে সকল গ্রন্থকার ও সুলেখকগণ কার্য্যক্ষেত্রে শোণিত-দান করিয়া গিয়াছেন, দৈবশক্তি পরিচালিত "দেবী"ও তাঁহাদের মধ্যে একজন। হৃদয়ের স্বাধীনতা তেজস্বিতা ও মনস্বিতার অদমনীয় প্রভাবে যে লেখকগণ তাঁহাদের লেখনী সঞ্চলন করিয়া গিয়াছেন, কর্ম্মবীর ও ভক্তবীর "দেবীও" তাঁহাদেরমধ্যে একজন। "নব্য ভারত" নবীন-ভারতে সত্য সত্য এক দিন যুগান্তর উপস্থিত করিয়া ছিলেন। সত্যই এতদিন পরে "নব্যভারত" পিতৃহীন হইলেন! জানিনা আজ কোন্ কর্ণধার আসিয়া বিপর্য্যস্ত তরীর কর্ণ ধারণ করিবেন!

ভক্ত "দেবী প্রসন্ন", জীবনে সাহিত্য সেবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম, অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় ও অতুলনীয় তেজস্বিতা দেখাইয়া গিয়াছেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রেও স্বাধীন প্রাণতা ও স্বাধীন ভাবেরও বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন বিভাগের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, স্বাধীন নিরপেক্ষ মতের পরিচয় দিয়া থাকেন, ভক্ত দেবীপ্রসন্ন তাঁহাদের মধ্যে একজন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা স্বর্গগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" সম্বন্ধে যে সমুদয় অযথা কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, স্বাধীন চেতা "দেবীপ্রসন্ন", তাঁহার স্বাধীন সহযোগী স্বর্গগত ভক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনী-সম্ভূত প্রবন্ধগুলি, ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিকী সত্যপরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকগণের লিখিত প্রবন্ধ নিচয় তাদৃশী ন্যায়পরতা-প্রবৃত্তির পরিচালনায়

স্বীয় পত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ন্যায় ও সত্য যেখানে অবমানিত হইয়াছেন, সেখানে "দেবীপ্রসন্নের" লেখনী নীরব থাকিতে পারে নাই। তাঁহাকে অনেক সময় অনেক কথা লিখিতে হইয়াছে। বিসদৃশ আবরণে সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখা দেবীপ্রসন্নের নিকট এক বিভীষিকা-পূর্ণ পাপরূপে প্রকাশিত হইত। পাপ-বোধ তাঁহার খুব প্রবল ছিল।

অবশ্য আজ ইহা বলিতে আসি নাই যে শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত ইতিহাস সম্বন্ধে ন্যায়ানুমোদিত সমালোচনা প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর ভক্ত "দেবীপ্রসন্ন" শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ করিয়া "নব্যভারতে" হৃদয়ের উচ্ছাস ও সহানুভূতি-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে তাঁহার ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয় হইয়াছিল যে তিনি বর্ত্তমান ব্রাহ্মবিধানকে "নববিধান" বলিয়া ধরিতে পারেন নাই। অবশ্য আমরাও এ সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য, ভক্ত ও সাহিত্য-সেবক "দেবীপ্রসন্নের" নিকট ব্রাহ্ম সমাজ ও বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ঋণী। তাঁহার ইহধাম পরিত্যাগে আমরা সকলেই বিশেষ অভাব ও শোকগ্রস্ত। তাঁহার পবিত্র ও প্রেতআত্মা দেবধামে সেই শান্তিময়ী জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে চিরদিন বাস করিতে থাকুন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

শোকাশ্রু।

(১)

চলিলে দুঃখীর সখা!
স্মৃতি-পটে থাক আঁকা,
শান্ত মূরতি তব করি দরশন
জুড়াব মরম ব্যথা, ওহে মহাত্মন!

(২)

সাহিত্য-সেবার তরে
নিজ দেহপাত ক'রে,
এ "নব্যভারত" করি প্রতিষ্ঠা, পালন,
সাহিত্য-মন্দিরে পেলে তুমি উচ্চাসন।

(৩)

দীন দুঃখী তোমা তরে
অশ্রু বরিষণ করে,
অন্নদানে নিত্য শোভে ভবন তোমার;
রাখুক তোমার কীর্ত্তি তোমার কুমার।

(৪)

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-বলে
সাধনায় সিদ্ধ হ'লে,
জীবনের মহাব্রত হ'ল সমাপন,
পুণ্যবলে যাও চ'লে শান্তি-নিকেতন।

(৫)

যতেক অমরগণ
করে তোমা আবাহন,
কিন্নর কিন্নরী গায় সুযশ' তোমার,
তোমা তরে উদ্ঘাটিত অমরার দ্বার।

(৬)

ধন্য বৈজয়ন্ত ধাম!
শান্তি যথাঅবিরাম,
অমিশ্র আনন্দ-ধারা বহে শতধারে,
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু যথা যেতে নারে।

(৭)

নাহি বৃদ্ধি নাহি ক্ষয়,
সকলি অক্ষয় রয়,
অমর জগতে হয় অমর জীবন,
সমভাবে যথা শোভে লাবণ্য যৌবন।

(৮)

পবিত্র অমরালয়
পুণ্যতেজে জ্যোতির্ম্ময়,
দিব্যগন্ধবহ যথা বহে নিরন্তর,
উছলিত শত শত অমৃত-নির্ঝর।

(৯)

দুর্লভ ত্রিদিব ধাম!
পুণ্য লোক প্রাণারাম!
নিত্যধাম নাহি মিলে কোটি রত্ন দিলে,
নিরমল পুণ্যবলে দিব্যধাম মিলে।

(১০)

এ হেন ত্রিদশালয়ে
স্বর্গীয়া পত্নীরে ল'য়ে,
অনন্ত আনন্দে তুমি করহে বিশ্রাম,
পুণ্য লোকে ধন্য হো'ক তব পুণ্যনাম!

শ্রীরাখালদাস কবিরত্ন।

বন্ধুর স্মৃতি।

যখন মেডিকেল কলেজে পড়িতাম, আড়াই শতের অধিক ছেলের ভিতরে কাহাকে দেখিয়াছি না দেখিয়াছি স্মরণ নাই, তখন তাঁহাকে চিনি নাই। কিন্তু নাম জানিতাম না বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম সমাজের যে দল সাধারণ নামে অভিহিত হইলেন, তাহাদের মধ্যে একদল প্রতিবাদকারী আর সাধারণ সমাজে স্থান গ্রহণ করিলেন না, দেবীবাবু যে তাহাদের অন্যতম তাহা জানিতাম, শ্রদ্ধাস্পদ আনন্দমোহন শিবনাথ প্রভৃতি মহোদয়গণের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব এ দল সহ্য করিতে না পারিয়াই সাধারণ সমাজের বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে গভীর অনুরাগ, সমাজ সংস্কারের প্রবল স্পৃহা স্বাধীন চিন্তার প্রবল তেজ ইহাদিগের মধ্যে লক্ষিত হইত। কিন্তু কাহারও অনুগত হইয়া চলিবার ইহাদের বাসনা ছিল না। যাহা হউক তাঁহার জীবন চরিত আখ্যায়ক এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করিবেন।

আমি ছাত্র জীবনে বীণায় কয়েকটী কবিতা দিয়াছিলাম, বগুড়া আসিয়া কয়েক বৎসর কোন সুবিখ্যাত কাগজে লিখি নাই। প্রথম কবিতা নব্যভারতে "প্রেম"

অমিয়ার ধারা সম এ মর মরত ধামে
তুইলো পিরীতি।

এই কবিতার পরে প্রায় প্রবন্ধই নব্যভারতে তিনি সাদরে গ্রহণ করিবেন, এবং তখন হইতেই এ অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি প্রিয় সুহৃদ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি বোধ হয় ১৮৮২ সালে বগুড়ায় আগমন করেন, তখন হইতেই তাহার সহিত বন্ধুতা ঘনীভূত হয়, তৎপরে ক্রমে জমাট ভাব স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালের এলাহাবাদ কংগ্রেসের পরে কয়েকটী রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। যখন কলিকাতা গিয়াছি, অনেক কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব থাকা সত্ত্বেও, দেবীবাবুর আনন্দাশ্রম যেন আমার একটী শান্তি নিকেতন বলিয়া বোধ হইত। এবং কত মনীষী বর্গের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ হইত। মনে হইত যেমন এডিসন, ষ্টিল, সুইফ্‌ট্ প্রভৃতি এক সাহিত্য-মণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন, দেবীবাবুর গৃহে এইরূপ মণ্ডলী মধ্যে আসিয়া পড়িতাম, এবং ধর্ম্মনীতি রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েই প্রধানতঃ আলাপ হইত। তাহাতে দেখিতাম, দেবীবাবু সম্পূর্ণ স্বাধীন চেতা, কখনও মত সংযম করিতেন না। তাঁহার আদর্শ ম্যাটসিনির মত; স্বদেশ প্রেমিকতাও আত্ম বিসর্জ্জন, পোষাকে, আহার বিহারে, সকল কার্য্যে এমন সংযম দেখিয়াছি,

এ যুগের লোকের পক্ষে তাহা অসম্ভব। কোন দিন কোন জাঁকাল পোষাক পরিচ্ছদ কি বিলাস বাসনা তাঁহার দেখি নাই, সর্ব্বদাই দেশের জন্য প্রাণে একটা বিষাদ তাঁহার প্রতি কার্য্যে দেখিতাম,'যে দেশের নভোদেশে, নিত্য মেঘ সেজে এসে, করে নিত্য বারিবরিষণ'।

সেই দেশের অধিবাসীর উজ্জল সূর্য্যালোকে কি প্রয়োজন? মুখে আমরা বলিতাম বটে, কিন্তু একমাত্র দেবীবাবুকেই কার্য্যে সেরূপ অনুষ্ঠান করিতে দেখিতাম। দুঃখী নরনারীর জন্য তাহার প্রাণ কান্দিত, কত শিশু ছেলে মেয়ে অনাথ অনাথিনীগণ তাঁহার যত্নে প্রতিপালিত হইত। তাহাদের কৃতজ্ঞতার পরিচয় আজিও প্রাপ্ত হই। দেবীবাবুর দীর্ঘ জীবন কর্ম্মময় ও পরসেবায় উৎসর্গীত ছুভিক্ষে, রোগে, বিপদে তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে কত দেশের উপকার করিয়াছেন, কোটালিপাড়ের ছুভিক্ষ, ও ফরিদপুরে অন্যান্য স্থানের অন্নকষ্টের জন্য তাঁহার প্রাণ বিদীর্ণ হইত, ও অকাতরে তিনি লোক সেবার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতেন। এমন সাধু জীবন যে আরও অধিক দিন দেশের সেবা করিয়া প্রাণ সাথক করিতে পারিলেন না; ইহা দেশের দুর্ভাগ্য। এক্ষণে আমরা কয়েকটী বন্ধু তাঁহার শোক বহন করিয়া জীবিত রহিলাম, ভগবানের কৃপায় স্বর্গে সেই আনন্দ আশ্রমে পুনর্ম্মিলিত হইব, এই বাসনা। দয়াময় ঈশ্বর এই পুণ্যময় জীবনকে পরকালে সুখে ও শান্তিতে রাখুন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

সদ্দ্‌ষ্টান্তের স্মারক।

স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন চৌধুরী আমার একজন যৌবনকালের বন্ধু। ঠিক কোন সময়ে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় স্মরণ হইতেছে না। ১৮৭৬ কি ৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভগ্নী ৺বিরজাদেবীকে আমি বালিগঞ্জে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইবার জন্য লইয়া যাই। সেই সময়ে আমি ঐ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ছিলাম। কিছু দিন পরে Indian Association বা 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং আমরা উভয়ে ৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে সেই Indian Associationএর বাড়িতে বাস করি। তখন দেবীবাবু তাঁহার "শরচ্চন্দ্র" এবং "বিরাজমোহন" প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি সেই সময়ে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যস্থল চট্টগ্রামে যাই। তখন রেল ছিল না, জাহাজে চট্টগ্রামে যাইতে হইত। আবার জেটীও ছিল না, ডিঙ্গীতে করিয়া গিয়া জাহাজে উঠিতে হইত। জাহাজে উঠিবার সময়ে ঘটনাক্রমে আমার স্ত্রীর শাড়ীতে অনেক কাদা লাগে। দেবীবাবু অনেক যত্নের সহিত সেই শাড়ীর কাদা ধুইয়া আমাদিগকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে পর আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ১৮৭৮ সনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম হয়। বৎসর চারি পরে আমি আমার কর্ম্মস্থল কলিকাতা ফিরিয়া আসি। তখন দেবীবাবু ও দ্বারিকবাবু প্রভৃতির সঙ্গে কিছু দিনের জন্য এক বাড়িতে বাস করি সেই সময়ে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্ম হয়। সেই সময়ে দেবীবাবুর পত্নী এবং ভগ্নী আমাদিগের

যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এ জীবনে ভুলিব না। অনেক বিষয়ে দেবীবাবু গুরুর ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই সময় এই "আনন্দ আশ্রম" নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তখন কত যে পরিশ্রম করিতেন বলিতে পারি না। তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যহ নিজেদের বাজার করিতেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমিও নিজ হাতে নিজেদের বাজার করিতে আরম্ভ করি। ব্রাহ্ম সমাজ মুখে হিন্দু মুসলমানকে সমান বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু একমাত্র দেবীবাবুকেই দেখিয়াছি কার্য্যতঃ তাঁহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সামসুদ্দীন বলিয়া একটি মুসলমান বালককে ঘরের ছেলের মতন তিনি পালন করিতেন। চাকরদের প্রতি সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তাঁহার কাছে যেরূপ দেখিয়াছি, এমন আর কোথাও দেখি নাই। 'কুঞ্জকে' প্রথম হইতেই নব্যভারতের কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। কুঞ্জের প্রতি তিনি একেবারে নিজের রক্ত মাংসের সম্পর্কিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং পুত্রকে তাহার পায়ের ধুলা নিয়া প্রণাম করিতে শিখাইয়াছেন। এরূপ উদার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখি নাই।

কত অসহায় বালবিধবা তাঁর আশ্রয়ে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে, এ সকল সৎকর্ম্মের দৃষ্টান্ত আর যে কোথায় দেখিতে পাইব, জানি না। ভগবান তাঁর স্বর্গীয় আত্মাকে তাঁর সদ্দৃষ্টান্তের ফল প্রদান করুন। এবং আমাদিগের মধ্যে তাঁহার সেই স্বর্গীয় প্রভা বিস্তার করুন।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

স্মৃতি-পত্র।

জন্ম—১২৬০ সাল, ২৩শে পৌষ।
মৃত্যু—১৩২৭ সাল, ১৮ই আশ্বিন।

বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে যাহাঁরা প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী অন্যতম। পিতার নাম ৺রামচন্দ্র রায়চৌধুরী জন্মস্থান—মাতুলালয়—বরিশাল জেলার অন্তর্গত কাশীপুর নামক গ্রাম। জন্ম—১২৬০ সাল ২৩শে পৌষ বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা তিথি। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান উলপুর গ্রাম। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারিপুর মহকুমার অধীন গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত এই উলপুর অবস্থিত। তথাকার বসুবংশ সম্ভ্রান্ত। ইঁহারা বঙ্গজকায়স্থ এবং মস্ত কুলীন। বংশ পরম্পরাক্রমে ইঁহাদের জমিদারী আছে। এই জন্য ইঁহারা মুসলমান রাজত্বকাল হইতে "রায়চৌধুরী" উপাধিতে ভূষিত।

বাল্যে, স্বগ্রামে—উলপুরের পাঠশালায়, তৎপরে চারিমাসকাল কলিকাতা চেতলায় মতি মাষ্টারের স্কুলে, তাহার পর ভবানীপুর নন্দন ব্রাদার্স একাডেমিতে, তদনন্তর কালীঘাট ইউনিয়ন্ একাডেমিতে এবং পরিশেষে লণ্ডন মিশনারী কলেজে ইংরাজী ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে নিযুক্ত হন এবং চারিবৎসর কাল ডাক্তারী পড়েন। শেষে মস্তিষ্কের পীড়ার জন্য কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বন প্রিয় ছিলেন। পরাধীনতায় চিরদিনই তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। যে কোন উপায়ে হউক চিরদিন "স্বাধীনভাবে কাল কাটাইব"—ইহাই তাঁহার জীবনের

মূলমন্ত্র ছিল। এই মূলমন্ত্র সাধনের জন্য তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। এই দুর্দ্দমনীয় স্বাধীন প্রবৃত্তির জন্য বাল্যেই তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের স্নেহপাশ ছিন্ন করিতে হইয়াছিল। দেশ সেবায় বাল্য-কাল হইতেই তাঁহার আসক্তি। বাল্যে স্বগ্রামের লোকহিতকর অনেক কার্য্যই করিতেন। বাল্যে যাহা হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল কালে তাহা বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলে-ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল।

বঙ্গের সুসন্তান দেবীপ্রসন্ন ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও চরিত্রগুণে অনেক হিন্দুরও আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী কষ্টসহিষ্ণু, স্বাবলম্বনপ্রিয়, স্বাধীনচেতা ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। অতি বড় শত্রু হইলেও সত্যের অনুরোধে, তিনি তাঁহার গুণ চাপিয়া রাখিতেন না; পক্ষান্তরে পরম মিত্র হইলেও তিনি তাঁহার দোষ ঢাকিতে কিম্বা তাঁহার সেই দূষনীয় কার্য্যের পোষকতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সত্য প্রিয়তার জন্য এবং চিত্তের এইরূপ দৃঢ়তার অনুরোধে, তিনি প্রথমে অনেকেরই বিরাগভাজন হন, কিন্তু কালে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় তাহার যশঃ কিরণ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। স্পষ্টবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তার জন্য তিনি অনেক বড় বড় বন্ধু হারাইয়াছেন; তথাপি ব্রতচ্যুত কিম্বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। সমান তেজে, সমান জেদে, সমান দৃঢ়তায় তিনি সত্য প্রকটনে রত ছিলেন। ব্রাহ্ম সাধারণের অনেক মলিনতা, অনেক দুর্ব্বলতা তিনি আপন স্বভাব-সুলভ আন্তরিকতাপূর্ণ তেজস্বী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া লোক-লোচনের সমীপবর্ত্তী করিয়াছেন। তাঁহার সেই লিপি-পটুতার গুণে অনেকের স্বভাব সংশোধন এবং সমাজেরও অনেক সংস্কার সাধিত হইয়াছে। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন সহস্র বিঘ্ন বাধায়ও তাহা করিতেন। তিনি নির্ভীক উচিত বক্তা লেখক ও সম্পাদক বলিয়া সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানেই তাঁহার সহানুভূতি ছিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ফরিদপুর অঞ্চলের দুভিক্ষ ক্লিষ্ট নরনারীর জীবন রক্ষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে যথার্থই সাধুবাদ দিতে হয়। তিনি দরিদ্র ছাত্রগণকে অন্নদান, বেতন এবং পুস্তকাদি সাহায্যও মধ্যে মধ্যে করিতেন। আর্থিক অবস্থায় ও সামাজিক সম্ভ্রমে দেবীপ্রসন্ন ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান উদ্যমশীল পুরুষ-সিংহ অতি বিরল!

বঙ্গসাহিত্যে তিনি সুপরিচিত। তাঁহার সাহিত্য জীবনের ইতিহাস অপূর্ব্ব। সংসারের শত সহস্র বিঘ্ন বাধার সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া, বহু অভাব অনাটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াও, তিনি বিশেষ ধীরতার সহিত জীবনের দীর্ঘকাল সাহিত্যব্রত পালন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি পবিত্র চক্ষে দৃষ্টি করিতেন। সাহিত্য-সেবী সুধীগণ প্রায় সকলেই তাঁহার সুহৃৎ ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "নব্যভারত" পত্রিকা খানি আজ অষ্টাত্রিংশ বৎসর কাল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা একখানি উচ্চ অঙ্গের প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র ও সমালোচন। সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্ব ধর্ম্মী লোকের রচনা ইহাতে প্রকাশিত হয়। মত বিরুদ্ধ বলিয়া, ভাল রচনা, সম্পাদক বাতিল করিতেন না। বঙ্গের বহু সুপ্রসিদ্ধ লেখকই ইহাতে লিখিয়া থাকেন। দেবীপ্রসন্ন

নির্ভীক ছিলেন; প্রেস আইনের কঠোরতার বিরুদ্ধে তিনি প্রায়ই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। তাঁহার একটি ছাপাখানা ছিল, সেই প্রেসে "নব্যভারত" মুদ্রিত হইত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সেই প্রেসের নিকট গবর্ণমেণ্ট আমানত চাহিলে তিনি প্রেস বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি টাকা জমা দিয়া প্রেস চালান নাই। দেবীপ্রসন্ন রিক্ত হস্তে কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্য-সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শিশির-কুমার ঘোষও তাহাই। উভয়েই সাহিত্য সেবায় অর্থলাভ করিয়া গিয়াছেন। শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন, সন্ন্যাসী, ভিখারী, যোগজীবন, মুরলা, অপরাজিতা, নবলীলা, পুণ্যপ্রভা, সোপান, বিবেকবাণী, প্রসাদ, সান্ত্বনা, বিবাহ-সংস্কার, দ্যুতি, দীপ্তি, জ্যোতিকণা, উৎকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রসূন, প্রণব, এই বিশখানি উপন্যাস ও প্রবন্ধ পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলির সহিত এখনকার পাঠক-দিগের কিরূপ পরিচয় আছে জানি না। বস্তুতঃ দেবীপ্রসন্ন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন এবং যথাশক্তি সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় উদ্যম ও অধ্যবসায়-শীল স্বাবলম্বন-প্রিয় ব্যক্তির প্রতি স্বভাবতঃই কমলা কৃপা করিয়া থাকেন। তিনি দীর্ঘকাল অতি যোগ্যতার সহিত "নব্যভারত" সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি, তদীয় উপযুক্ত পুত্র, পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানি পরিচালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

দেবীবাবুর সম্বন্ধে অন্য অনেক কথাই প্রবন্ধের বাহুল্যতার জন্য লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সম্বরণে বাধ্য হইলাম।

"নব্যভারত" সম্পাদক প্রবীণ লেখক বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় ৬৭ বৎসর বয়সে বিগত ১৮ই আশ্বিন সোমবার বৈদ্যনাথধামে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরমধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার নিরাড়ম্বর আত্মা অনন্তধামে পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া অক্ষয় শান্তি লাভ করুক।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু

দেহ-রক্ষান্তে।

"আমার আর কোন সাধ নাই। কেবল কঠোর পরোপকারব্রত, কেবল আত্ম-সংযম, কেবল বিলাসিতা বিসর্জন আমার জীবনের লক্ষ্য।"—মুরলা।

"চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, আমি কখনও গোলামী করিব না,......আমি ভয়ে বা ভালবাসার খাতিরে কাহারও মতের গোলামী করিতে পারিব না।"—মুরলা

মানুষ যতদিন দেহে অবস্থান করিয়া আমাদের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকেন, যতদিন সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তাঁহার সহিত একত্র চলাফেরা করিবার সুযোগ ও সুবিধা আমরা পাইয়া থাকি, যতদিন আর দশ জনের মত তিনিও আমাদেরই একজন হইয়া আমাদেরই মধ্যে বিদ্যমান থাকেন, ততদিন তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ছোট খাট কার্য্যগুলিকেও আমরা খুঁটিনাটি করিয়া না দেখিয়া ছাড়ি না। তারপর আবার সে মানুষ যদি ভগবৎ কৃপায় এবং আত্মশক্তির সাহায্যে সংসারে দশ জনের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হয়েন, তাঁহার যশঃ সৌরভ যদি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করে, তিনি যদি ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিয়া

বহুসংখ্যক লোকের পূজা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রতিনিয়ত সম্ভোগ করিতে থাকেন, অথবা তাঁহার উন্নতচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া যদি কেহ কেহ তাঁহাকে আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যকলাপের দিকে জনসাধারণের সমালোচনোন্মুখ দৃষ্টি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তারপর, যখন হঠাৎ একদিন কালের করাল বিষাণ বাজিয়া উঠে, অকস্মাৎ মৃত্যুর আবির্ভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে যখন একটা যুগান্তর উপস্থিত হয়, অতি সুলভ বলিয়া যে জিনিষকে আমরা তেমন আদর করিতে পারি নাই, সেই জিনিষকেই যখন চিরদুর্ল্লভ করিয়া দিয়া আমাদের মনে অনুতাপের তীব্র অনল প্রজ্জলিত করিয়া দিয়া যায়, তখন আমরা আর তাঁহার দোষ ত্রুটী দেখিতে পাই না। সেই জন্যই জীবিতাবস্থায় যে সমস্ত সামান্য দোষত্রুটী গুলিকে আমরা অনুপেক্ষনীয় মনে করিয়া তীব্র সমালোচনা করি, মৃত্যুর পর সেইগুলিকে আর বিশেষ দোষ বলিয়াই আমাদের মনে হয় না। তখন শুধু তাঁহার অশেষ গুণাবলীই প্রতিনিয়ত আমাদের হৃদয়-ফলকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। তাই মানুষ স্বতঃই মৃতব্যক্তির দোষত্রুটীর কথা বিস্মৃত হইয়া শুধু তাঁহার গুণগ্রামই ঘোষণা করিয়া থাকে।

অক্লান্ত কর্ম্মী, স্বদেশপ্রেমিক, সাহিত্যসেবী ফরিদপুর সুহৃদসভা'র প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, এবং 'নব্যভারতে'র প্রবীণ সম্পাদক স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাম ফরিদপুর নিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেরই নিকট অল্লাধিক পরিমাণে পরিচিত। আমরা যখন ছাত্রবৃত্তি স্কুলের ৪র্থ কিম্বা ৫ম শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন হইতেই উলপুরের দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাম আমাদের সুপরিচিত ছিল। একদিকে যেমন স্বর্গীয় মহাত্মা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম যেন জন্মাবধিই শুনিয়া আসিতেছি, অপর দিকে তেমনি ফরিদপুরের দরদী ফরিদপুরের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, 'সুহৃদসভা'র জীবনস্বরূপ স্বর্গীয় দেবীবাবুর নাম ও আশৈশবই আমরা ফরিদপুরের লোকেরা শুনিয়া আসিতেছি। তখন দেবীবাবুকে আমরা খ্রীষ্টান বলিয়াই জানিতাম। সে যুগে ব্রাহ্মমাত্রই খ্রীষ্টান বলিয়া অভিহিত হইত। আমাদের বাল্যসংস্কার বশতঃ তাঁহাকে ঠিক আমাদেরই একজন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না; অথচ সুদূর পল্লীতে থাকিয়াও সকলের নিকট যাহা শুনিতাম তাহাতে তাঁহাকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমদয়ালু দেবতুল্য লোক ভাবিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া পারিতাম না। একদিকে যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবা-বিবাহের সমর্থনকারী বলিয়া সমালোচিত হইতে শুনিতাম, অপর দিকে তাঁহার অপার দয়ার ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা যখন শুনিতাম, তখন তিনি কোন দেশের লোক, সেই প্রশ্ন আমাদের মনেই উঠিত না। তিনি এতবড়, এত মহান্ যে তাঁহাকে আমরা সর্ব্বসাধারণের আপনার বলিয়া অসঙ্কোচে ও বিনাবিচারে স্বতঃই মানিয়া লইতাম। আর যখন দেবীবাবুর দয়ার কথা, ফরিদপুরের জন্য অকাতরে পরিশ্রমের কথা, ফরিদপুরের উন্নতির জন্য 'সুহৃদ-সভা' স্থাপন ও 'অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিভাগ' পরিচালনের কথা শুনিতাম, তখন, তিনি যে খ্রীষ্টান এই কথা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাকে শুধু ফরিদপুরেরই একমাত্র নিজস্ব-

জন বলিয়া মনে মনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতাম; সত্য বলিতে কি, গর্ব্ব অনুভব করিতাম। আর মনে মনে ভাবিতাম, কি গুণে তিনি এত বড় হইলেন। সমস্ত ছাত্র-জীবন ব্যাপিয়াই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফল হইতে পারি নাই। তারপর যখন সৌভাগ্যবশতঃ ক্রমে তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম যখন তাঁহার আপন আলয় 'আনন্দ-আশ্রমে' অল্পাধিক পরিচিত বা অপরিচিত নর-নারীর অব্যাহত গতি ও অবস্থিতি অবলোকন করিলাম, সর্ব্বোপরি, যখন তাঁহার কর্ম্ম-পটুতা, সহৃদয়তা ও আশ্রিত-বৎসলতা নিরীক্ষণ করিলাম, তখন হইতে বুঝিতে আরম্ভ করিলাম, তিনি কেমন করিয়া এত বড় হইলেন, তিনি কি গুণে এত লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিলেন, তিনি কিসের প্রভাবে ফরিদপুর-বাসীর হৃদয়-রাজ্য জয় করিলেন।

এস্থলে 'আনন্দ আশ্রমে'র বিশেষত্বের কথা একটু বলা প্রয়োজন। দেবীবাবু 'আনন্দ আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তাঁহার সুযোগ্যা সাধ্বী পত্নী। 'আনন্দ আশ্রমে' আসিয়া কেহ কখনও অভুক্ত চলিয়া গিয়াছেন, এমন কথা কেহ কখন শুনেন নাই। ইদানীং 'আনন্দ আশ্রমের' স্বচ্ছলতার কথা বন্ধু-বান্ধব অনেকেই বিদিত আছেন। কিন্তু, এমন একদিন ছিল, যখন 'আনন্দ-আশ্রমের' প্রতিষ্ঠাতাকে অতি কষ্টে সংসার চালাইতে হইত। সেই দুর্দ্দিনেও 'আনন্দ আশ্রমে' কত লোকে যে অন্ন এবং আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, তখন 'আনন্দ আশ্রমের' স্থানের বড়ই অভাব ছিল; অথচ যাহারা সেখানে প্রতিপালিত হইতেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী; তাই কক্ষ-মধ্যে মাচা তৈয়ারী করিয়া কেহ কেহ উপরে এবং কেহ কেহবা নীচে শয়ন করিতেন। তথাপিও কেহ আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া প্রত্যাখ্যাত হন নাই। এরূপ অদ্ভুত কথা কেহ আর কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

'আনন্দ-আশ্রমের' দ্বিতীয় বিশেষত্ব, পরিচিত বা অপরিচিত, ছোট কিম্বা বড়, ইহার ইতর বিশেষ কেহ কখনও লক্ষ্য করেন নাই। কলিকাতায় এবং অপর স্থানেও প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণ দীন দুঃখীর আহারের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সব স্থলেই কর্ম্মচারীগণ তাহার পর্য্যবেক্ষণ করেন। 'আনন্দ-আশ্রমের' বিশেষত্ব এই যে, গৃহস্বামী স্বয়ং পুত্র-কন্যা-পুত্র-বধূ ইত্যাদির সমভিব্যাহারে উচ্চনীচভেদে সকলকেই আপনার জনের মত একত্র লইয়া একসঙ্গে আহার করিতেন। এবিষয়ে প্রভু-ভৃত্য, পরিচিত অপরিচিত, উচ্চনীচ, প্রভৃতি কোনও ভেদাভেদ কখনই পরিলক্ষিত হয় নাই। এইরূপ উদার-প্রাণতা ও মহানুভবতা বক্তৃতায় শ্রুতিগোচর হইলেও, চর্ম্ম-চক্ষে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। মানুষকে কত বড় করিয়া দেখিলে, এইরূপ আপনার মনে করা যায়, তাহা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়।

'আনন্দ-আশ্রমে' আশ্রয় পাইয়া কত নর-নারী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী যে আজ সংসারক্ষেত্রে গণ্যমান্য ও বরেণ্য হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড়লোক বলিলে, সচরাচর যাহা বুঝায়, দেবী বাবু কোন কালেই তাহা ছিলেন না। তিনি যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন, তা নয়;

তদপেক্ষা উন্নত অবস্থাপন্ন হাজার হাজার লোক কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিতেছেন। কিন্তু দেবীবাবুর 'আনন্দ-আশ্রমের' দ্বার যেমন কাঙ্গাল-গরীবের পরিচিত অপরিচিতের জন্য নিয়ত উন্মুক্ত ছিল, এমন আর কোথাও দেখি নাই। ধনীজনোচিত বাহিরের জাঁকজমক তাঁহার ছিল না। তথাপিও, তিনি বড় লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যে অসাধারণ পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাহাও নয়; অথচ দেখিয়াছি, কত মহামহোপাধ্যায় তাঁহাকে নতশিরে সম্মান না করিয়া পারিতেন না। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে চরিত্র বলে, ধর্ম্ম বলে, নীতি বলে, তিনি এতই উন্নত, বলীয়ান, ও মহৎ এবং উদার প্রাণ ছিলেন যে, মহামহা সাহিত্যরথী, মহামহা ধনকুবের ও মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী তাঁহার সমীপে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে সাহস পাইতেন না। চরিত্ররূপ দুর্ভেদ্য কবচে যিনি সতত সুরক্ষিত, নীতি ও ধর্ম্ম-রূপ শাণিত অস্ত্রশস্ত্রে যিনি সুসজ্জিত, মতের দৃঢ়তায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার সমক্ষে বিদ্বানের বিদ্যার বড়াই বা ধনকুবেরের ধন-গর্ব্ব কতক্ষণ স্থান পাইতে পারে? তাই, যাঁহারা তাঁহার বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা একবাক্যে সাক্ষ্য দিবেন যে তাঁহার নিকট যাঁহারা আসিতেন এবং তাঁহার সহিত বিশেষরূপে মিশিতেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাহার মত সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব যেন লোপ পাইয়া যাইত; তাঁহারা দেবীবাবুর কোনও মতের আর প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। এই অসাধারণ শক্তিটি তাঁহার মধ্যে এতই উৎকর্ষতা-লাভ করিয়াছিল যে, সময় সময় ইহাতে তাঁহার বিস্তর অনিষ্ট ও ক্ষতি হইয়াছে।

কিন্তু, যাহা বলিতেছিলাম। তিনি কেমন করিয়া ফরিদপুর-বাসীর হৃদয়ের উপর এমন অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিলেন; পাঠক-পাঠিকাগণ হয়ত বা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে ফরিদপুরের উজ্জ্বলরত্ন, লোকমান্য স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের নাম অপেক্ষাও ফরিদপুর-বাসীর অধিকাংশের নিকট দেবী বাবুর নাম অধিকতর সুপরিচিত ও সমাদৃত। বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান লোককে বড় করিয়া তুলে, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু চরিত্র ও সহৃদয়তা মানুষকে দেবত্ব প্রদান করে। জ্ঞানে মানুষ পাণ্ডিত্যের সম্মান লাভ করেন, আর প্রেমে মানুষ দেবতার মত পূজাই পাইয়া থাকে। প্রেমেই যীশুর যীশুত্ব, প্রেমেই চৈতন্যদেবের চৈতনত্ব, আর প্রেমেই বিবেকানন্দের বিশেষত্ব। জগতে প্রাণ ঢালিয়া যাহারা নরনারীর সেবা করিতে পারিয়াছেন, নিজের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল অসঙ্কোচে অম্লানবদনে যাহারা ক্ষুৎপিপাসাতুরের মুখে তুলিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বড় হইয়া গিয়াছেন। মস্তিষ্কের শক্তিবলে প্রশংসা, অর্থ, সম্মান ও বাহবা সমস্তই লাভ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয় জয় করা যাইতে পারে না; একমাত্র হৃদয়ের শক্তিই হৃদয়কে জয় করিতে পারে, আর কোন শক্তিই তাহা পারে না। দেবী বাবুর হৃদয় ছিল; তাই তিনি ফরিদপুর-বাসীর হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন। ফরিদপুর-বাসীর এবং ব্রাহ্ম-সাধারণের সেবা করিতে তিনি কোনও দিনই কুণ্ঠিত হন নাই। এই পরোপকার ব্রত সত্যসত্যই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। পরের উপকার করিতে পারিলে, তিনি নিজের জীবনকে ধন্য মনে করিতেন।

কোটালীপাড়ার দুর্ভিক্ষের সময় যখন তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর সেবার জন্য তথায় গমন করেন, তখনকার তাঁহার সহকর্ম্মী আমাদের একজন বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, যে সবদিন তাঁহাদের আহারের সময় হইয়া উঠিত না; দুই তিন দিন পর পর রান্না করিবার সময় মিলিত, এরূপ ভাবে,একাদিক্রমে পাঁচছয় মাস জলে কাদায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কাটান যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা একবার কল্পনা চক্ষে অনুমেয়। এই সময়ে একদিন চাল বিতরণ সময়ে তিনি একাদিক্রমে প্রায় দুইদিন একরাত্রি একাসনে কাটাইয়া দেন; একবারও আসন-ত্যাগ করিয়া উঠেন নাই। দৈহিক শক্তি কখনও এরূপ দুরূহকার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। একমাত্র হৃদয়ের শক্তিতেই এইরূপ অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হয়। ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন, তাঁহার পরসেবা-ব্রত কতদূর কঠোর ছিল। সত্যসত্যই, তিনি কঠোর পরোপকার-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

আত্ম-সংযমে যে তিনি বিশেষ অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সুস্থ, সবল ও কর্ম্ম-কুশল শক্তি-সম্পন্ন দেহই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কলিকাতার মত জনপূর্ণ সহরে সুদীর্ঘ-কাল বাস করিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও কোনও দিন তাহাকে স্বাস্থ্যের জন্য সান্ধ্য বা প্রাতভ্রমণ করিতে কেহ দেখেন নাই। শৈশবে তিনি কোনরূপ ব্যায়ামাদি করিতেন কি না জানি না; কিন্তু তাঁহার সুগঠিত দেহ, অতুলনীয় কার্য্যপটুতা ও সাধারণের অবিশ্বাসযোগ্য শীতাতপ সহিষ্ণুতা, তাঁহার আত্মসংযমের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিকগণের অনুমোদিত স্নান, আহার, ব্যায়াম, ভ্রমণ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী তাঁহার জীবনে কখনও প্রতি-পালিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সকলেই জানেন, তিনি কোনও দিনই দিবাভাগে ১২টা বা ১টার পূর্ব্বে প্রায় কখনও স্নানাহারের জন্য উঠিতেন না; অনেক সময়, গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, এবং 'নব্যভারত' বাহির করি-বার জন্য তাঁহার তিনটা চারটার সময়ও আহার করিতে দেখিয়াছি; অথচ এ সমস্ত অনিয়মের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও কখনও তিনি কোনও অসুস্থতা অনুভব করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। আত্মসংযমের দরুণ তিনি যে সুদৃঢ় লৌহ-সদৃশ দেহ লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র সেই সুস্থ দেহের বলেই, তিনি দিনরাত এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারিতেন। এইরূপ অসাধারণ বীর্য্য-বান ছিলেন বলিয়াই, তিনি একটা অপরাজেয় শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই শক্তি বলেই তিনি আশৈশব অকুতোভয়ে বীর-পুরুষের মত সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন, বিপদ আপদ, তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারিয়া ছিলেন। নিজে এইরূপ সংযমী ছিলেন বলিয়াই, কাহারও একটুকু অসংযমের ভাব দেখিলে, তাহা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। অনেক সময়ে তাঁহাকে অনেক গণ্যমান্য ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেও সংযমের অভাব এই দোষারোপ করিতে শোনা গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সুস্থ দেহের প্রমাণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। যাহারা তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই, তাহা-দের বিশ্বাসের জন্য একটি ঘটনা বলিতেছি। পৌষ মাঘ মাসের দারুণ কন্‌কনে শীতে কার্য্যব্যপদেশে আপাদ মস্তক গরম শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে আমরা

যখন রাত্রি আট কি নয় ঘটীকার সময় 'আনন্দ আশ্রমে' গিয়াছি, তখনও কতদিন দেখিয়াছি তিনি অনাবৃত দেহে দ্বিতলস্থ শয়ন-কক্ষ হইতে নীচে আসিলেন, চৌবাচ্চা হইতে বালতী পূর্ণ করিয়া জল লইয়া বাহিরের ফুল গাছের গোড়ায় সেচন করিলেন, শৌচাগার প্রভৃতিতে বাল্‌তী করিয়া জল ঢালিয়া দিলেন, তারপর ঈষদুষ্ণ গরম জলের দ্বারা সমস্ত গা ধুইয়া ফেলিলেন এবং কোনও দিন কাপড়ের আঁচল গায়ে দিয়া কোনও দিন, বা অনাবৃত দেহেই, আহার করিতে বসিলেন এবং আহারান্তে আবার সেই অনাবৃত দেহেই শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শরীরের ভিতর কতটা তেজ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা সম্ভব হয়, তাহা সকলেই একবার অনুধাবণ করিবেন। কঠোর সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী আত্ম-সংযম ব্যতীত ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, এবিষয়ে বোধহয় কাহারও মত দ্বৈধ হইবে না। সুতরাং তিনি কঠোর আত্মসংযম ব্রতও সুষ্ঠুরূপে উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তালতলার চটী যেমন সর্ব্বজন সুবিদিত, দেবীবাবুর কাল বাদামী জুতা ও কোটও তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের তেমনি সুপরিচিত। বেশ-ভূষায় তিনি কখনও অপরিচ্ছন্ন ছিলেন না। তাঁহার 'নব্যভারত' কার্য্যালয়ের ফরাসের উপর একটুকু ধূলা বা এক টুকরা চুলও কেহ কখনও পতিত দেখেন নাই। অথচ তিনি কোনও দিনই বিলাসতা ভাল বাসিতেন না। সত্য বলিতে গেলে তিনি আজীবন বিলাসিতার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। কাহাকেও কখনও অনাবশ্যক-রূপে বেশী জামা, জুতা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দেখিলেই, মনে মনে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইতেন এবং সুযোগ পাইলেই তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ছাড়িতেন না।

ব্রাহ্মসমাজে বিলাসিতা বাড়িতেছে এই কথা বলিয়া যে তিনি কতদিনই আক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন এবং সেই মিতব্যয়িতার গুণেই তিনি অতি অল্প ব্যয়ে সমস্ত খরচাদি নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। কোন কার্য্যেই তিনি অতিরিক্ত খরচের পক্ষপাতী ছিলেন না। যে কার্য্য অল্প খরচে হয়, সেই সেই কার্য্যে অধিক খরচ করিলে মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইতেন। বন্ধু-বান্ধবের গৃহে বিবাহ প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে যাহাতে অন্যায় খরচ না হয়, সেজন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। আপন ভৃত্যদিগকে পাঠাইয়া, গাড়ী দিয়া সাহায্য করিয়া যাহাতে তাঁহাদের কিছু অল্প ব্যয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেন।

আজীবন বিলাসিতা-বর্জ্জন অভ্যাস করিয়া সত্য সত্যই তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধ-কাম হইয়াছিলেন। তার-যোগে এই নিদারুণ সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্রবধূ ও একমাত্র কন্যাকে লইয়া যখন দেবগৃহে পৌছিলাম ও উষার অস্পষ্ট আলোকে প্রভাতকুটীরের কঠিন প্রস্তর-শয্যায় শায়িত, অনাবৃত দেহ, উপাধান পরিশূন্য মস্তক ও বিক্ষিপ্ত পাদুকা বিশিষ্ট অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তাঁহার বিলাসিতা বর্জ্জনরূপ কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনের কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইল। তার পর যখন অত্যল্প সংখ্যক বন্ধু কয়েকজন মাত্র সেই শবদেহ লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং দেবগৃহের সেই অপূর্ব্ব শ্মশানে অপর্য্যাপ্ত কাষ্ঠাদির দ্বারা সেই জড় দেহের অন্তিমকার্য্য শেষ করিলাম, তখন তাঁহার বিলাসিতা-বর্জ্জন-সাধনায় সিদ্ধি লাভের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

সংসারে অনেক সময় দেখিতে পাই, লোকে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিবার অভিলাষে চাকুরী ইত্যাদি না করিয়া স্বাধীন ব্যবসা ইত্যাদি করিয়া থাকেন। চাকুরী করা ত তিনি কোন দিনই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি, জীবনে একবার অল্প কিছু সময়ের জন্য তিনি গৃহ-শিক্ষকতার কাজ করিয়া ছিলেন। তিনি এইরূপ স্বাধীনচেতা ছিলেন যে কিছুতেই স্বীয় মতকে পরিবর্ত্তন

করিতেন না। "আমি ভয়ে বা ভালবাসার খাতিরে কাহারও মতের গোলামী করিতে পারিব না—" তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এই কথার জলন্ত সাক্ষী-রূপে বর্ত্তমান। অপরে শত শত অকাট্যযুক্তি প্রদর্শন করিলেও, তিনি কখনও নিজের মত পরিবর্ত্তন করিতেন না। স্বীয় মতের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, এজন্য তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ অনেক সময় তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইতেন। এ কথা আমাদের অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই মতের দৃঢ়তার জন্যই, অথবা আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসের বলেই, আজ তিনি এত বড় হইয়াছেন; নচেৎ ধনে, মানে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, তাহা অপেক্ষা বহুতর গুণে অধিকতর শক্তিশালী অনেক লোক কেন তাঁহার কথা নতশিরে পালন করিবেন, এবং কেনইবা তাঁহার মতের প্রতিবাদ না করিয়া অম্লান বদনে, তাহা গ্রহণ করিবেন? এই আত্ম-মতে ও বিশ্বাসে তাঁহার ঈদৃশী দৃঢ়তা ছিল যে সময় সময় ইহা তাঁহার অহমিকার সূচনা করিত বলিয়াও অনেকে মনে করিতেন। আজ আমরা বলিব, তিনি আত্ম-শক্তিকে, আত্ম-বিশ্বাসকে, আত্ম-মতকে এতটা শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন বলিয়াই এত লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। আমরা আপন আপন মতকে শ্রদ্ধা করিতে পারি না বলিয়াই লোকের শ্রদ্ধা ও লাভ করিতে পারি না।

তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিতাম,— "বন্ধুবান্ধব যাঁহারা দয়া করিয়া ভালবাসেন, অনেক সময় তাঁহারা অনেক দূর হইতে দেখা করিতে আসেন; উপরের ঘরে থাকিলে পাছে তাঁহারা দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া যান, এইজন্যই আমি সমস্তদিন নীচের ঘরেই থাকি।" মানুষকে কতদূর সম্মানের চক্ষে দেখিলে মনের এইরূপ ভাব হইতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

দেবীবাবুর একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে নিত্য নিত্য নূতন নূতন নাম তৈয়ারী করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কত বন্ধুবান্ধবের ছেলেমেয়েকে যে তিনি নূতন নূতন নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মৃতের-স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন। গৃহপ্রাঙ্গনে প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত স্মৃতিলিপি বক্ষে ধারণ করিয়া অনেক গুলি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিনিয়তই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্‌ব্যতীত অনুষ্ঠানাদিতে, প্রবন্ধাদিতে সুযোগ পাইলেই তিনি মৃত আত্মীয় ও সুহৃদগণের গুণ কীর্ত্তন করিতেন। কেহ মৃতের প্রতি সম্মান যথোচিত দেখাইতে পরাঙ্মুখ হইলে বড়ই দুঃখিত হইতেন।

দেবীবাবুর অপূর্ব্ব বন্ধু বাৎসল্য, অসাধারণ তেজস্বিতা, অদম্য অক্লান্ত ও জীবন-ব্যাপী সাহিত্য-সেবা এবং স্বদেশ-সেবার কথা আরও অনেকে লিখিয়াছেন। সুতরাং সে সমস্ত বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে আর চাই না। তবে দেবীবাবুর বিশেষত্বের কথা আর একবার সর্ব্বসাধারণের নিকট উল্লেখ করিয়া আজ বিদায় লইতেছি—চরিত্রবল, আত্মসংযম, পরোপকার, বিলাসিতা বর্জ্জন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, স্বীয় মতে দৃঢ়তা, চিন্তায় ও মতের স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির উন্নতির চেষ্টা ও দেশের সেবা তাঁহার বিশেষত্ব।

আমাদের চাই কি?—"লোহার মত বজ্র-কঠোর দেহ যে দেহ দুইপাঁচ দিন অনাহারে ক্ষীণ শক্তি হইবে না। যে দেহ দশদিন বৃষ্টিতে ভিজিলে কিম্বা প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘুরিলে অসুস্থ হইবে না, যে দেহ দশদিন রাত্রি জাগিলে ক্লান্ত হইবে না, এমন সুস্থ সবল দেহ; আর চাই, প্রেমে ঢলঢল, পর দুঃখে বিহ্বল, দেশের এবং দশের সুখে চির সুখী একখানা হৃদয়।"

এইকথাগুলি দেবী বাবুর জীবনে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দেখিয়াছি।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

সে আজ ৩৮ বৎসরের কথা। এই সময়ে আমরা শিবনারায়ণ দাসের লেনের মেসে থাকিয়া এল-এ পড়ি। আমাদের মেসে সকল রকমের ছাত্রই ছিলেন। কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগী হইয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন, কেহ কেহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গে মেলা মেশা করিয়া জাতীয়-জীবন উন্নত করিবার জন্য তনু-মন-ধন দিয়া খাটিবার কল্পনা করিতে ছিলেন, আবার কেহ বা ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে চলিবার অভিপ্রায়ে, কলেজের পড়া ছাড়িয়া, ইংরাজী রচনার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। অপর কেহ কেহ, কি উপায়ে সাহেব তুষ্ট করিয়া, বড় চাকুরী যোগাড় হয়, সে ভাবনাও ভাবিতেছিলেন। ৺রামোত্তম ঘোষ মহাশয় ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া এবং হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের আচার ব্যবহার অনুশীলন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদের মনে নূতন নূতন আশার সঞ্চার করিতেছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী, ছাত্র-সমাজে শাস্ত্রী-মহাশয়ের বক্তৃতা, আমাদের নিকট যেন নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতেছিল।

এই সময়ে শুনিলাম যে ফরিদপুরের একজন "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" বাণী উচ্চারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ইঁহার নাম, দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী। প্রথম আলাপেই মনে হইয়াছিল যে একজন প্রকৃত কর্ম্মীর সাক্ষাৎলাভ হইল। এই সময়ে দেবীবাবুর গৃহ বহু অসহায় নর-নারীর আশ্রয়স্থল ছিল। দাসত্ব করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিবার পর, নিজ পায়ের উপর কি প্রকারে দাঁড়াইলেন—এই কাহিনী শুনিতে বড়ই আনন্দ বোধ হইত। দুঃখ দারিদ্র্যের তাড়নায় অস্থির হইয়া, অনেক সময়ে, দেবী বাবুর সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়া, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হই নাই। ইহাতেই বুঝা যাইবে, তাঁহার প্রভাব, আমার উপর কি পরিমাণে বিস্তার করিয়াছিল। তাহার মুখের উপর, তাঁহার কার্য্য কলাপের তীব্র সমালোচনা আমাপেক্ষা বোধ হয় আর কেহ করেন নাই, তথাপি এই আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে এক দিনের তরেও তাঁহার সহিত মনোমালিন্য ঘটে নাই।

তাঁহার পুত্রবধু একদিন বলিয়াছিলেন, আমি যে ভাবে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত তর্ক করি তাহাতে বুঝি বা আমার তাঁহাদের বাড়ী যাওয়া আসা বন্ধ হইয়া যায়। সাধারণতঃ, আমাদের তর্ক হইত "নব্যভারতে" ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আক্রমণের জন্য। কাহারও ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ করিবার অধিকার অন্যের নাই, এই বিষয়ে আমি তীব্র-প্রতিবাদ করিতাম। দেবীবাবুর ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মসমাজ জগতে নূতন আদর্শ আনিয়াছে। এই সমাজ-ভুক্ত নরনারীর সমাজ-দ্রোহী কোন কাজ কোন প্রকারে চাপা দেওয়া সঙ্গত নহে। তিনি ভয় করিতেন, সামাজিক ব্যভিচার ঢাকা দিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্ম-সমাজ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে; আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি কোন প্রকার মতলবের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা করিতেন না, ঐ সমাজের মঙ্গল সাধনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

দেবীবাবু পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন। মনে করিতেন, মানুষের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে, এবং ভগবানে অটল বিশ্বাস না থাকিলে, লোকে সৎপথে চলিতে পারে না এবং good citizen ও হইতে পারে না। আমার সহিত এ সম্বন্ধে কথা হইলে, আমি বলিতাম, নরকের ভয় দেখাইয়া বা স্বর্গের আশা দিয়া, মানবাত্মার উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তবুও বিশেষ যে কার্য্যকরী হইয়াছে, এমন মনে হয় না। পারিবারিক উপাসনায় দেবীবাবু অনেক সময়ে আমাকে ডাকিতেন। একদিন এই প্রকার উপাসনায় দেবীবাবু, তাঁহার পরলোকগত প্রিয়জনেরসহিত মিলনের দিন ঘনাইয়া আসি-তেছে, স্মরণ করিয়া, আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া-

ছিলেন। উপাসনা শেষ হইলে, আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, পরলোকে প্রিয়-জনের সম্মিলন যেমন আনন্দবৰ্দ্ধক, ইহলোকে যাহাদের শত্রু মনে করা যায় তাহাদের সহিত মিলন নিরানন্দ-সূচক হইবে কি? এই প্রশ্নেও কোনপ্রকার বিরক্তির ভাব দেখি নাই। তিনি জানিতেন কুতর্ক করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া-ছিলাম মাত্র।

দেশানুরাগের অনেক দৃষ্টান্ত দেবীবাবুর মধ্যে দেখিয়াছি। প্রভাতকুসুমকে বিলাত পাঠান সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমি বলিয়া-ছিলাম, তাহাকে এমন কিছু শিখিতে দিন, যাহাতে দেশে ফিরিয়া বড় একটা চাকুরী পাইতে পারে। দেবীবাবু হাসিয়া বলিয়া-ছিলেন,—"নিজে ঘোরতর আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়িয়াও যখন চাকুরীর চেষ্টা করি নাই, তখন একমাত্র পুত্রকে পয়সা খরচ করিয়া গোলাম বানাইয়া আনিব কি করিয়া? প্রভাত ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া যদি একজন নির-পরাধীকেও আইনের খপ্পর হইতে বাঁচাইতে পারে, তাহা হইলেও আমার অর্থব্যয় সার্থক হইবে।" তিনি পুত্রকে দেশের কাজে ব্রতী হইবার সাহায্য করিলেন।

দেবীবাবুর বিবেক-বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। তিনি তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধিতে যাহা শ্রেয়ঃ মনে করিতেন, তাহা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। ইংরাজের উপর তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সমর্থন করিতেন না। রাজদ্রোহী না হইলেও, তাঁহার নাম গোয়েন্দা পুলিশের খাতায় ছিল। তিনি কলিকাতা ছাড়িলেই, তাঁহার নম্বর তারে গন্তব্য স্থানে জানান হইত। অবশ্য, তিনি ইহাতে ভীত ছিলেন না। সর্ব্বদাই নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মত কাজ করিয়া যাইতেন। পুরীর একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী আমাকে বলিয়াছিলেন যে দেবীবাবুর ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোকের উপরও "নজর" রাখিতে হয় মনে করিলেই, তাঁহার চাকুরীর উপর ঘৃণা জন্মে। এই ব্যক্তি দেবী-বাবুর উপর দৃষ্টি (watch) রাখিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন।

দেবীবাবুর মৃত্যুতে ফরিদপুর একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হারাইল। তাঁহার ন্যায় আর একজন কবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, জানি না। 'সুহৃদ সভা' সম্বন্ধেও আমাদের মতের ঐক্যতা ছিল না। তাই আমি তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় যোগদান করি নাই। এক দিন আমার বক্তব্য শুনিয়া চোখের জল ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তিনি যে ভাবে 'সুহৃদ সভা' রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 'সুহৃদ সভা' দ্বারা ফরিদপুরের কিছু কাজ হইতেছে মনে করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেন। 'নব্যভারত' এবং 'সুহৃদ সভা' তাঁহার প্রাণের জিনিস ছিল। আশা করি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র এবং পুত্র-বধূ এই দুই জিনিস সজীব-ভাবে রাখিয়া, তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবেন।

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

মনে পড়ে, সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, এই পৌষমাসে, ফরিদপুরের এক গ্রামে, প্রসন্নমূর্ত্তি দেবীপ্রসন্নকে প্রথম দেখি। দাদার কাছে নাম শুনিয়াছিলাম; পরিচয় দিয়া প্রণাম করিতেই, দেবীপ্রসন্ন হাসিতে হাসিতে "তুমি আমাদের বন্ধু বিজয়বাবুর ভাই" বলিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। তারপর তিনি "আমাদের জন্মভূমি, ফরিদপুরের উন্নতির জন্য 'ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা' প্রতিষ্ঠিত ক'রেছি, সভার কাজে গ্রামে গ্রামে আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে—এস"—বলিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। ভক্ত কেশবচন্দ্র মরণাপন্ন; শীঘ্র কলিকাতা ফিরিতে হইবে, এই দুশ্চিন্তা লইয়া কেশব ভক্ত দেবীপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি কাজ সারিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্নে কেশবচন্দ্র আর নাই—এই নিদারুণ সংবাদ আমরা শুনিলাম। অকস্মাৎ পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া পুত্র যেমন বজ্রাহতের ন্যায় হয়, কেশবচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে দেবীপ্রসন্ন শোকাহত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল; আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত রাত্রি মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিলেন; কাহারও সঙ্গে একটি কথাও বলিলেন না। তরুণ বয়সে, সেই প্রথম অনুভব করিয়াছিলাম, রক্তের টান না থাকিলেও মানুষে মানুষে কত খানি প্রাণের টান হয়। আরও বুঝিয়াছিলাম, ধর্ম্মাচার্য্যের প্রতি শিষ্যগণের পিতৃভক্তি কথার কথা নয়। দেবীপ্রসন্ন তাঁহার 'নব্যভারতে', কেশবচন্দ্রকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন—তাহা পিতৃ-তর্পণ স্বরূপ হইয়াছিল। তাহা পড়িয়া কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন 'ভক্তের আবেগপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস'। আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "কেশবচন্দ্র" নামক কবিতাটিও 'নব্যভারতের' সেই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবীপ্রসন্ন সেই কবিতাটির নিম্নলিখিত কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত, দেবীবাবুর মুখে তাহার আবৃত্তি শুনিয়াছি—

> নিভিবে না চিতানল অশ্রুজলে জানি জানি,
> তবু কাঁদি আজ;
> ফিরিবে না মহাযোগী, হরপাদপদ্ম ছাড়ি
> তবু ডাকি তায়।
> বর্ত্তমান কাঁদ কাঁদ, আজ এ দুঃখের দিনে
> কেশবের তরে,—
> নতুব তোমার পুত্র, সুকৃতজ্ঞ ভবিষ্যৎ
> নিন্দিবে তোমারে।
>
> —নব্যভারত, ১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা, ১২৯০

উড়িষ্যার কতিপয় যুবক কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়া দেবীবাবুর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দর্শনপ্রার্থী হইলে দেবীবাবুর অনুরোধে, আমি তাঁহাদিগকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া সেই উৎকলবাসিগণকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কলিকাতা আসিয়া কোথায় আছেন?" তাঁহারা উত্তর করিলেন—"আমরা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি।" অসুস্থ বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন; উত্তর শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন; মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! কত স্থানের কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন; কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় একই উত্তর পাই,—'আমরা দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি'। এই ধনী প্রধান কলিকাতা নগরে, প্রবাসে আসিয়া, সামান্য গৃহস্থ দেবীপ্রসন্নের গৃহে এত অতিথি স্থান পান, এই স্বার্থপরতার দিনে, এতো সামান্য কথা নহে!" সেই মহত্ত্বের আদর্শ মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর, দেবীপ্রসন্নের মহত্ত্বের একটিমাত্র পরিচয় পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা জানি, দেবীবাবু প্রচুর অর্থ-সঞ্চয় করিয়া ধনী হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ভোগ

বিলাস সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া, কত অনাথ অনাথাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার 'আনন্দ আশ্রম' অতিথি অভ্যাগতের নিকট সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল।

"ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা" প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবীপ্রসন্ন অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের মধ্যে নারীর উপযোগী শিক্ষা প্রচার করিতেছিলেন। ফরিদপুরবাসীর দুঃখ অভাব মোচনের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন এবং সমস্ত ফরিদপুরবাসীর সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম, তাঁহাকে জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনি ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর সেবা করিয়া ভগ্ন রুগ্ন দেহে ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু সেবার প্রীতিতে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন।

আমাদের দেশের সাধুগণ নারীজাতিকে মাতৃ সম্বোধনে সম্মানিত করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের সহিত মেলামেশা সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের আদর্শ ও উপদেশ দেবীপ্রসন্ন অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিয়াছেন। তিনি কোনও রমণীর সহিত চপল হাস্যপরিহাস করিতেন না; যাঁহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে 'মা' 'বোন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এ সম্বন্ধে ব্রতধারী সংযত সন্ন্যাসীর মত তাঁহার নিষ্ঠা ছিল। বোধ হয়, এই জন্যই তাঁহার মুখশ্রী লালসা বিবর্জ্জিত পবিত্রতা মণ্ডিত ছিল।

কখনও কখনও দেবীপ্রসন্নের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াছি। সবল যখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিত, তখন দেবীপ্রসন্ন তেজস্বী বীরপুরুষের ন্যায় অগ্রসর হইতেন। তখন তাঁহার নয়নের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তেজোময় বচন ও সিংহবিক্রমে অত্যাচারীর হৃদয় কম্পিত হইত।

দেবীপ্রসন্নের আর এক মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। মানুষের সে ছবি আমার কাছে বড় মধুর বলিয়া মনে হয়, চোখ ভরিয়া জল আসে। সে ঠাকুরদাদার ছবি। যখন জীবন-খেলা ফুরাইয়া আসিতেছিল, দেবীপ্রসন্ন নাতি নাতিনীকে কোলে করিয়া স্নেহে বিগলিত হইয়া—বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কতদিন সে দৃশ্য দেখিয়া অধীর উচ্ছ্বাসে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিন দেখিলাম, বৃদ্ধ, শিশু পৌত্রটিকে কোলে করিয়া,একখানি কচুরি তাহার হাতে দিয়া, আর একখানি নিজে লইয়া বলিলেন— "দাদা, একখানা তুমি খাও, আর একখানা আমি খাই"। বাঙ্গলাদেশের সকল ঠাকুরদাদা, সকল নাতি নাতিনীর প্রেম-দৃশ্য, আমার মানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দেবীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল তাঁহার স্বাভাবিক মুখশ্রী প্রতিচ্ছায়াতে পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। হৃদয়পটে অঙ্কিত দেবীপ্রসন্নের ভোগ-বিলাস-লালসা-চিহ্ন-পরিশূন্য পবিত্র গম্ভীর সৌম্য প্রসন্ন মূর্ত্তিখানি প্রতিকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীবামনদাস মজুমদার।

মহাত্মা দেবীপ্রসন্ন।

আর একটী মানুষের মত মানুষ অকস্মাৎ কর্ম্ম জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বিগত ১৮ই আশ্বিন, ১৩২৭ সাল, ইংরাজী ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২০ প্রবীণ সাহিত্যিক উন্নত চরিত্র, অক্লান্তকর্ম্মা দেশ-প্রেমিক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী আনন্দধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার অভাব আজ আত্মীয় স্বজন ও অনুরাগী দেশবাসীগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। বহুকণ্ঠে আর্ত্তনাদ ও বহুনেত্রে অশ্রুপাত করিলেও,তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার

উপায় নাই। দেশবাসী অনুরক্তগণের শান্তি-লাভের একমাত্র উপায় তাঁহার সমুন্নত চরিত্র ও কর্ম্ম-জীবনের আলোচনা। তাহাতে উপকৃত হইবারও সম্ভাবনা। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার জীবন কথার আলোচনা করিব।

দেবীপ্রসন্নবাবু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, ফরিদপুর জেলান্তঃপাতী উলপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত বসু রায় চৌধুরী বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যখন ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন, তখনকার হিন্দুসমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল এবং বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। স্বাধীনভাব-সম্পন্ন যুবকেরা যুক্তিহীন আচার-ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠেন; দলে দলে হিন্দু-সমাজের প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া পড়েন। দেবীপ্রসন্নবাবুও তদ্রূপ একজন। স্বধর্ম্ম স্ব-সমাজ, আত্মীয় স্বজন পরিবর্জ্জিত হইয়া তাহাকে যে কি প্রকার কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল, লাঞ্ছনা গঞ্জনাকে বুক পাতিয়া লইয়া কিরূপ বীর হৃদয়ের পরিচয় দিতে হইয়াছিল, যাঁহারা তৎকালীন অবস্থা সম্যক জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন। দেবীবাবু দৃঢ় সঙ্কল্প, অদম্য উৎসাহ লইয়া জন্মিয়াছিলেন। প্রতিকূল অবস্থা কখনও তাঁহার সঙ্কল্প নির্জ্জিত ও উৎসাহ বিচূর্ণ করিতে পারে নাই। অসহায় অবস্থায়, আপনার পায়ের উপর নির্ভর করিয়া,যাঁহারা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও সম্পত্তিবান হইতে পারিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস দেবীপ্রসন্ন তাঁহাদেরই অন্যতম। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। সাহিত্য-সাধনা ও দেশ-হিত-ব্রত তাঁহার অবলম্বনীয় হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সে সাধনা ও ব্রত হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। পবিত্রভাবে, সংযমের গণ্ডীর ভিতর দিয়া, মানসিক সদ্‌গুণ প্রভাবেই তিনি যশ মান অর্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। ইহা তাঁহার অসাধারণত্বের দ্যোতক। সাহিত্য-সাধনায় তিনি যে কি প্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিরচিত গ্রন্থ-নিচয়ই প্রতিপন্ন করিতেছে। মাসিক পত্র সম্পাদনে তাঁহার কৃতিত্বের তুলনা নাই। "নব্যভারত" বাস্তব পক্ষেই নব্যভারতে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে। সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার মনস্বিতা, তেজস্বিতা ও দৃঢ়চিত্ততা, সর্ব্বোপরি উদারতার, লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে অবসর পাইয়াছে। 'নব্য-ভারতে' তিনি কখনও অযথা লোক-রঞ্জনের প্রয়াস পান নাই; দৃঢ়তার সহিত শুধু লোক-শিক্ষার উচ্চ সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া, কঠোর কর্ত্তব্য-পালন করিয়া গিয়াছেন। গল্প বা উপন্যাস তাঁহার সম্পাদিত কাগজে কখনও স্থানলাভ করে নাই। অর্থ লোভে কখনও যা' তা' বিজ্ঞাপন 'নব্যভারতে'র সহিত সংযুক্ত করেন নাই। 'নব্যভারতে' বিজ্ঞাপন ছিল না বলিলেই হয়; অথচ তজ্জন্য ব্যাকুলতা বা ক্ষোভ-প্রকাশ করিতে কোন দিনও শুনা যায় নাই। মাসিক পত্রের কোন সমালোচনা তাঁহার কাগজে প্রকটিত হইত না। প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার মতের বিরুদ্ধ মত প্রকাশক প্রবন্ধও সুলিখিত হইলে, তিনি 'নব্যভারতে' স্থান দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না; বরং সাদরে পত্রস্থ করিতেন। এতটা উদারতা সম্পাদক-সম্প্রদায়ে অতীব দুর্ল্লভ। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে তাঁহার স্বাধীনতা সর্ব্বদাই নির্ভীক প্রকৃতির পরিচয় দিত। এজন্য তিনি অনেক সময় তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় তাহাতে অবসন্ন হয় নাই। 'নব্যভারত' পরিচালনে তিনি লাভবান হইতে না পারিলেও, বিস্ময়ের বিষয় এত দীর্ঘকাল পত্রখানাকে জীবিত রাখিতে পারিয়াছিলেন। 'নব্যভারতে'র বয়সের সাময়িক-পত্র বর্ত্তমানে অতি অল্পই আছে; বহু পত্র পত্রিকাই অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। 'নব্য-ভারতে'র দীর্ঘ-জীবনের হেতু অনুসন্ধান করিলে, সম্পাদকের প্রভূত শক্তি ও পরিচালনের সুরুচি-সঙ্গত বৈশিষ্ট্যই প্রধান

কারণরূপে গণ্য হইবে। আমাদের মনে হয়, দেবীপ্রসন্ন সাহিত্য-চর্চার ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালনে যে উচ্চ লক্ষ্য ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। অনেকেরই অনুকরণীয়।

দেবীবাবু তাঁহার শক্তি সামর্থ্যের ওজন বুঝিতেন। যে কার্য্য তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা রাখিতেন, তাহাই সম্পাদন করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেন। শুধু আড়ম্বর, শুধু হৈ চৈ করিয়া নাম করিবার প্রযত্ন তাঁহার ছিল না। তাই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ থাকুক, সমগ্র বঙ্গের হিত-সাধন-রূপ বিরাট ব্যাপারে কোন সময় হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার স্ব-জেলার সমুন্নতির নিমিত্তই আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। 'ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা' এই মহতী ইচ্ছার ফল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রত্যেক জেলার সুসন্তানেরা স্ব স্ব জেলার হিতসাধনে নিযুক্ত হইলে, অল্প আয়াসে বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের, তথা ভারতবর্ষের, সম্যক উন্নতি সংঘটিত হইবে। নেতৃ-নামে অভিহিত অনেক মহোদয়, ভারতবর্ষের উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর। দুঃখের কথা, তাঁহাদের জন্মস্থান ক্ষুদ্র পল্লীর উন্নতি অবনতির তাঁহারা ধার ধারেন না। তাঁহাদের বৃহৎ মস্তকে এ ক্ষুদ্র চিন্তার স্থান নাই! দেবীপ্রসন্নবাবুর স্বভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ক্ষুদ্র লইয়াই তাঁহার কার্য্যারম্ভ ক্রমশঃ বৃহতে তাহার পরিসমাপ্ত। 'ফরিদপুর সুহৃদ সভা', ফরিদপুরবাসীর অশেষ হিত সাধন করিতে পারিয়াছে, সহানুভূতির স্থা প্রদর্শন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে পারগ হইয়াছে; ইহা অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কোন ফরিদপুরবাসীই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ফরিদপুর জেলায় এমন কোন ভদ্র পরিবার নাই, যাহার মহিলারা সামান্য লেখাপড়া জানেন না। এই শিক্ষা বিস্তার "সুহৃদ্-সভা"র চেষ্টার ফল। দেবীবাবু সুহৃদ্ সভার প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন। তিনি যৌবনে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্ব-জেলার নানাবিধ অভাব দূরীকৃত করিয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলার বহু রাস্তা ও খাল তাঁহার উৎসাহ ও যত্নের ফল। গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিতেন এবং যখন কোন গ্রামে কলেরার প্রকোপ হইত, তথায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স প্রেরণ করিতেন। অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারের জন্য নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করিয়া মহিলাদিগকে শিক্ষানুরাগিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কৃষক বালকবৃন্দের শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য যত প্রকার সদুপায় হইতে পারে, দেবীপ্রসন্ন তাহার প্রায় উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যদিও দেশবাসীর ঔদাসীন্য তাহার উদ্যমকে সম্পূর্ণ সফলতা দান করিতে দেয় নাই, তথাপি আশা করি, তাঁহার দেব-হৃদয়ের উচ্চতা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাঁহারই পন্থাবলম্বনে অসম্পূর্ণতা নিরাকৃত করিবে।

তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্ববিধ উচ্চতার বীজই নিহিত ছিল। শুধু শিক্ষা স্বাস্থ্য ও নীতি লইয়াই তিনি বিব্রত ছিলেন না। দেশবাসীর অন্নাভাব দূর করিবার নিমিত্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্লেশবোধ হইত না। করুণায় তাঁহার মানস ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল। ফরিদপুরে কয়েকবার দুর্ভিক্ষে তিনি আহার-নিদ্রা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া, অন্ন ক্লিষ্ট জনগণের মুখে এক গ্রাস অন্ন তুলিয়া দিবার জন্য যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবপক্ষেই আশ্চর্য্য। বুভুক্ষিতের ক্ষুধা নিবারণের জন্য ঐরূপ আত্মহারা অবস্থা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শুনিয়াছি, একবারের দুর্ভিক্ষে কোন একস্থানে ক্রমান্বয়ে কয়দিন আহারহীন নিদ্রাহীন অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া শত শত লোককে চাউল বিতরণ করিয়াছেন। আহার তৃষ্ণার কথা, স্বাস্থ্যের কথা, একটী বারও মনে করেন নাই। এরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া দুঃখীর দুঃখ মোচনে দেব-হৃদয় ভিন্ন অন্যের কি অধিকার হইতে পারে? তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।" তিনি বলিতেন, "সৎকার্য্য

করিতে আরম্ভ করিলে অর্থের অভাব হয় না।" একবার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট উত্তরে লেখেন, "দুর্ভিক্ষ কোথায়? সাহায্য করার উপযুক্ত অবস্থা এখনও হয় নাই।" অথচ দেশে অন্নাভাবে বহুজন বহু পরিবার ক্লিষ্ট। দেবীবাবু গবর্ণমেণ্টের উত্তর পাইয়া কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু রেভারেণ্ড মথুরানাথ বসু বলিলেন,—"দেবী, কাঁদিতেছ কেন? কার্য্য আরম্ভ কর, অর্থের অভাব হইবে না।" দেবী বলিতেন,—"ফলতঃ, গুরুবাক্যে আস্থা-স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, নানাস্থান হইতে সাহায্য আসিতে লাগিল। সেবারকার দুর্ভিক্ষে ভগবানের করুণায় আমাদের সেবায় বহুলোক মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল।"

দেবীবাবু প্রকৃত পক্ষেই দেশের অভিভাবকের যোগ্য ছিলেন। তিনি ফরিদপুরবাসীকে আপনার বৃহৎ পরিবার-ভুক্ত মনে করিতেন। তাঁহাকে জানাইলে অথবা জানিতে পারিলে, তিনি ফরিদপুর-বাসীর সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের সহায়তা করিতেন। অনেকে তাঁহার সহায়তায় চাকুরীর সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। স্কুল কলেজে ফ্রি হইতে পারিয়াছেন। পীড়িতা-বস্থায় আনুকূল্য পাইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু ৺রসিকলাল রায়, যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনী হইতে জ্বর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া দেবীবাবুর বাসায় থাকেন। রোগ ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করে। দেবীপ্রসন্নবাবু ডাক্তার দেখাইয়া, আত্মীয়ের ন্যায়, অতি যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, রসিকবাবুর জীবন রক্ষা পায় নাই। আজ কালকার দিনে এরূপ উচ্চ-মানবতা অতি বিরল।

দেবীবাবুকে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন বটে, কিন্তু গোঁড়াও ছিলেন না—পাঁতিও ছিলেন না। হৃদয়-মাধুর্য্যে তিনি উভয় সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কখনও অন্যধর্ম্মাবলম্বী বা অন্য সমাজকে অশ্রদ্ধা করিতে দেখি নাই। তাঁহার সহিত মিশিয়া বুঝিতে পারি নাই, তিনি হিন্দু কি ব্রাহ্ম। শুধু এইটুকু বুঝিয়াছি, তিনি আমার স্বদেশী স্বজন।

তাঁহার অহঙ্কার ছিল না। অভিমান ছিল, যে অভিমান অন্যকে ক্লিষ্ট করে না; আপনার মনুষ্যত্বকে পুষ্টির পথে লইয়া যায় সেই অভিমান। সেই অভিমানের বলেই দেবীপ্রসন্ন কলেজের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলেও, অধ্যবসায়-গুণে প্রকৃত শিক্ষা ও সদ্গুণের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার আর একটী প্রধান গুণ ছিল, তীব্র আক্রমণ-সহিষ্ণুতা। আমরা অনেক সময় 'সুহৃদ-সভা'র ত্রুটী বিচ্যুতি লইয়া সম্পাদককে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছি; তিনি সাময়িক ক্ষুণ্ণ হইলেও, চিরদিনের জন্য আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকেন নাই। যখনই দেখা হইয়াছে, তখনই আত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার মত কর্ম্মঠ ব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায় না। সর্ব্বদাই তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। শুধু লেখাপড়া কর্ম্ম নয়, শারীরিক শ্রমসাধ্য সাংসারিক কর্ম্মেও তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল না। শ্রমের কার্য্যে তাঁহার অপমান বোধ ছিল না। তিনি আপনাকে আদর্শ বাঙ্গালীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

এরূপ স্বনামধন্য মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন বাঙ্গালীর অন্তর্দ্ধান, প্রকৃতপক্ষেই দেশের দুর্ভাগ্যের কারণ। তাঁহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। তবে আমাদের আশা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী গুণী পিতার পদাঙ্কানুসরণ করতঃ তাঁহার অভাব পূরণের চেষ্টা করিবেন, তাঁহার নাম অক্ষুন্ন রাখিবেন। ভগবচ্চরণে বিনীত প্রার্থনা, দেবীপ্রসন্নকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে চির-শান্তি দান করুন। দেশবাসী তাঁহার আদর্শ-জীবন সম্মুখে রাখিয়া, মানুষ হউক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ-বর্ম্মা।

স্বর্গত দেবীপ্রসন্নের তিরোধানে।

অয়ি মাতঃ বঙ্গভূমি কেন মা কাঁদিছ তুমি
হারায়ে ফেলেছ বলে হৃদয়-রতনে ?
কত রত্ন প্রসবিলে কত রত্ন বিসর্জ্জিলে
কতই কাঁদিলে, মাগো! আকুল নয়নে।১

এক এক অঙ্গ তব খসিয়া পড়িছে সব
কি নিয়ে থাকিবে ঘরে বুঝিতে ত নারি।
শূন্য গৃহে শূন্য প্রাণে কাঁদিছ সাশ্রু-নয়নে
কাঁদে যত বাণীসুত তব সুসন্তানে স্মরি।২

তোমার ক্রন্দন-ধ্বনি প্রবাসে বসিয়া শুনি
সে ধ্বনিতে আমিও মা কাঁদি সনে তার।
কাঁদে মা ভারতবাসী শক্তিহীন অহর্নিশি
কান্না যেন আমাদের অস্থিমজ্জা সার।৩

সহায় বিহীন মোরা চাহি মুখ প্যানে যাঁর
কুটিল শমন প্রাণে সহে না তখনি
কদাফল ভেদহীন মায়া মমতা বিহীন
লোল-জীহ্বা বা'র করি গ্রাসিবে অমনি।৪

সুজলা শ্যামলা তুমি ছিলে মা সুখের খনি
এবে হায় জরামরা অদৃষ্টের গুণে;
কত শত নব রোগে তব সন্তানে ভোগে
অকালে চলিয়া যায় কে জানে কেমনে।৫

দুর্ভাগা যদ্যপি চায় সমুদ্র শুকায়ে যায়
আমাদের এই দশা কর্ম্ম দোষে হায়!
ঘুচিবে না কিবা মাগো কেটে কুকর্ম্মের ফল
হাসিমুখে বসিবে না ঘিরিয়ে তোমায়।৬

যদি কোন পুণ্যফলে, আসে মা সুপুত্র কোলে
তার মুখপানে চায় অন্য পুত্রগণে
অমনি করাল কাল ব্যাদনিয়া করে গ্রাস
সেই ক্ষণজন্মা তব জীবনের ধনে।৭

ও মাঁ বঙ্গ জন্মভূমি! দেবীপ্রসন্নেরে তুমি
পেয়েছিলে কোলে তব মহাপুণ্য ফলে।
সদা দানাব্রত-রত সত্যবাদী ব্রহ্ম রত
অমায়িক মিষ্টভাষী এ মহী মণ্ডলে।৮

নিবৃত্ত করিয়া কর্ম্ম সাধিয়া নিজের ধর্ম্ম
মগপুণ্য ধামে এবে করেছে প্রয়াণ।
নব্যভারতের স্বামী ওহে সৌম্য, গুণমণি,
গুণগ্রাহী ছিলে তুমি, ধর্ম্ম-পরায়ণ।৯

দীন-দুঃখী লোক জনে অন্ন দানি সুখ-মনে
শুভ-কর্ম্ম-জাত সুধা করে গেছ পান।
তোমার এ তিরোধানে হাহাকারে সর্ব্বজনে
তোমার বিহনে সবে আজি ম্রিয়মাণ।১০

আশ্বিন আঠার দিনে দ্বিপ্রহর মহাক্ষণে
রাখিলে নশ্বর দেহ কাঁদায়ে সবায়।
ধন্য বাণী-পুত্র ছিলে আজন্ম তাঁরে সেবিলে
কীর্ত্তিমান! যশ তব রহিবে অক্ষয়।১১

দেহ রাখি দেবধরে চলি গেছ দেবপুরে
অক্ষয় অনন্ত শান্তি বিরাজে যথায়।
লভহ অনন্ত সুখ, তথা নাহি কোন দুঃখ;
আশীষ করহ সবে থাকিয়া তথায়।১২

গড়িতে 'নব্যভারত' আয়াস করেছ কত
পবিত্রতা সাধুতায় কর্ত্তব্য পালনে
নব্যভারতের সৃষ্টি লিখন বড়ই মিষ্টি
গ্রথিত থাকুক দেব তব নাম মনে।১৩

ভারতের দুঃখতরে হৃদয় কাঁদিত তব
তাই বুঝি হৃদরোগে দেহ তেয়াগিলে।
কর্পূরের মত যেন শূন্যেতে মিশিলে হায়!
ব্রহ্ম-রূপ মহাশাপে অলক্ষ্যে অদৃশ্য হলে।১৪

যাও, দেব, যাও চলি নাহি তথা দলাদলি
পরম পিতার পদে লভহে বিশ্রাম।
কিশোরে আশীষ কর মাগিতেছে এই বর
তোমা-সম কার্য্য যেন সাধে অবিরাম।১৫

শ্রীরাজকিশোর রায়।

শ্রদ্ধার স্মৃতি।

আজ মুক্ত-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার স্মৃতি সংক্ষেপেলিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি, আমি মুক্তপ্রাণে তাহা করিব।

৩৬ বৎসর পূর্ব্বে এক দিবস গ্রীষ্মের ছুটিতে গোয়ালন্দের জাহাজে দেশে যাইতে- ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, এক

অনিন্দ্যসুন্দর রূপবান্ আরোহী, অন্য বিশিষ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, জাহাজের এক কোণে শান্তভাবে আপনার মনে বসিয়া রহিয়াছেন। বহু আরোহী পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "ইনি কে?" আমি ও সেই সময়ে সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, দেখিলাম 'দেবীবাবু'। অন্যেরা আমার নিকট হইতে পরিচয় পাইয়া, আগ্রহের সহিত তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। আমাকে তিনি চিনিতেন না। আমিও নিকটে যাইয়া বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি ফরিদপুরের যাত্রী। সেদিন জাহাজ চরায় ঠেকিয়াছিল, তাই সেখানে পৌঁছিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই সময়ের একটী ক্ষুদ্র ঘটনা উপলক্ষ করিয়া, চিরদিনের মত আমাদের দুজনের প্রাণে প্রাণে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নের আহার কালের পূর্ব্বেই তিনি যথানিয়মে ফরিদপুর পৌঁছিতে পারিবেন, এই ভরসায় বাড়ী হইতে কোন আহার সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া যান নাই। আমি খুঁজিয়া এই কথাটী বাহির করিলাম। আমার সঙ্গে বোম্বাই আম ও অন্য খাবার ছিল। আমি অনেক অনুরোধ করিয়া, উহা হইতে কিছু গ্রহণের জন্য তাঁহাকে স্বীকৃত করাইলাম। সেইদিন তাঁহাকে তৃপ্তিমত আহার করাইয়া আমি কি অপূর্ব্ব আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এই উপলক্ষে যে প্রীতির সূত্রপাত হয়, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও ঘনিষ্টতর হইয়া উত্তরকালে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল; অশ্রুসিক্ত প্রাণে সাক্ষ্য দিতেছি, ইঁহার বন্ধুত্ব অকৃত্রিম ও অতুলনীয় ছিল। এমন হিতৈষী ও দরদী খাঁটী বন্ধু জগতে অতীব দুর্ল্লভ। মহাত্মা তুলসীদাসের একটী স্মরণীয় উক্তি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছেন, "লাখে না মিলল এক,"— লক্ষের মধ্যে একটী খাঁটী বন্ধু মিলে না। হইতে পারে, কখন কখন ইহার জন্য তিনি অপযশ-ভাগী হইয়াছেন। সাময়িকভাবে মিলিলেও, প্রায়ই ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতে হয় সে বন্ধুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু আমি প্রথম পরিচয় হইতে শেষ পর্য্যন্ত, দীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল একাদিক্রমে তাঁহার অনুপম বন্ধুত্ব সম্ভোগ করিয়াছি। একদিনের জন্যও ইহার প্রীতি-প্রফুল্ল দৃষ্টির প্রসন্নতা হইতে বঞ্চিত হই নাই। আমাদের মধ্যে, অতি গুহ্যতম কথারও বিনিময় হইয়াছে এবং এই সুদীর্ঘকাল তিনি সমভাবে বিশ্বাস করিয়াছেন ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছেন। এই অযোগ্যকে তিনি কি যে স্নেহ, আদর ও শ্রদ্ধা করিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয় ও গৃহে কি যে অধিকার দিয়াছিলেন, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবার বিষয়, বুঝাইবার বিষয় নহে। কি এক নিগূঢ় আকর্ষণ যাঁহার গুণে ও স্নেহে চির বাঁধা পড়িয়াছিলাম, আর তাঁহাকে এ জীবনে দেখিতে পাইব না। আজ কত স্মৃতি প্রাণের মধ্যে হাহাকার করিতেছে। অভাব ও বেদনার কি এক দারুণ অনুভূতি প্রাণকে ক্লিষ্ট করিতেছে। আজ যেন হৃদয় বিদ্ধ হইয়া শোণিত বিন্দু নিঃসৃত হইতেছে।

এই ক্ষুদ্রের মধ্যেও যে কোন শুভ উপকরণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহার কি ব্যগ্রতাই না দেখিয়াছি। আমি যখন কলেজের ছাত্র, তখন তিনি আমার একটী ক্ষুদ্র লেখা দেখিয়া অনবরত উৎসাহ দিয়া, সেই তরুণ বয়সেই আমার দ্বারা প্রবন্ধ লিখাইয়া 'নব্য-ভারতে' মুদ্রিত করিয়া, আমাকে সমধিক উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেই হইতে আমরণ তিনি লেখার অনুশীলনের জন্য আমাকে কেবলই উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন।

এই দীর্ঘ ৩৬ বৎসর কালের মধ্যে, আমি কত লোকের নিকট তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে কত কথা শুনিয়াছি। সেই জন্য অনেক সময় আমি তাঁহাকে বিশেষ সমালোচনার চক্ষে দেখিয়াছি এবং তাঁহার সহিত সসম্ভ্রমে অনেক তর্ক বিতর্কও করিয়াছি। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া আমি একদিনের জন্য ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই। তাঁহাকে যেটুকু বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই আমি দুই চারি কথায় নিম্নে লিখিতেছি।

তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত গুণরাশি সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ

ও সাহিত্যসেবা, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষত্ব, তাঁহার স্বাবলম্বন ও স্বাধীন-চিন্তা, তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষণা ও আর্ত্তসেবা, তাঁহার পরোপকার-সাধন ও পরকে আশ্রয় দান, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীকতা,—এই সকল গুণ সর্ব্বসাধারণেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি আমার ভাবে তাঁহার মধ্যে যাহা দেখিয়াছি ও তাঁহাকে যেরূপ বুঝিয়াছি শুধু তাহাই বলিব।

নিজের সম্পর্কে ও অন্যের সম্পর্কে আমি সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি, কোন বন্ধুর কথা অবিশ্বাস করার ভাব তিনি ঘুণাক্ষরেও মনে স্থান দিতে পারিতেন না। কখন২ অত্যন্ত ...শের সহিত দেখিয়াছি, তাঁহার বন্ধু দর মধ্যে কোন কোন স্থলে তাঁহার এই সরল, অকপট বিশ্বাস-নিষ্ঠার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। এইরূপ বিশ্বাস-নিষ্ঠার দোষের মনে হইতে না পারে; কখন কখন ইহার জন্য তিনি অপযশ-ভাগী ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অনেক সময় কবি গোল্ডস্মিথের উক্তি স্মৃতিতে উদিত হইয়া এইরূপ মনে হইয়াছে যে, তাঁহার এই বন্ধুবিশ্বাসকে ত্রুটী বলিতে হইলে, এই ত্রুটীও leaned to virtue's side—ইহার প্রবণতা পুণ্যের দিকেই ছিল।

তাঁহার গৃহে, তাঁহার হৃদয়ের বিশাল উদারতা-প্রসূত যে সদাব্রত দেখিয়াছি, তাহা আর অন্যত্র দেখি নাই। এক সময়ে প্রায় শতাবধি লোক দিনের পর দিন এই গৃহে আহার করিয়াছেন এবং অন্নপূর্ণা-রূপে ইঁহার গৃহিণী ইহাদিগকে খাওয়াইয়া, এমন কি নিজের জন্য বাড়া ভাতের থালা পর্য্যন্ত অতিথিকে দিয়া, দিনান্তে বাজার হইতে খাবার আনাইয়া, আহার করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। এই পুণ্য-দৃশ্য জীবনে আর দেখিতে পাইলাম না।

পুত্রের কল্যানের জন্য তাঁহার প্রাণে কি গভীর আকুলতা ছিল, তাহাও ভাবিবার বিষয়। এই মহানগরীতে ছাত্রগণের সর্ব্বনাশের পথ-স্বরূপ অসংখ্য প্রকার দুর্নীতির অবাধ বাণিজ্যের মধ্যে, পাছে তরুণ বয়সে পুত্রের অকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি একজন পূত-চরিত্র বিচক্ষণ শিক্ষক-বন্ধুর গৃহে পূর্ব্ববঙ্গে তাহাকে শিক্ষা লাভের জন্য রাখিয়াছিলেন। এই বিষয়ে সকলে তাঁহার সহিত একমত না হইলেও, কয়জন পিতা, পুত্রের জন্য অতটুকু চিন্তা করেন ও সাবধানতা অবলম্বনে প্রয়াসী হন, তাহা বিশেষ ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

তাঁহার পারিবারিক জীবনে সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্ব দেখিয়াছি, তাঁহার পুত্র-বধুর প্রতি অলোক-সামান্য প্রীতি ও সম্মান। আর্য্যগণের অনুষ্ঠানে পিতা কন্যাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব"। তিনি যে চারুশীলাকে স-অর্ঘ্যে, সপুষ্পে ও সচন্দনে অষ্টা দশ বৎসর পূর্ব্বে, সনেহ ও সাগ্রহে বধূমাতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, আমি অনুদিন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি যে, সেই বধুমাতাকে তিনি এই দীর্ঘকাল সত্য সত্যই তাঁহার হৃদয়-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমন বধূ-প্রীতি জগতে সুদুর্লভ। আজ এই দুর্লভ-সৌভাগ্য-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া বধূমাতাও নিজেকে কত দরিদ্র মনে করিতেছেন।

আমি আর কিছু বলিতে চাহিনা; শুধু এই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, ৩৬ বৎসরকাল দোষেগুণে তাঁহাকে যাহা দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া, বঙ্কিম বাবুর ভ্রমরের স্বর্ণপ্রতিমা সম্বন্ধে শচীন্দ্রের উক্তির কথা মনে পড়িতেছে। আর ইংরেজ কবির এই অমর ছত্রও মনে হইতেছে—"with all thy faults, I love thee still."—তোমার সকল দোষ সত্ত্বেও, তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ আছে; ঈশ্বর আমাদের এই সম্বন্ধের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ-পুষ্প বর্ষণ করুন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

আড়ি।

যাঁহারা আমাদের নেতা বা মোড়ল সাজিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের বার্ষিক বড় সভায় বলিয়াছেন, যে এদেশের শাসন নীতি ও শাসন কর্ত্তাদের সঙ্গে তাঁহাদের আড়ি। মোড়লেরা বলিতেছেন যে, বিলাত ত পার্লামেন্টের হাতের গড়া শাসন-নীতির ঠুঁটো ঠাকুর; যেমন আছেন তেমনই ভারত-শাসন-পরিচালনের রথে থাকুন, আমরা কেহ রথ-যাত্রায় যাইব না—রথের দড়ি টানিব না; ঠুঁটো ঠাকুরের সহিত আমাদের আড়ি। যে সভায় বড় কর্ত্তারা এই আড়ি পাতিলেন, সে সভায় দেশের বিস্তর মাথাল মাথাল লোকের জনতা হইয়াছিল, শুনিতে পাই। এক জায়গায় অনেক লোক জমিলে, আমাদের চলিত ভাষায় বলে যে, স্থানটিতে মানুষের "গাঁধি লাগিয়াছে"; এই চলিত ভাষায় আমরাও বলিতে পারি, যে এবারকার দেশের মহাসভায় গাঁধি লাগিয়াছিল।

যাঁহারা প্রাচীন রথযাত্রাটাকে একঘ'রে করিয়া মারিয়া নূতন রথযাত্রা করিবেন, তাঁহাদের ভবিষ্যত রথের মহারথীরা যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হইল না, যে উঁহারা রথের দড়ি একেবারেই ছুঁইবেন না। প্রাচীন রথের অনেক দড়ি; তাই দুচার গাছি দড়ির পরিচয় দিয়া কথাটা খুলিয়া বলিতেছি। ইংরেজেরা আমাদের বিপুলায়তন ভারতবর্ষে একচ্ছত্র রাজ্য বজায় রাখিবার জন্য যত আয়োজন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনটীর নাম করিতেছি, যথা—রেল, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিস। অল্প সময়ের মধ্যে দূরের খবর ও ঘরের খবর পাওয়া চাই, সহজেই নানা স্থানের জিনিষ পত্র টানিয়া আনা চাই, প্রজারা দৈবাৎ বেয়াদপি বা বিদ্রোহ করিলে তাড়াতাড়ি তাহা দমন করা চাই; এইরূপ নানা প্রয়োজনে রেল, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিস না থাকিলে একালে একচ্ছত্র রাজত্ব করা অসম্ভব। ঐ কারখানাগুলি শাসনের প্রয়োজনে বসিয়াছে; এখন উহা বসিবার পর এদেশের লোকেরও সুবিধা হইয়াছে। কাজেই এই তিনটি কারখানা শাসননীতির রথের খুব মোটা মোটা তিন গাছি বড় দড়ি। যাঁহারা ঠুঁটো ঠাকুরকে ছুঁইবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ও তাঁহার রথখানিকে পঙ্গু করিবেন বলিতেছেন, তাঁহারা কিন্তু এ বড় তিন গাছি দড়ি সজোরে প্রাণপণে টানিতেছেন, ও টানিবেন বলিতেছেন। বাঙ্গলা দেশে যখন শিঙ্গী না খাইলেও শিঙ্গীর ঝোল খাইবার ব্যবস্থা আছে, তখন কর্ত্তাদের এই ব্যবহারকে দুষিতে পারি না। তবে, যে যুক্তিতে বুদ্ধিমানেরা মোটা দড়িগুলি রাখিতে চাহেন ও সরুগুলি ছিঁড়িতে চাহেন, তাহা সহজে বোঝা যায় না। রেলের প্রসাদে বিলাতের পুষ্টি হয় না অথবা টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিসের মত ইংরেজের গড়া অন্য দশটা ঠাট এদেশের টাকায় চলিতেছে না, একথা যখন বলা চলে না, তখন মনকে চোখ ঠারিবার যুক্তি না দিলেই ভাল হয়। সোজা কথায় বলিলেই ভাল হয়,—যাহা করা চলে না, মোড়লেরা তাহা করিবেন না।

নেতাদের বিচারে যাহা করা চলে, তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। হাকিম, উকিল,

ডাক্তার, কেরাণী প্রভৃতি নাকি আপনাদের কাজ ছাড়িবেন। তবে, এই কথাটার সঙ্গে একটা বড় রকমের 'যথাসম্ভব' জোড়া আছে বলিয়া, অনেক মোড়ল ও তাঁহাদের শিষ্যরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন, ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়াছে! এখন নেতাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ হইয়াছে, পাঠশালার ছেলেদের ঘাড়ের বোঝা নামাইয়া দেওয়া। বালকদের রথ দেখা বন্ধ হইবে কিন্তু হয়ত অন্য কোন হাটে কলা বেচা'কেনার ব্যবস্থা থাকিবে। এই বিষয়টি বড়; কাজেই ইহারই একটু আলোচনা করিব।

স্কুল, কলেজগুলি যে আমাদের টাকায় চলিয়াছে ও আমাদের টাকায় চলিতেছে, তাহা ত নিশ্চিত। ইংরেজের রাজত্ব উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, আমাদের সকলকেই মাল-গুজারি ও ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইতে হইবে; তাহার সঙ্গে, শিক্ষার ব্যয়ের জন্য দেয় টাকা জোড়া আছে। আমরা শিক্ষার ব্যয়ের জন্য টাকা দিব, আর সে টাকায় অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে অপরে, ও আমরা আবার টাকা তুলিয়া নূতন ঠাট তুলিব,—এই হইল নেতাদের সুযুক্তি। এই উদ্যোগে বখাট ছেলেদের মহলে রথ দেখার চেয়েও বড় রকমের উৎসবের পালা পড়িয়াছে।

যদি তর্কের খাতিরে এই মিথ্যাকথাটাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, এদেশের জ্ঞানের মন্দির গুলি ইংরেজদের লাভ-জনক ব্যবসায়ের কারখানা, তাহা হইলেও নিজের উন্নতির জন্য ও দেশের উন্নতির জন্য এ মন্দির গুলি যে ছাড়া চলে না, তাহা বলিতেছি। অতি বড় মূর্খেরা আপনাদের অসার দম্ভে যাহাই বলুক, যাঁহারা অতি অল্প পরিমাণেও সৃষ্টির বিকাশ পদ্ধতির ইতিহাস জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পৃথিবীতে মানুষের জ্ঞান প্রতিদিন উন্নত হইতে উন্নততর হইতেছে, ও অতি প্রাচীনকালের জ্ঞান, অতি বড় হইলেও, একালের জ্ঞানের তুলনায় ক্ষুদ্র। একথা লইয়া তর্কের ঝড় না তুলিয়াও সহজে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারা যায়। একালে আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি ও যে ভাবে বহু জাতির সংঘর্ষে বাস করিতে হইতেছে, তাহাতে, আপনাদিগকে বাঁচাইতে হইলে, একালের সকল বিভাগের জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। জ্ঞান জিনিষটি যে কোন দেশের বা কোন জাতির নিজস্ব নয়—পৃথিবীর যে কোন দেশেই উহার উৎপত্তি হউক—উহা যে বিশ্বব্যাপী স্বারস্বত-মন্দিরে উৎসর্গ করা সকলের উপ-ভোগ্য নৈবেদ্য, একথা কখনও ভুলিলে চলিবে না। নিজের কল্যাণের জন্য ও দেশের হিতের জন্য, এই জ্ঞান লাভের জন্য মানুষকে যে কোন দেশে যাইতে হইবে। স্বার্থের জন্য অর্থাৎ উন্নতির জন্য যখন ঘরের টাকা দক্ষিণা দিয়া বিলাতের মন্দির হইতেও জ্ঞান-সংগ্রহ করিতে হইবে, তখন জ্ঞানের মন্দির-গুলি ইংরেজের লাভের জন্যই যদি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে সে মন্দিরগুলিকে একঘ'রে করিব কেন?

মহাত্মারা সম্প্রতি শিক্ষা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া, ইংরেজি প্রভৃতি পরিহার করিয়া, কেবল প্রাচীনকালের সংস্কৃত পড়িতে অনুরোধ করিয়াছেন দেখিয়া, অনেক কথা বলিতে হইল। পুরুষের পক্ষে হউক, স্ত্রী-লোকের পক্ষে হউক, জ্ঞান-উপার্জ্জনে যে ক্ষুদ্রতা অবলম্বন করা চলে না,—স্বদেশী-গিরি চলে না, একথা নিরন্তর মনে রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—

প্রাচীরে রোধিয়া অবাধ অসীমে, বিশ্ব ঠেলিয়া দূরে,
রুদ্ধ ক্ষুদ্র কারার গর্ভে
পাবেনা সত্য, মিথ্যা গর্ব্বে;
বাড়িছে বৃহৎ, বাড়িছে মহৎ, নিখিল জগৎ পুরে।

নেতা মহাশয়েরা হয়ত বলিতে পারেন, যে তাঁহারা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি অপেক্ষা ভাল পদ্ধতি রচনা করিবার মতলব রাখেন। কিন্তু, সে পদ্ধতি যখন খাড়া করা হয় নাই, উহা ভাল হইবে কি মন্দ হইবে জানা যায় নাই, তখন গাছে উঠিবার আগেই এত বড় এক কাঁদি পাড়িয়া ফেলিলে কেন? বিদ্যালয়ের বালকদিগকে লেখাপড়া ছাড়াইয়া হুজুগে মাতাইলে কেন? উত্তরে হয় ত শুনিতে পাইব যে, ছাত্রেরা এ কালের বিদ্যালয়ে যাহাতে গোলামি-বুদ্ধি না শিখে, তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এই "গোলামি বুদ্ধি" কথাটা যে ইউরোপ থেকে ধার করিয়া আনা, এখনও সে ঐ কথাটা ইংরেজি ভাষায় slave mentality উচ্চারণে ব্যবহৃত হইতেছে, একালের ইউরোপীয় সাহিত্য পড়িয়াই যে আমরা তোতা পাখীর মত কথাটা আওড়াইতেছি, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। কি রকমের সামাজিক অবস্থায় ইউরোপে ঐ কথাটির জন্ম হইয়াছে, আর আমাদের এখনকার সামাজিক অবস্থা তাহার তুলনায় কিরূপ, তাহা এ প্রবন্ধে বিচার করা চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করিলে অনেকেই দেখিতে পাইবে যে, সামাজিক অবস্থার ফলে, আমাদের হাড়ে মাংসে 'গোলামি বুদ্ধি' জড়াইয়া আছে। আমরা এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীকে পায়ের তলায় দলিয়া, ও জানিয়া শুনিয়া অনেক কুপ্রথার দাসত্ব করিয়া, যে "গোলামি বুদ্ধি" পাকাইয়া তুলিয়াছি, তাহা দূর করিতে না পারিলে, ইউরোপীয় জাতির নিকটে ধার করা কথা আওড়াইয়া ও ইউরোপ-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়া, মানুষ হইতে পারিব না। কবির ভাষায় বলি—

পরের পরে কেন এ রোষ, নিজের'ই যদি শত্রু হোস!
তোদের এযে নিজের'ই দোষ!
আবার তোরা মানুষ হ।

এই যে বিপুল কংগ্রেস, দেশী ভাষায় নাম না থাকিলেও যাহা National বা জাতীয়, তাহার এ নূতন আন্দোলনকে কি বলিব? এই কংগ্রেসের একদল আবেদন নিবেদন' লইয়া পচিয়া গেল, আর এক দল তাজা পাগলামি লইয়া দেশটাকে হন্যা করিয়া তুলিল। এ অবস্থায় বলিতে পারি যে, শ্রেষ্ঠ "আড়ি" হইবে, কংগ্রেসের সঙ্গে **আড়ি**।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

যুগল-চিত্র।

১

না পড়িতে একটি নিমেষ
সব হল—সব হল শেষ!
মুছে ফেল সিঁথির সিঁদুর!
টুটে দাও শাঁখার বলয়!

জ্বাল জ্বাল জ্বাল তুষানল!
আমরণ দহিতে হৃদয়!
কেড়ে লও রাঙ্গা সাড়ী তার!
কেড়ে লও সব আভরণ!

শত মতে দল পদতলে!
একখানি ফুটন্ত জীবন!
এই ধর্ম্ম—এই লোকাচার!
আছে কার কিবা বলিবার?

২

না পড়িতে একটি নিমেষ
সব হল—সব হল শেষ!
বয়স তেমন বেশী নয়!
থাকুক্ না প্রপৌত্র-তনয়!
সাজাওরে বরণের ডালা!
লাগে গৃহ বড় শূন্যময়!
বাজাও বাজাও জয়-ঢাক!
মহোৎসব কর আয়োজন!
নর-শিশু দাও বলিদান!
পশু-তৃপ্তি করিতে সাধন!
এই ধর্ম্ম—এই লোকাচার!
আছে কার কিবা বলিবার!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

উদ্বাহ-তত্ত্ব।

মানব ইতিহাসের লিখিত বিবরণ বহু প্রাচীন নহে। মানুষ সভ্যতামার্গে অনেক দুর অগ্রসর হইলে তবে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির উৎপত্তির আদি ঘোর তমসাচ্ছন্ন। পণ্ডিতেরা অসভ্য জাতি সকলের আচার পদ্ধতি দেখিয়া ও অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের মধ্যে অসভ্য প্রথা সকলের উদ্বর্ত্তন আলোচনা করিয়া, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির উদ্ভবের ক্রম নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রণালী যে কষ্টসাধ্য এবং ইহাতে যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী, তাহা সহজেই অনুমেয়; অথচ অন্য কোন উপায়ও নাই। বর্ত্তমান সময়ে, আমরা যে সকল অসভ্য জাতি দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে অসভ্যতমও যে আদি মানব অপেক্ষা অনেক উন্নত, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, এই আদি মানব-সমাজ হইতেই আমাদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার পাইয়াছে।

ভ্রম নানা দিক্ দিয়া হইতে পারে। দুইটী বিভিন্ন সমাজে একই প্রথা দেখিয়া যদি মনে করি যে উহা একই প্রণালীতে উৎপন্ন ও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তবে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। অথচ, অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরও এই ভ্রম হইয়াছে। একটী প্রথা হয়তো এক সমাজে প্রাচীনের উদ্বর্ত্তন, অন্যত্র হয়তো উহা বিশেষ অবস্থানিচয়ের সমবায়ে নূতন উৎপন্ন। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোনও কোনও প্রথার উৎপত্তির কারণ, আদি মানবের অভ্রান্ত-সহজ-প্রবৃত্তি—Instinct. ইহা পশুপক্ষীতে অহরহই প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু পণ্ডিতেরা আকাশ পাতাল ভাবিয়া অনেক গবেষণার পর হয়তো এক অদ্ভূত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিলেন।

এই সর্ব্ব-জন-বিদিত বিবাহ-রূপ প্রতিষ্ঠানের কথাই ভাবা যাক্। যে পরিবারে মানবের জন্ম, সে পরিবারে "জোড়া মিল" প্রতিষ্ঠিত ছিল; অথবা, এক "পালের গোদার" বহুনারী ও সন্তানাদি লইয়া এমন এক মণ্ডলী ছিল, যাহার উপর অন্য পুরুষের কোন দাবী ছিল না। অবাধ-সমাগম (Promiscuity)

প্রচলিত ছিল না। তবে, আদির এই জোড়ামিলকে, একনিষ্ঠ বিবাহ বলিলেও ভুল বলা হইবে। এই জোড়ামিল পশুপক্ষীর মধ্যে—পশু অপেক্ষাও পক্ষীর মধ্যে—বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটী মঙ্গল বিধান, বিশেষতঃ উচ্চ-জীবের মধ্যে। উহা সহজ-প্রবৃত্তি-জাত। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, অবাধ সম্মিলনে ক্রমে ক্রমে জনন-শক্তি বিনষ্ট হইয়া, জাতি ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হয়। ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু, গরিল্লা শিম্পাঞ্জির মধ্যে এই বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা আছে, তাহা শুনা যায় না। অথচ, তাহাদের মধ্যে জোড়ামিলই বর্ত্তমান, অবাধ সম্মিলন নহে। এই জোড়ামিল ঘরে ঘরে স্থিরীকৃত হয়। ইহা দেখিয়া কেহ যদি ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ প্রচলিত করিতে চান, তবে তিনি সহজেই বলিতে পারেন যে, উহা মানবের অতি প্রাচীন ও 'সনাতন' ধর্ম্ম। আবার, যদি কেহ বলেন, কোন কোন সভ্যসমাজেও যে ভাইবোনের বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা ইহারই 'স্মৃতির' উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা হইলেই বা বলিবার কি আছে। একজন হেরড্ ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। ক্লিওপেট্রা স্বীয় ভ্রাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভারতীয় শাক্যবংশে নাকি ভ্রাতা ভগিনীতে বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন পারস্য রাজগণও ভগিনীকে বিবাহ করিতেন। এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রথা বর্ত্তমান। কোন কোন স্থলে এই প্রথা সংকীর্ণ হইয়া কেবল বৈমাত্রের ভগিনীতেই আবদ্ধ। এব্রাহাম বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করেন। ফিনিসীয়, আসিরীয় ও এথেনীয়দের মধ্যেও এই নিয়ম ছিল। মক্কায় ও কোন কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের (South Slavonian Mahomedan) মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত। কোন কোন স্থলে (Guatemala ও Yucatan) কেবল বৈপৈত্রেয় ভগিনীকেই বিবাহ করা চলে। ইহা জোড়ামিলেরই বৈজ্ঞানিক বা অ-বৈজ্ঞানিক সংস্করণ। কেন না, কেহ বলিবেন, এরূপ ঘনিষ্ঠ-বিবাহ বৈজ্ঞানিক—রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার ইহা প্রকৃষ্ট উপায়। কেহ বলিবেন, বিজ্ঞানসম্মত নয়, যেহেতু, এরূপ সংমিশ্রণে রক্তের হীনতা সম্পাদিত হইয়া উন্মাদ প্রভৃতি উৎপন্ন করে। নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

মানুষ কিন্তু জোড়ামিলের প্রথা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াও হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিঞ্চিৎ বয়স হইলে, মানুষ যে কারণেই হউক, এই স্বাভাবিক সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া অবধি, যৌন-সমাগম গ্রহণ করিয়াছিল। যে সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে বিবাহ-প্রতিষ্ঠার আখ্যায়িকা রক্ষিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই ইহার সাক্ষী। মহাভারতের নানা আখ্যায়িকার, বিশেষতঃ পাণ্ডু ও কুন্তীর কথোপকথনের মধ্যে, আদির স্বৈরাচার ও বিবাহ-প্রথার অবিদ্যমানতা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। চীনাদিগের মধ্যে কথা আছে যে, আদিতে স্ত্রীপুরুষের ব্যবহারে, মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য ছিল না। সুতরাং সন্তানগণ মাতা ছাড়া, পিতা যে আবার কে, তাহা জানিত না। সম্রাট ফো-হি (Fou-hi) বিবাহের প্রচলন করিয়া এই অবস্থার উন্নয়ন করেন। প্রাচীন মিসরে মেনিস্ (Menes) ও প্রাচীন গ্রীসে কেক্রপস্ (Kekrops) বিবাহ-প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ল্যাপ

ল্যাণ্ডবাসীদিগের মধ্যেও এই প্রবাদ যে, স্বাবিশ্ ও আর্ত্তজিস্ (Njavvis and Artjis) তাহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আদির জোড়ামিল হইতে বিবাহ বিকশিত হয় নাই। কিন্তু মানুষ সে জোড়ামিল তুলিয়া যে অবাধ সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারই পরিবর্ত্তন করিয়া, বিবাহের উৎপত্তি। বিবাহ-প্রতিষ্ঠার কারণ যে সব জায়গায় একই ঘটিয়াছিল, তাহাও নহে—কোথায়ও বৈজ্ঞানিক কারণে, কোথাও বা অর্থ-নৈতিক কারণে, কোথাও শারীরিক কারণে। কারণ আবার কোন স্থলে সামাজিক, কোন স্থলে বা ব্যক্তিগত; কোন স্থলে বা একাধিক কারণের সমবায়ে বিবাহ আবির্ভূত হইয়া থাকিবে।

এখানে আরও একটী কথা প্রণিধান যোগ্য। স্ত্রীপুরুষের জোড়ামিল লইয়া যখন মানুষের আবির্ভাব, তখন পারিবারিক জীবন লইয়াই যে মানব সমাজের জীবন যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐ জোড়ামিলের প্রথা নষ্ট না হইলে, মানব-সমাজ পরিবারেরই সমষ্টি হইত। কিন্তু পরিণামে তাহা হয় নাই। জোড়ামিলের স্থান যেমন অধিকার করে অবাধ-সম্মিলন, তেমনি পরিবারের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়—গণ বা গোষ্টি (clan বা tribe) বিবাহ আসিয়া যখন আবার জোড়ামিল প্রতিষ্ঠা করিল, তখন এই গণের একটা অংশই পরিবার আখ্যা প্রাপ্ত হইল। বর্ত্তমান পরিবার, গণের বিশ্লেষণ হইতে উৎপন্ন। এই যে শেষোক্ত জোড়ামিল—ইহাতেই বিবাহের সূত্রপাত।

অনেক বিবর্ত্তনে বিবাহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিবাহ-প্রথা বিকশিত হইতে সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। আদিতে যাহাকে বিবাহ বলা হইত, তাহাকে আমরা আর এখন বিবাহ নাম দিতে রাজী হইব না। সে তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয়, এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়, যাহা অনেকের কাছে রুচি-বিরুদ্ধ মনে হইবে। তাঁহারা বলিবেন, উহার আলোচনা না করাই ভাল। তাঁহাদের নিকটে এই মাত্র নিবেদন, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সত্য-গোপন ছাড়া অন্য অশিষ্টতা নাই।

মানুষ বর্ব্বরাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছে। জ্ঞানধর্ম্ম লইয়া একদিন হঠাৎ আকাশ হইতে ধুপ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হয় নাই। একদিন ছিল, যখন বাহিরের দৃষ্টিতে মানুষকে পশু হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। তখন পশু-জগৎ হইতে মানব-জগৎ স্বতন্ত্র ছিল না। যখন স্বতন্ত্র হইল, তখনও জ্ঞান এতটা পরিপক্ক হয় নাই যে, সন্তানোৎপাদনে যে আবার পিতার স্থান আছে, তাহা ধরা পড়িতে পারে। আহার পান যেমন প্রকৃতির তাড়নায় সম্পন্ন হয়, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণের জন্যই পশুপক্ষী যেমন আহার অন্বেষণ করে ও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, নরনারীও তেমনই সঙ্গত হইত। ইহাদ্বারা যে ধাত্রী প্রকৃতিদেবী আপনার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইতেন, ইহা পশুপক্ষী যেমন জানে না, এই আদিম মানুষও তাহা জানিত না। সুতরাং, পিতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয় নাই। এ জ্ঞানলাভ করিতে বহুদিন গিয়াছে। কিন্তু মাতৃত্বের জ্ঞান অপরিহার্য্য। সন্তান মাতৃ উদরে জন্মে ও পরিপুষ্ট হয়, ইহা ধরা পড়িতে

দেরী লাগে না। কাজেই সন্তানের উপর মায়ের দাবী, অপ্রতিহত ও অবিসম্বাদিত। এই আদিকাল হইতেই কিন্তু মাতৃকেন্দ্রিক (Matriarchal) সমাজ-ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তারপর যখন পিতৃত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও প্রথম প্রথম সন্তানকে মাতৃ-নামেই পরিচয় দিতে হইত। কেন না, আট্ঘাট্ বাঁধিয়া বিবাহ একদিনে প্রচলিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও যদি পিতৃনির্ণয় কষ্টসাধ্য হইত, তখন পুত্র মাতৃ-নামেই পরিচয় দিত—যেমন উপনিষদের জবলা-পুত্র জাবালি। নরনারী যখন অবাধে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইত, তখন পিতৃনির্ণয় অতি সুকঠিন, এমন কি অসম্ভব, কার্য্যই ছিল। সুতরাং, এই মাতৃ-কৈন্দ্রিক-ধারা তখনও অপ্রতিহত না থাকিয়া পারে নাই। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এই ধারা রহিয়াছে। মান্দ্রাজের নায়ারদের মধ্যে এখনও উহা প্রচলিত। উত্তরাধিকার কন্যাগত, পুত্রগত নহে। সন্তান কাহার ঔরসজাত তাহা নির্ণয় না হইলেও, কাহার গর্ভজাত তাহা নির্ণয় হইতে সময় লাগে নাই। সুতরাং, অধ্রুবকে পরিত্যাগ করিয়া, উত্তরাধিকার ধ্রুবেরই অনুসরণ করে। তবে, উহা প্রাচীন প্রথারই উদ্বর্তন, না বিশেষ অবস্থা সকলের সমবায়ে স্থান বিশেষে একটা বিশেষ ব্যবস্থার বিবর্তন, এই তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়াও এ কথা নিঃ সন্দেহে বলা যায়, যে উহা অন্ততঃ অধিকাংশ স্থলেই বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্মত মূল-প্রথা। মাতা তো জননী, এ বিষয়ে কোন দ্বিধাই নাই; কেন না, তিনি গর্ভ-ধারিনী। পিতাও তো জনক—সন্তানোৎ-পাদনে পিতৃত্বের স্থান মাতৃত্বের নিম্নে কিছুতেই নহে। তবে সন্তান কেবল মাতৃনামেই অভিহিত হইবে কেন? বিশেষতঃ, নারী যখন সব বিষয়েই হীন হইয়া পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিলেন, পুরুষ সর্ব্ব বিষয়েই যখন আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিল, তখন এই এক বিষয়ে নারীর আধিপত্য টিঁকিতে পারে নাই। তাই পিতৃকৈন্দ্রিক-ধারার (Patriarchal system) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইল। কিন্তু তখনও তো সুনিয়ন্ত্রিত বিবাহ প্রণালীর আবির্ভাব হয় নাই। বিবাহ আসিয়াছিল, কিন্তু নরনারীর অবাধ মেলা-মেশার পথ অব্যাহতই ছিল। নারী একমাত্র পুরুষেই আবদ্ধ থাকিবে, বিবাহের এই মন্ত্র তখনও উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং, যুক্তি তো এই কথাই বলিবে যে মাতৃকৈন্দ্রিক ধারাই প্রবাহিত থাকুক। কিন্তু নারীর এই প্রাধান্য, বোধ হয়, পুরুষের পক্ষে অসহ্য হইল। তাই যুক্তি যাহাতে সায় দিল না, কৌশলে তাহা সম্পন্ন করিবার আয়োজন হইল। যে পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত, নারী তাহারই ক্ষেত্র। জনক যিনিই হউন না কেন, যাঁহার ক্ষেত্রে জন্ম, সন্তান তাঁহারই, তাঁহারই নামে সে পরিচয় দিবে। ক্ষেত্র-নির্ণয়ে নাপিত পুরোহিত তো সাক্ষী আছে-ই। সুতরাং, কৌশলে নারীর অধিকার বিনষ্ট করিয়া, সেই উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক অবস্থারও পিতৃকৈন্দ্রিক-ধারা প্রচলিত হইল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মানব-সমাজ বিবাহ-প্রথা লইয়াই আবির্ভূত হয় নাই; সমাজ-বিবর্ত্তনে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, উহা ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান উন্নত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসের দিকে মহাভারতের আখ্যায়িকা তাহা প্রমাণ করিবে।

প্রথম আখ্যায়িকা।

পাণ্ডু-কুন্তী সংবাদ।

পাণ্ডু বলিলেন,—"সুন্দরি! ঋষিগণ যে প্রাচীন ধর্ম্মের কথা কহিয়া থাকেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বকালে মহিলা সকল স্বাধীন ছিল। যাহাকে ইচ্ছা হইত তাহারই সহবাস করিতে পারিত, তাহাতে স্বামী বা অন্য কাহারও আজ্ঞা অপেক্ষা করিত না। অবিবাহিতাবস্থায় তাহারা যাহা ইচ্ছা করিত, তাহাতেও কোন দোষ হইত না; কারণ, তখন ধর্ম্মই ঐ প্রকার ছিল। এক্ষণে, পশু-পক্ষীরা সেই প্রাচীন ধর্ম্মের অনুগমন করে, তজ্জন্য কেহ কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হয় না। ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, এই ধর্ম্ম প্রমাণসিদ্ধ; সুতরাং, তাঁহারা উহার সম্মানও করেন। উত্তরকুরু-দিগের মধ্যে ঐ ধর্ম্ম অদ্যাপি প্রচলিত ও আছে। উহা অতি প্রাচীন ও মহিলাদিগের পক্ষে সাতিশয় অনুকূল"। (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২২)

দ্বিতীয় আখ্যায়িকা।

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

উদ্দালক নামে এক ঋষি ছিলেন। মহা-তপস্বী শ্বেতকেতু তাঁহার পুত্র। একদিন শ্বেতকেতু পিতা মাতার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "যুবতি! আমার সমভিব্যাহারে চল।" দ্বিজ এই কথা বলিয়া যেন বল-প্রকাশ করিয়াই তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহা দেখিয়া শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, "পুত্র! কোপ করিও না; অতি প্রাচীনকাল অবধি এই সনাতন-ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে সর্ব্ব-বর্ণের কামিনী-রাই স্বাধীন। মনুষ্য সকল সমান-বর্ণ মহিলাতে গো-সদৃশ আচরণ করে। যে যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহাকেই সম্ভোগ করিতে পারে"। উদ্দালক পুত্রকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শ্বেতকেতু এই ধর্ম্মের অনুমোদন করিলেন না। প্রত্যুত ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এই সীমা নির্দ্দেশ করিলেন যে, আজি হইতে যে নারী স্বামীকে অতিক্রম করিয়া অন্য পুরুষের সহবাস করিবে, সে ভয়ানক দুঃখের নিদান ভূত-প্রাণ-হত্যা-পাতকে নিমগ্ন হইবে। যে পুরুষ পতি-ব্রতা ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া অন্যনারীর সহবাস করিবে, সেও উক্ত পাপের ভাগী হইবে। আর যে পত্নী পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহাকেও প্রাণঘাতিনী হইতে হইবে।"

তৃতীয় আখ্যায়িকা।

দীর্ঘতমার বিবরণ।

ঋষি দীর্ঘতমা, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা, উতথ্যের পুত্র। তিনি অন্ধ ছিলেন ও স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিতে পারিতেন না। বরং স্ত্রীকেই তাঁহার ভরণপোষণ করিতে হইত; এই "বৃহস্পতি-তুল্য তেজস্বী উতথ্য-সন্তান" ঋষি দীর্ঘতমার আর যে যে দোষ ছিল, তাহা মহাভারত পাঠ করিলেই জানা যাইবে; তাহার পুনরুক্তি চলে না। তাঁহার পত্নী তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে আর তিনি তাঁহার ভরণ করিবেন না। তখন দীর্ঘতমা বলিলেন,—"আমি আজ হইতে পৃথিবীতে এই সদাচার নির্দ্দেশ করিলাম, পত্নী মরণকাল পর্য্যন্ত একমাত্র স্বামীকেই

পরমাগতি বলিয়া জ্ঞান করিবে। পতি জীবিত থাকুন, আর পরলোকেই গমন করুন, ভার্য্যা কখনই অন্য পুরুষের সংসর্গ করিতে পারিবে না। যে নারী এই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে, সে নিশ্চয়ই পতিত হইবে।"

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৫)

আমাদের প্রথম কথা—বিবাহের এক-নিষ্ঠতার নিয়মগুলির বিবর্ত্তনে নারীরই আটঘাট বাঁধিয়া দেওয়া হইল, পুরুষের বেলায় পথ খোলাই রহিল। সুতরাং, বিবর্ত্তন এই-খানে থামিতে পারে না। উভয়তঃ এক-নিষ্ঠ-তায় প্রতিষ্ঠানেই বিবাহ-বিবর্ত্তনের পরাকাষ্ঠা। নতুবা, একপেশে নিয়মে নিয়ম রক্ষিত হয় না। দীর্ঘতমা স্বয়ং ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি নারীর পক্ষে এই সকল কঠোর ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু নিজেই তাহা ভঙ্গ করিলেন। একপেশে নিয়ম, আত্মঘাতী।

আমাদের দ্বিতীয় কথা—ভারতের বিবাহ বিবর্ত্তনের আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, একটী সনাতন-ধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে (প্রথম ও দ্বিতীয় আখ্যায়িকা), সকলের রক্তই সকলের শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখন তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। সুতরাং, পেটেল বিল লইয়া যে হাঙ্গামা, তাহা হিন্দুর সনাতন-ধর্ম্মের বিরোধী হইতেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

প্রেরণা।

তুলি শির আজি না পারি দাঁড়াতে
নত হয়ে রহি তাই,
এ জীবন লয়ে কিসের গৌরব
এ যেন শ্মশান ছাই।
জীবনের সেই প্রতিভা কোথায়
কোথা বা উদ্যম আর ?
কোথা দয়া ধর্ম্ম দান ত্যাগশীল
রহে হৃদি ক'ণ্ডনার ?
হেরি' আচরণ, জাগে শুধু মনে,
ধরণী নেশার ঠাঁই,
বসন ভূষণ, বাক্য বাহাদুরী
সহায় সম্বল তাই।
ভুলে গেছি হায় ! কেন এসেছিনু
কেন এ জীবন আর ?
তাই খাঁটি ছেড়ে মোহ-পঙ্ক-স্রোতে
ভেসে মোরা অনিবার,

শিক্ষা অভিমানে হয়ে গরীয়াণ
তুলি যবে ধীরে শির,
শত স্মৃতি জাগি' লজ্জা অনুতাপে
বহে যে নয়ন নীর।
তারা ও রমণী, মোরা ও রমণী,
কাদের গৌরবে জাগি ?
কাহাদের নাম স্মরিয়া প্রভাতে
নিয়ত কল্যাণ মাগি ?
কোথা সেই "খনা", যাহার বচন
আজিও সকল ঘরে ?
কোথা এবে "গার্গী", পণ্ডিত-সমাজ
পরাজয় যাঁর করে ?
"উভয় ভারতী" কোথা বল আজি
পতির দাসত্ব-হারী,
ভারত-বিজয়ী শঙ্করে হারালে
জ্ঞান বলে যেই নারী ?

কোথায় "পদ্মিনী", সতীর সম্মান
প্রাণ সঁপি রাখে যেবা ?
নিজ পুত্র-মাংসে "পদ্মাবতী" সমা
কে করে অতিথি সেবা ?
কোথায় "গান্ধারী", হৃদি-বল যাঁর
চির-অতুলন ভবে,
"ধর্ম্মজয়" মাগি ভীম রণে যেবা
প্রেরিলা সন্তান সবে ?
কোথায় "সুমিত্রা" সপত্নী পুত্রের
আরাম-কারণ তরে,
আপন আত্মজে অকাতরে যেবা
কাননে প্রেরণ করে ?
কোথা "কুন্তী" আজি দুর্ব্বলে রক্ষিতে
পুত্রে দেয় অরি ঠাঁই ?
ধর্ম্মে পাগলিনী কোথা রহে এবে
বিভু-গতা "মীরাবাই" ?
রাজেন্দ্রানী হয়ে "ক্ষেমা" সম কেবা
নিয়েছে সেবার ব্রত ?
কাঙ্গালের অন্ন জোগাতে ব্যাকুল
কে রহে "বিশাখা" মত ?
তারাও রমণী মোরাও রমণী,
কতদূর ব্যবধান,—
ক'জনার মাঝে রয়েছে এখন
যাহারে বুঝায়—"প্রাণ" ?
আপনারে লয়ে বিব্রত মোরা যে
ধারিনা কাহারো ধার।
কাজ হতে হায়! বাহ্য-আড়ম্বর
কথাই মোদের সার!
উন্নতির যদি একান্ত বাসনা
ভগিনী! মোদের রয়,
নিস্বার্থ-কৃপাণে হইবে নাশিতে
স্বার্থ-রাশি সমুদয়।

"পর" "পর" ভাবি কেন যাই সরে
কেহ নাহি "পর" ভবে,
একই মায়ের মোরা যে সন্তান,
কেন ভেদাভেদ তবে ?
ধরণী মোদের হয় কর্ম্মভূমি
এ যে গো আবাস নয়,
জীবনের ব্রত হইবে সাধিতে
জননী-আদেশ রয়।
সবারি ব্যথায় ঝরিবে নয়ন
সুখেতে লভিব প্রীতি,
যেটুকু শকতি হিত-কামনায়
নিয়োজিব তাই নিতি।
অধীন অবলা যদিও রমণী
হৃদয়ে শকতি রয়,
হৃদয়ের গতি রোধিতে ধরায়
কারো যে শকতি নয়।
নতশির আরো করি অবনত
মায়ের ও রাঙ্গাপায়,
মোদের সে সব "হারাণ-ভূষণ"
এস! মাগি পুনরায়।
হে বিশ্বজননী! দুরবল মোরা
চলিতে অক্ষম ভবে,
বিতর করুণা, আপনার পদে
দাঁড়াই যেন হে সবে।
চলিতে সংসারে প্রতি পদক্ষেপে
যেন হে নয়ন আগে,
তোমারি মধুর মোহিনী মুরতি
নিয়ত মোদের জাগে।
এ হৃদয় হোক্ পূজার মন্দির
তোমারি অর্চ্চনা তরে,
ও রাঙ্গা চরণে ভকতি কমল
বিকাশি যেন গো পড়ে।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

৺ পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ইংরাজী ১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারী, গত ১৭ই পৌষ শনিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময়, বাঙ্গলা সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ও সুহৃদ্, "সাহিত্য" পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৫১ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বাল্যকালে মাতামহ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেশচন্দ্রকে ইংরাজী-প্রধান শিক্ষার পথ হইতে দূরে রাখিয়া, সংস্কৃত-প্রধান অধ্যয়ন প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। বয়সে, তিনি ইংরাজী নিজেই শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যরথীদিগের গ্রন্থনিচয় পাঠ করিয়াছিলেন। বাল্যের সংস্কৃত চর্চ্চা তাঁহাকে যৌবনের প্রারম্ভেই সাহিত্য-রসের অনুরাগী করিয়াছিল। এবং সেই অনুরাগের ফলেই তাঁহার "সাহিত্য" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। "সাহিত্যের" প্রথম কয়েক বৎসর, তাঁহার যৌবনের বন্ধু সকলেই সাহিত্য-সেবার জন্য উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহাদের যে দলটীর ভাব-বিনিময়ে "সাহিত্য" সৃষ্টি, সেই দলটীর অনেকেই বৃত্তির জন্য অন্য পথে গিয়াও আজীবন সেই সাহিত্য-সেবা ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"স্বদেশীর" সময় সুরেশচন্দ্রের বাগ্মিতা শক্তির উন্মেষ হয়। আমাদের মনে পড়ে, ৺নন্দলাল বসুর বাটীতে বিজয়া-সম্মিলনের দিন—সেইদিন প্রথম সুরেশচন্দ্রই বক্তৃতার মুখে বলেন, "বন্দে মাতরম্" বাঙ্গলার নবযুগের মন্ত্র, বঙ্কিমচন্দ্র সেই মন্ত্রের ঋষি। সেইদিন প্রথম আগ্নেয় গিরির স্রাবের মত সেই জ্বালাময়ী ভাষা, কত না বেদনা ভরা, আশা ভরা, আকাঙ্ক্ষা ভরা, উৎসাহ ভরা, প্লাবনে শ্রোতৃবৃন্দকে স্নাত করিয়া দিয়াছিল। সেইদিন প্রথম সুরেশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছিলেন, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত বহুল ভাষার যে এতটা প্রাণের স্পন্দন আছে, এতটা তেজের ইন্ধন আছে, এতটা উন্মাদনার আবেগ আছে, তাহা ত ইতিপূর্ব্বে কেহ জানাইতে পারে নাই। তাহার পর হইতে, সুরেশচন্দ্র তাহার সেই অননুকরণীয় ভাষায় অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় অকালে সেই ভাষার উৎস শুখাইয়া গেল!

ক্রমান্বয়ে প্রায় ১৮ বৎসর ধরিয়া নানা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার সহিত সুরেশচন্দ্র সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "সুরভি ও পতাকা," "প্রতিবাসী," "সন্ধ্যা," "বসুমতী," "নায়ক"- যখন যে পত্রিকাতেই লিখিতেন, তাঁহার সেই সরল ব্যঙ্গ ও সেই জ্বালাময় শ্লেষ, তাঁহার লেখার ঢংকে অন্য সকল লেখা হইতে বৈশিষ্ট্য দান করিত। অমিত্রাক্ষরে সাময়িক প্রসঙ্গের যে বিশ্লেষণ বাহির হইত, তাহা বঙ্গভাষায় অতুলনীয়, উপভোগের সামগ্রী। আর "সাহিত্যে" মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি, গভীর বেদনাবোধ ও যথোপযুক্ত কষাঘাতের সহিত তাঁহার যে সাহিত্য-বিহিতকার্য্য ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষিত হইত, আক্ষেপ হয়, বোধ হয় বা, তাহা তাঁহার সহিতই তিরোধান হয়। এই সমালোচনা লইয়া তাঁহার সহিত অনেকের মনান্তর ও মতান্তর হইয়াছে, কিন্তু তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থা—"হিতং

মনোহারি চ দুর্ল ভং বাঃ”—পরিত্যাগ করেন নাই, বুঝিবা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেননা সুরেশচন্দ্র মাতামহের একটা বিরাট গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাহার মনে এক, ও আচার ব্যবহার কথায় অন্য এক মানুষ ছিল না। দেহে মনে, অন্তঃকরণে, কথায়, বাগ্মিতায়, ব্যবহারে তিনি বিরাট সাধনা করিতেন, এবং সেইজন্য সর্ব্ব-প্রকার স্বদেশ-সেবার কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১শে পৌষ, বুধবারের 'নায়কে' যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিবার যোগ্য—

সুরেশচন্দ্র ত লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। আমাদের দৈনিক নায়কের পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে গোটা কয়েক কথা বলা প্রয়োজন বুঝিয়াই এই আহত শয্যাশায়ী অবস্থায় মনের কথা ব্যক্ত করিতে হইতেছে।

সুরেশ সত্যই আমাদের সহোদর সদৃশ ছিল। ভাই ভাই ঝগড়াও হইয়াছে. ভাবও হইয়াছে। লেখালেখিও চলিয়াছে, কথা কাটাকাটিও হইয়াছে। সে ত জীবনের লীলা খেলা,—সে ত মমত্বের পরিচায়ক। সে বাঁচিয়া থাকিয়া যদি কেবলই ঝগড়া করিত, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যধিক মাত্রায় আনন্দ-দায়ক হইত। তাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিলেও একটা সুখ ছিল। সে সুখে এইবার জীবনের বাকী কয়টা দিন বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইল। ইন্দ্রনাথ, কাব্য-বিশারদ, যোগেন্দ্রচন্দ্র আর সুরেশচন্দ্র,—এই কয়জনের সহিত কলম বাজীতে একটু অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করা যাইত। শেষ সুরেশচন্দ্র ছিলেন, তিনিও চলিয়া গেলেন। সুরেশচন্দ্র সংস্কৃত জানিতেন, অলঙ্কার শাস্ত্রও একটু পড়া ছিল, রঙ্গব্যঙ্গের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা তিনি বুঝিতে পারিতেন। পাল্টা জবাবও দিতে জানিতেন। তাই বলিতেছিলাম, সুরেশ শতায়ু হইয়া এই সংসারে থাকিয়া আমাদের সহিত কলমবাজী করিল না কেন?

দৈনিক নায়ক যখন ৺হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পত্তি হইয়াছিল, তাহার কয়েক মাস পরেই সুরেশ দৈনিক নায়কের সহযোগী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহযোগিতায় নায়ক সত্যই অনেক বিষয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অমন গদ্য ও পদ্য লেখক ত আর পাইব না। অমন অনুভবী রসিক ত আর ছিল না। একটু ইসারায় ইঙ্গিত পাইলেই সে ব্যাপারটা সব বুঝিয়া লইত, এবং অতি উজ্জ্বল ভাষায় সরস ভঙ্গীতে তাহা লিখিয়া দিতে পারিত। সুরেশের সহিত সংবাদপত্রের লিখন-ভঙ্গীর একটা ধারা চলিয়া গেল। সে পদ্ধতি বা ধারা নকল করিবার নহে। ভিতরে একটু বিশিষ্টতা না থাকিলে লেখার মধ্য দিয়া সেটুকু ফুটিয়া উঠে না। সুরেশের মৃত্যুতে দৈনিক নায়কও ক্ষতিগ্রস্ত হইল,—একটা বড় জাঁদাল লেখক হারাইল।

সত্যই সুরেশের মত আর গদ্য লেখক পাইব না। অমন সুমার্জ্জিত ব্যাকরণ-শুদ্ধ অথচ শব্দ-সম্পদে নিত্য প্রফুল্ল ভাষা ইদানীং আর ত কাহারও লেখনী মুখে নিঃসৃত হইতে দেখি না। সুরেশ রসিক ছিল; বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের সনাতন রস-প্রবচন গুলি তাহার আয়ত্ত ছিল, এবং যথা স্থানে সে সকলের প্রয়োগ করিতে জানিত। সুরেশ স্পষ্টবাদী তেজস্বী লেখক ছিল। উপকারক বন্ধুকেও সে যুক্তিযুক্ত কথা শুনাইতে সঙ্কোচ করিত না। খবরের কাগজের মহল হইতে বিধাতা তাহাকে সরাইয়া লইয়া বাঙ্গালার সংবাদপত্র সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিলেন। যে ধারা 'সুলভ সমাচার' হইতে'নায়ক' পর্য্যন্ত নানা ভঙ্গীতে বহিয়া আসিতেছিল, তাহা যে অনেকটা শুকাইয়া গেল, সত্যের খাতিরে এটুকু আমরা বলিতে বাধ্য। সুরেশ ফুটিয়াছিল তিন কাগজে। প্রথম সন্ধ্যায়, দ্বিতীয় সাপ্তাহিক বসুমতীতে, তৃতীয় নায়কে। ইহা ছাড়া অন্য অনেক কাগজের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলেও, সুরেশের লিখন ভঙ্গীর বিশিষ্টতা আর কোথাও তেমন প্রকট ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সুরেশ চলিয়া গেল, তাহার স্থান অধিকার করিবার মানুষ আর ত দেখিতে পাই না।

আবার বলি, সত্যই সুরেশ আমাদের সহোদর সদৃশ ছিল। সে আজ পঁচিশ বৎসরের অধিককালের কথা; তখন আমি সবেমাত্র বঙ্গবাসীর সম্পাদক বিভাগে যোগ দিয়াছি। সেই ১৮৯৫ সাল হইতে তাহার সহিত সুখে দুঃখে, সাফল্যে বিফলতায়, সম্মিলিত থাকিয়া দিন কাটাইয়াছি। অমন জাক

ছিল না, যাহাতে উভয়ে এক সঙ্গে কাজ করি নাই। সুরেশ যেমন লেখক ছিল, তেমন বক্তাও ছিল। সে বক্তৃতা করিতে গোড়ায় একেবারেই পারিত না। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় সে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করে। পরে এমনই ভাল বক্তা হইয়াছিল যে, লোকে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর বক্তা বলিয়া গণনা করিত। ইহা কম বাহাদুরীর কথা নহে। দশ বৎসরের চেষ্টায় একেবারে অগ্রণী বক্তা বলিয়া পরিচিত হওয়া অপূর্ব্ব মনীষারই পরিচায়ক।

সুরেশের "সাহিত্য" সুরেশের কৃতিত্বের বড় পরিচায়ক। সাহিত্য ত বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র ছিলই,—কেবল তাহাই নহে, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন ও নবজীবনের ধারা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। সাহিত্যের কল্যাণে, সাহিত্য-পত্রে মগ্ন করিয়া অনেক গদ্য পদ্য লেখক বাঙ্গালার বিজ্ঞজন সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। বুঝি বা সুরেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের সাহিত্যও লোপ হয়।

সুরেশ চলিয়া গিয়াছে। তাহার গণা দিন শেষ করিয়া, তাহার কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া, সে চলিয়া গিয়াছে। আমরা যে কয়জন আছি, জীবনের বাকী কয়টা দিন তাহার কথা কহিব, তাহার জন্ত তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করিব। যদি বাঙ্গালার এই অভিনব সাহিত্য টিকে, যদি বাঙ্গালার সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে হয় ত দূর ভবিষ্যতে সুরেশের স্মৃতি উজ্জ্বল হইলেও হইতে পারে। কারণ, সুরেশ যে সাগর-বক্ষের একটা বড় বুদ্বুদ্ ছিল। বিদ্যাসাগর হইতে ভাব-সাগর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গের যে সাহিত্যসাগর বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। তাহার উপর সুরেশ যে একটা বড় বুদ্বুদ্ ছিল। কাজেই বলিতে হয় এ সাহিত্যের যখন আদর হইবে, তখন হয় ত সুরেশের নাম আবার জাগিয়া উঠিবে। এখন সম্মুখে রাজনৈতিক কর্ম্মসপূর্ণ বিপ্লববাদের উৎকট বন্যা আসিতেছে। সে বন্যা-মুখে কোন্‌টা থাকিবে কোন্‌টা ভাসিয়া যাইবে, তাহা বলা কঠিন। তাই আমরা যতদিন আছি, ততদিন সুরেশের অভাব অনুভব করিব; তাহার কথার আলোচনা করিব; শেষে আমাদিগকেও ডুবিতে হইবে।

পরিশেষে, পরমারাধ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সুরেশের মাতা ঠাকুরাণীকে আমরা কি বলিয়া প্রবোধ দিতে পারি, বুঝিতেছি না। তাহার জীবনের সন্ধ্যাকালে এই অতি বড় নিদারুণ শোক বহন করিবার একমাত্র শক্তি সামর্থ্য সেই শ্রীহরিই বিধান করিতে পারেন। মানুষের কথায় সে কষ্ট, যে যন্ত্রণা উপশম হইবার নয়; সে জ্বালা নিভিবার নয়। তিনি দুইটী পুত্ররত্নের অধিকারিণী ছিলেন—সুরেশ ও জ্যোতিশ। বেশী দিন নয়, জ্যোতিশ মায়ের কোল অর্দ্ধ-রিক্ত করিয়াছিলেন; এখন বিধাতা সুরেশকে লোকান্তরে লইয়া গিয়া মাতৃ অঙ্ক একেবারেই শূন্য করিলেন। মাতৃদেবীর এই শোকদগ্ধ প্রাণে তিনি এখন শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন, এই সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

মাতৃরূপে হেরি তোমা বাৎসল্যের খনি।
তুমিই হইবা মাত্র, সন্তান স্নেহের পাত্র
তার সুখ শান্তি তরে কিনা কর তুমি;
ত্যাগের জীবন্ত-মূর্ত্তি সাজগো জননি!
যতদিন বেঁচে থাক এমর্ত্ত-জগতে
সন্তান-কল্যাণ তরে, তোপ সুখ রেখে দূরে,
যত্ন কর অনিবার ক্লান্তি নাহি চিতে;
এত সহিষ্ণুতা প্রেম না হেরি মহীতে।
দয়াময়ী প্রেমময়ী নিঃস্বার্থ হৃদয়;
মাতৃরূপে নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

মনোহারি চঞ্চলং বাঃ"—পরিত্যাগ করেন নাই, বুঝিবা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেননা সুরেশচন্দ্র মাতামহের একটা বিরাট গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাহার মনে এক, ও আচার ব্যবহার কথায় অন্য এক মানুষ ছিল না। দেহে মনে, অন্তঃকরণে, কথায়, বাগ্মিতায়, ব্যবহারে তিনি বিরাট সাধনা করিতেন, এবং সেইজন্য সর্ব্বপ্রকার স্বদেশ-সেবার কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১শে পৌষ, বুধবারের 'নায়কে' যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিবার যোগ্য—

সুরেশচন্দ্র ত লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। আমাদের দৈনিক নায়কের পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে গোটা কয়েক কথা বলা প্রয়োজন বুঝিয়াই এই আহত শয্যাশায়ী অবস্থায় মনের কথা ব্যক্ত করিতে হইতেছে।

সুরেশ সত্যই আমাদের সহোদর সদৃশ ছিল। ভাই ভাই ঝগড়াও হইয়াছে, ভাবও হইয়াছে। লেখালেখিও চলিয়াছে, কথা কাটাকাটিও হইয়াছে। সে ত জীবনের লীলা খেলা,—সে ত মমত্বের পরিচায়ক। সে বাঁচিয়া থাকিয়া যদি কেবলই ঝগড়া করিত, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যধিক মাত্রায় আনন্দদায়ক হইত। তাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিলেও একটা সুখ ছিল। সে সুখে এইবার জীবনের বাকী কয়টা দিন বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইল। ইন্দ্রনাথ, কাব্যবিশারদ, যোগেন্দ্রচন্দ্র আর সুরেশচন্দ্র,—এই কয়জনের সহিত কলম বাজীতে একটু অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করা যাইত। শেষ সুরেশচন্দ্র ছিলেন, তিনিও চলিয়া গেলেন। সুরেশচন্দ্র সংস্কৃত জানিতেন, অলঙ্কার শাস্ত্রও একটু পড়া ছিল, রঙ্গব্যঙ্গের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা তিনি বুঝিতে পারিতেন। পাল্টা জবাবও দিতে জানিতেন। তাই বলিতেছিলাম, সুরেশ শতায়ু হইয়া এই সংসারে থাকিয়া আমাদের সহিত কলমবাজী করিল না কেন?

দৈনিক নায়ক যখন ৺হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পত্তি হইয়াছিল, তাহার কয়েক মাস পরেই সুরেশ দৈনিক নায়কের সহযোগী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহযোগিতায় নায়ক সত্যই অনেক বিষয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অমন গদ্য ও পদ্য লেখক ত আর পাইব না। অমন অনুভবী রসিক ত আর ছিল না। একটু ইসারায় ইঙ্গিত পাইলেই সে ব্যাপারটা সব বুঝিয়া লইত, এবং অতি উজ্জ্বল ভাষায় সরস ভঙ্গীতে তাহা লিখিয়া দিতে পারিত। সুরেশের সহিত সংবাদপত্রের লিখন-ভঙ্গীর একটা ধারা চলিয়া গেল। সে পদ্ধতি বা ধারা নকল করিবার নহে। ভিতরে একটু বিশিষ্টতা না থাকিলে লেখার মধ্য দিয়া সেটুকু ফুটিয়া উঠে না। সুরেশের মৃত্যুতে দৈনিক নায়কও ক্ষতিগ্রস্ত হইল,—একটা বড় জাঁদাল লেখক হারাইল।

সত্যই সুরেশের মত আর গদ্য লেখক পাইব না। অমন সুমার্জ্জিত ব্যাকরণ-শুদ্ধ অথচ শব্দ-সম্পদে নিত্য প্রফুল্ল ভাষা ইদানীং আর ত কাহারও লেখনী মুখে নিঃসৃত হইতে দেখি না। সুরেশ রসিক ছিল; বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের সনাতন রস-প্রবচন গুলি তাহার আয়ত্ত ছিল, এবং যথা স্থানে সে সকলের প্রয়োগ করিতে জানিত। সুরেশ স্পষ্টবাদী তেজস্বী লেখক ছিল। উপকারক বন্ধুকেও সে যুক্তিযুক্ত কথা শুনাইতে সঙ্কোচ করিত না। খবরের কাগজের মহল হইতে বিধাতা তাহাকে সরাইয়া লইয়া বাঙ্গালার সংবাদপত্র সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিলেন। যে ধারা 'সুলভ সমাচার' হইতে'নায়ক' পর্য্যন্ত নানা ভঙ্গীতে বহিয়া আসিতেছিল, তাহা যে অনেকটা শুকাইয়া গেল, সত্যের খাতিরে এটুকু আমরা বলিতে বাধ্য। সুরেশ ফুটিয়াছিল তিন কাগজে। প্রথম সন্ধ্যায়, দ্বিতীয় সাপ্তাহিক বসুমতীতে, তৃতীয় নায়কে। ইহা ছাড়া অন্য অনেক কাগজের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলেও, সুরেশের লিখন ভঙ্গীর বিশিষ্টতা আর কোথাও তেমন প্রকট ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সুরেশ চলিয়া গেল, তাহার স্থান অধিকার করিবার মানুষ আর ত দেখিতে পাই না।

আবার বলি, সত্যই সুরেশ আমাদের সহোদর সদৃশ ছিল। সে আজ পঁচিশ বৎসরের অধিককালের কথা; তখন আমি সবেমাত্র বঙ্গবাসীর সম্পাদক বিভাগে যোগ দিয়াছি। সেই ১৮৯৫ সাল হইতে তাহার সহিত সুখে দুঃখে, সাফল্যে বিফলতায়, সম্মিলিত থাকিয়া দিন কাটাইয়াছি। অমন আর

ছিল না, যাহাতে উভয়ে এক সঙ্গে কাজ করি নাই। সুরেশ যেমন লেখক ছিল, তেমন সদ্বক্তাও ছিল। সে বক্তৃতা করিতে গোড়ায় একেবারেই পারিত না। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় সে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করে। পরে এমনই ভাল বক্তা হইয়াছিল যে, লোকে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর বক্তা বলিয়া গণনা করিত। ইহা কম বাহাদুরীর কথা নহে। দশ বৎসরের চেষ্টায় একেবারে অগ্রণী বক্তা বলিয়া পরিচিত হওয়া অপূর্ব্ব মনীষারই পরিচায়ক।

সুরেশের "সাহিত্য" সুরেশের কৃতিত্বের বড় পরিচায়ক। সাহিত্য ত বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র ছিলই,—কেবল তাহাই নহে, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন ও নবজীবনের ধারা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। সাহিত্যের কল্যাণে, সাহিত্য-পত্রে মস্ক করিয়া অনেক গদ্য পদ্য লেখক বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। বুঝি বা সুরেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের সাহিত্যও লোপ হয়।

সুরেশ চলিয়া গিয়াছে। তাহার গণা দিন শেষ করিয়া, তাহার কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া, সে চলিয়া গিয়াছে। আমরা যে কয়জন আছি জীবনের বাকী কয়টা দিন তাহার কথা কহিব, তাহার জন্ম তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করিব। যদি বাঙ্গালার এই অভিনব সাহিত্য টিকে, যদি বাঙ্গালার সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে হয় ত দূর ভবিষ্যতে সুরেশের স্মৃতি উজ্জ্বল হইলেও হইতে পারে। কারণ, সুরেশ যে সাগর-বক্ষের একটা বড় বুদ্বুদ্ ছিল। বিদ্যাসাগর হইতে ভাব-সাগর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গের যে সাহিত্যসাগর বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। তাহার উপর সুরেশ যে একটা বড় বুদ্বুদ্ ছিল। কাজেই বলিতে হয় এ সাহিত্যের যখন আদর হইবে, তখন হয় ত সুরেশের নাম আবার জাগিয়া উঠিবে। এখন সম্মুখে রাজনৈতিক কর্ম্মযপূর্ণ বিপ্লববাদের উৎকট বন্যা আসিতেছে। সে বন্যা-মুখে কোন্‌টা থাকিবে কোন্‌টা ভাসিয়া যাইবে, তাহা বলা কঠিন। তাই আমরা যতদিন আছি, ততদিন সুরেশের অভাব অনুভব করিব; তাহার কথার আলোচনা করিব; শেষে আমাদিগকেও ডুবিতে হইবে।

পরিশেষে, পরমারাধ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সুরেশের মাতা ঠাকুরাণীকে আমরা কি বলিয়া প্রবোধ দিতে পারি, বুঝিতেছি না। তাহার জীবনের সন্ধ্যাকালে এই অতি বড় নিদারুণ শোক বহন করিবার একমাত্র শক্তি সামর্থ্য সেই শ্রীহরিই বিধান করিতে পারেন। মানুষের কথায় সে কষ্ট, যে যন্ত্রণা উপশম হইবার নয়; সে জ্বালা নিভিবার নয়। তিনি দুইটী পুত্ররত্নের অধিকারিণী ছিলেন—সুরেশ ও জ্যোতিশ। বেশী দিন নয়, জ্যোতিশ মায়ের কোল অর্দ্ধ-রিক্ত করিয়াছিলেন; এখন বিধাতা সুরেশকে লোকান্তরে লইয়া গিয়া মাতৃ অঙ্ক একেবারেই শূন্য করিলেন। মাতৃদেবীর এই শোকদগ্ধ প্রাণে তিনি এখন শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন, এই সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

মাতৃরূপে হেরি তোমা বাৎসল্যের খনি।
তুমিষ্ট হইবা মাত্র, সন্তান স্নেহের পাত্র
তার সুখ শান্তি তরে কিনা কর তুমি;
ত্যাগের জীবন্ত-মূর্ত্তি সাজগো জননি!
যতদিন বেঁচে থাক এমর-জগতে
সন্তান-কল্যাণ তরে, ভোগ সুখ রেখে দূরে,
যত্ন কর অনিবার ক্লান্তি নাহি চিতে;
এত সহিষ্ণুতা প্রেম না হেরি মহীতে।
দয়াময়ী প্রেমময়ী নিঃস্বার্থ হৃদয়;
মাতৃরূপে নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

ভগ্নীরূপে নারী তুমি কত ভালবাস,
তৃপ্তকর স্নেহদানে, যে পেয়েছে সেই জানে,
দুঃখে কাঁদ, সুখ হেরি আনন্দেতে ভাস ;
স্নেহ প্রস্রবণ নিতি করয়ে প্রকাশ।
দুঃখ দৈন্য তিরোধানে কর সহায়তা,
না খেয়ে ভ্রাতাকে দিয়ে, পুলকিত তব হিয়ে,
সুখী হও শুনে তার মঙ্গল বারতা ;
ভ্রাতৃময় হিয়া তব কি মহা প্রাণতা !
ভাবি যবে মনে কত হয় সুখোদয় ;
ভগ্নীরূপে নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

পত্নীরূপে বিশ্বে তুমি প্রেম প্রবাহিনী ;
দানকরি প্রেমামৃত, কষ্ট-ক্লিষ্ট পতি-চিত্ত,
শুষ্ক শুদ্ধ, রসময় কর বিনোদিনী ;
মন বিনোদিয়া হও হৃদয়ের রাণী !
আপনাকে মিশাইয়া দাও পতিসনে,
সুখে দুঃখে অনিবার জীবন-সঙ্গিনী তাঁর,
স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া হও একমনেপ্রাণে,
ভিন্ন স্বার্থ লুপ্তকর আপন জীবনে।
হৃদয়ে ভরিয়া রাখ পতি দেবতায় ;
প্রেম-পুষ্প দিয়ে নিতি, পুজে তাঁরে পাও প্রীতি
পতি বিনে অন্য দেব, কে আছে কোথায়
ভাবিয়া করেছ হৃদি শুধু পতিময়।
কত মধুময়ী তুমি শান্তির আলয় ;
পত্নীরূপে নারী তুমি, দেবীই নিশ্চয়।

কন্যারূপে হেরি যবে, প্রীতির আধার
জনক জননী প্রতি, সরল অগাধ প্রীতি,
সেবাধর্ম্ম শিরে বহি চল অনিবার ;
আদেশ পালনে কভু না হও কাতর।
মাতা পিতা উভে সেব কিঙ্করীর মত ;
কত যত্ন, কত শুশ্রূ, কত ভক্তি প্রাণময় ;
নীরবে কর্ত্তব্য ব্রত সাধ অবিরত ;
স্মিতমুখে নতশিরে স্নিগ্ধ করি চিত।
পরগৃহে বাস করি, মিশি পর সনে,
তবু কত আকর্ষণ, নাহি হও বিস্মরণ,
দুঃখে নেত্রঢালে অশ্রু,সুখে সুখী-মনে
নন্দিনী তোমার সম কে আর ভুবনে ?
শুভাননা প্রীতিময়ী আনন্দ-নিলয়,
ভক্তিমতী নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

পরদুঃখে দ্রবময়ী দয়াবতী নারী
হৃদয় অমৃত নদী, সুধা স্রোতে নিরবধি,
সিক্তকর তপ্তহিয়া মুছ নেত্রবারি
আর্ত্তজন, করুণা মণ্ডিত করে ধরি।
বিপন্ন হেরিয়া দয়া হয় উছলিত ;
নহ ভগ্নী নহ মাতা, পত্নী নহ পতি-রতা
ভক্তিমতী নহ কন্যা তবু হেন চিত ;
বিপন্ন উদ্ধার তব জীবনের ব্রত।
নাহি কোন স্বার্থ গন্ধ উদার হৃদয় ;
এ জগতে নারী তুমি দেবীই নিশ্চয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

রাজপুতানার পথে।

দাসত্বের দায়ে কাঠিবার যাত্রাকালে নিতান্তই এক নিশ্বাসে দৌড় দিতে হইয়াছিল,—পথে সুতরাং রাজপুতানার রেলগাড়ি চড়া ভিন্ন কোথাও উহার নৈসর্গিক রমণীয়তা উপভোগ করিবার অবসর মিলে নাই। এবারে তাই দুর্গা পূজার বন্ধে দশদিন স্বাধীনতার একটু সুবাতাস পাইয়া, দিল্লী হইয়া, আর একবার সে পথে বেড়াইবার সঙ্কল্প করা গেল। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা"—নীতিজ্ঞের এই সদুপদেশ সত্বেও, সহধর্ম্মিণী এবার সঙ্গ ছাড়িলেন না,—তাঁহার বড় সাধ—'সাবিত্রী'র সীমন্তে সিন্দুর চড়াইয়া তাঁহার নারীজীবন সার্থক করিবেন। অগত্যা যথাসাধ্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া সঙ্কটবারিণীর নাম স্মরণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক বাহির হইয়া পড়িলাম অপর সহযাত্রীর মধ্যে এক মাতৃহীনা শিশু

সাথিনী; যেখানেই যাই, তাহার সঙ্গ অপরিহার্য্য।

অবকাশের অল্পতা নিবন্ধন পথে অযথা সময় ক্ষেপণ অনভিপ্রেত হইলেও, একবার দিল্লী দর্শনের লালসা পরিত্যাগ করা গেল না। এ লালসা হিন্দুর হস্তিনাপুরের, বা মোগলের মহৈশ্বর্য্যের, স্মৃতিসম্ভূত নহে; কুতবের বিজয়কেতন হুমায়ুনের সমাধিসদন, দেওয়ানি খাসের অপূর্ব্ব মর্ম্মর প্রাচীর বা জুম্মার অদ্বিতীয় উপাসনা মন্দির, বা ঐরূপ কোন হর্ষ বিষাদের, তমঃসত্ত্বের, স্মৃতিলেখার কুহকজনিতও নহে। সে লালসা ত পূর্ব্বেই একাধিক বার চরিতার্থ করা গিয়াছে, সে স্মৃতি ত অটুট অক্ষরে হৃদয়ফলকে চিরদিন অঙ্কিত রহিয়াছে। এ লালসা কেবল ভারতেশ্বরীর ভুবনবিখ্যাত রাজধানীর চিতাভস্ম নবসম্রাটের অভিনব রাজধানী প্রতিষ্ঠার আয়োজন দর্শনের নিমিত্ত। কুক্ষণে কর্জন কর্ত্তৃক বঙ্গ-ভঙ্গ সাধিত হইয়াছিল,—বাঙ্গালীর সহস্র চেষ্টাতেও সে ভাঙ্গা আর জোড়া লাগিল না। অনেক সাধনা উপাসনার পর, অনেক বোমা-'বয়কট' প্রভৃতি বীভৎস অভিনয়ের পর, অনেক প্রাণি হত্যা, দ্বীপান্তর, প্রভৃতি মর্ম্মান্তিক কাণ্ডের পর, সম্রাটের শুভাগমনসূত্রে সে জোড়া লাগিল, যাহাতে আমাদিগের রাজনৈতিক দলপতিগণ, অভীষ্টসিদ্ধ হইল ভাবিয়া, মহা আনন্দ অনুভব করিলেন, সে জোড়ায় চিড় ঘুচিল না, বিহারী বন্ধু বহুদিনের গৃহ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, অনসীয়া অন্তরঙ্গ দশদিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া আবার স্বতন্ত্র সংসারে সরিয়া পড়িলেন, উড়িয়া ভায়া অনিচ্ছায় বিহারী ভ্রাতার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন, আর, সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়, বঙ্গের চিরন্তন কীর্ত্তির বিলোপ সাধন করিয়া কলিকাতা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইল। আমাদিগের এ ক্ষেত্রে দিল্লী যাত্রা এই নব রাজধানীর নূতন সংস্করণ দেখিবার জন্য।

পুরাতন দিল্লী প্রাচীরের প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে, টিমারপুর মহল্লায়, সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ্য দরবারে—সম্রাট্ নূতন সহরের ভিত্তিস্থাপন করিয়া গেলেন। তাহার কিছুদিন পরেই শুনা গেল, এই অঞ্চলের জমির দশ ফিট নিম্নে দুরন্ত যক্ষ্মারোগের বীজ বিদ্যমান; অতএব এস্থানে সহর প্রতিষ্ঠা বিপজ্জনক বিবেচনায়, পূর্ব্বোক্ত দিল্লী প্রাচীরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, প্রায় তিন চারি ক্রোশ দূরে, কুতবের পথে, রাইসিনা নামক স্থানে সম্রাট্ প্রোথিত ভিত্তিশিলা স্থানান্তরিত হইল। টিমারপুর হইতে এই রাইসিনা ঠিক পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে—পল্লীবাসীর হিসাবে সম্পূর্ণ গ্রামান্তর বলিলেই হয়। সম্রাট কর্ত্তৃক ভিত্তিস্থাপনের গুরুত্ব ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, অথচ তাঁহারই দোহাই দিয়া এই সুদূর প্রান্তরে নূতন সহরের প্রতিষ্ঠাকল্পে রাশি রাশি অর্থ অকাতরে ব্যয়িত হইতেছে। Government House, Secretariat Buildings, Council Chamber, প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় অট্টালিকাদির গঠনকার্য্য শেষ হইতে এখনও তিন চারি বৎসর লাগিবে, বোধ হয়। ওদিকে রাইসিনাতে স্থায়ী Council Chamber ক্রমশঃ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, এদিকে টিমারপুরের অস্থায়ী Council Chamberএ স্থান সঙ্কীর্ণতা বশতঃ প্রায় পঞ্চাশ সহস্র টাকা ব্যয়ে তাহা বর্দ্ধিত করা হইতেছে। বস্তুতঃ সুপ্রশস্ত রাজপথ ও ছোট-বড় সকল শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীগণের বাসভবন ভিন্ন এ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই শেষ

হয় নাই। রাইসিনাতে বিস্তর বাড়ী ঘর প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও, সিমলার সাহেবেরা দিল্লীতে নামিয়া প্রায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন; তাহার ভাড়ার কতক অংশ তাঁহারা স্বয়ং দেন, কতক সরকার বাহাদুরকে দিতে হয়। টিমারপুরের অস্থায়ী বাসাবাটীতে সিমলাগত সকল কেরাণীর স্থান না হওয়ায় অনেককে রাইসিনায় থাকিতে হয়; তাঁহাদিগের যাতায়াতের পথখরচ সরকার বহন করেন। এইরূপ কত দিকে কত অর্থ অনর্থক ব্যয় হইতেছে, যক্ষ্মাসঙ্কুল টিমারপুরে এ যাবৎ অস্থায়ীভাবে রাজকার্য্য সকলই চলিতেছে, তথাপি রাইসিনাতে নূতন সহরের পত্তন করিয়া রাজাজ্ঞা পালন করিতেই হইবে; কালকাতার প্রতি কুদৃষ্টি ভিন্ন ইহার আর অন্য কি কারণ নির্দ্দেশ করিব?

অপরিহার্য্য সরকারি অট্টালিকা নির্ম্মাণেই এই বিলম্ব, ইহার পরে সহরের শোভাবর্দ্ধক ও সাহেবগণের আনন্দদায়ক দীর্ঘিকা, বীথিকা, বিলাসকানন, প্রমোদভবন প্রভৃতি নয়নরঞ্জন কত কি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার সমকক্ষ বা ততোধিক সুন্দর করিয়া তুলিতে আরও কতকাল লাগিবে, ও কত অর্থ ব্যয় হইবে, কে বলিতে পারে? এক বিষয়ে এখনই কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লক্ষিত হইল; বাসবাটীগুলি এক একটি চকে squareএ বিভক্ত করা হইয়াছে—এরূপ চক বা square বিস্তর ও তাহার প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নাম,—যথা, Havelock Square, Dalhousie Square, Wilson Square ইত্যাদি। এই সমস্ত নূতন কাণ্ড দেখিয়া আমরা কেবল পুরাতনের মোহে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

রাজপুতানার রমণীয়তা উপভোগ করাই এ যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, পঞ্চনদে আসিয়া উহার দুই একটা প্রাচীন কীর্ত্তিস্থল এই সূত্রে দেখিয়া লইবার সুযোগ ছাড়া কর্ত্তব্য বোধ হইল না। তাই বর্ত্তমান দীল্লির ব্যবস্থায় দারুণ দুঃখ অনুভব করিয়াও অতীতের দুঃখকাহিনীজড়িত আর এক শ্মশান ক্ষেত্রে অচিরে যাত্রা করা গেল। রেল পথের উভয় পার্শ্বে পলায়নপর মৃগকুলের ক্ষিপ্র পাদক্ষেপ, রবিকরসম্পাতে সমুজ্জ্বল কলাপ বিস্তার পূর্ব্বক অবাধবিচরণশীল ময়ূরের মন্থর নৃত্য, প্রকাণ্ড মহীরুহের মস্তকাসীন বনজ বিহঙ্গের মধুর কূজন, প্রভৃতি নৈসর্গিক কাণ্ড নিরানন্দ অন্তরেও ক্ষণিক আনন্দের সঞ্চার করিল, নীরস হৃদয়ও ক্ষণকাল সরস করিয়া ঐশী মহিমায় তন্ময় করিয়া তুলিল। যাহা হউক, এই সকল কাণ্ডের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া গাড়ি সমান বেগে দৌড়িতে লাগিল ও যথাসময়ে আমাদিগকে গন্তব্যস্থানে পঁহুছাইয়া দিল। আমরা থানেশ্বর বা কুরুক্ষেত্র ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনের কাষ্ঠফলকে নাম দেখিয়া, যাত্রীগণের সতর্কতা উদ্দীপক ষ্টেশন খালাসীর চীৎকার শুনিয়া, আর আমরা কোন্ অতীত স্মৃতির কুহকে কোথা যাইতে অগ্রসর হইয়াছি চিন্তা করিয়া, একবার মনে উদয় হইল একি সেই "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র", যেখানে যুদ্ধার্থী সমবেত কৌরবপক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষ কি করিল জানিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে কাতর প্রশ্ন করিয়াছিলেন? এ কি সেই স্থান যাহার মহিমা বুঝাইবার জন্য নির্ব্বাসিত যক্ষ জলধরকে বলিয়াছিলেন—

"রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি।"—

যেখানে দাঁড়াইয়া শ্রীভগবান্ ভক্তের সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য যোগ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন? একি সেই পুণ্যসলিলা সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত ব্রহ্মাবর্ত্ত, যেখানে আর্য্যগণ সমাগত হইয়া সুমধুর সামগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভারতভূমে হিন্দুত্বের বিজয় নিশান উড়াইয়াছিলেন? একি সেই প্রাচীন থানেশ্বর, যেখানে মহম্মদ ঘোরির নির্ম্মম হস্তে প্রবলপ্রতাপ পৃথীরাজ নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোণার ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতারবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছিল?

রাজপথে গমনকালে অতীতের এই সমস্ত ঘটনার কোন চিহ্নই চক্ষে পড়িল না কেবল এক প্রনষ্টগৌরব প্রাচীন সহরের নাতিপরিচ্ছন্ন ভাব নয়নগোচর হইল। যাহা হউক আমরা অনতিবিলম্বে পাণ্ডা রামনিরঞ্জন পণ্ডিতের স্বলাভিষিক্তগণের সাহচর্য্যে এক দীর্ঘিকার কূলে নীত হইলাম শুনিলাম, ইহাই দ্বৈপায়ন হ্রদ। রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ দূরস্থিত, সহরের প্রান্তবর্ত্তী, অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী এই হ্রদের পশ্চিমকূলবর্ত্তী অনেক স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ প্রচ্ছন্ন-ভাবে বর্ত্তমান; এই সকল স্থানের নিভৃত গাম্ভীর্য্য দর্শকের মনে অনির্ব্বচনীয় আতঙ্ক উদ্দীপন করে। অপর তিন কূলে অনেক স্নানের ঘাট এবং ঘাটের সমীপবর্ত্তী অনেক মন্দির প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে; তন্মধ্যে তীরের সহিত সেতুবন্ধে সংলগ্ন হ্রদের মধ্যবর্ত্তী এক মন্দির স্থাপত্য কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয়, এবং পাণ্ডাগণের নির্দ্দেশমত তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বরেণ্য। অধিকাংশ মন্দিরেই লক্ষ্মীনারায়ণের বা অন্য দেবদেবীর মূর্ত্তি,—কেবল একস্থানে পঞ্চ-পাণ্ডবের মূর্ত্তি দেখিলাম, তবে তাহা মৃণ্ময়, নিতান্ত আধুনিক—দেখিয়া 'হাসি-কান্না' ভিন্ন শ্রদ্ধা-ভক্তির উদ্রেক হইল না। যাত্রীর সংখ্যা বড় বেশী দেখিলাম না; তবে শুনিলাম, রেলপথ খোলার পরে, একবার সূর্য্য গ্রহণো-পলক্ষে না-কি, সাত-আট লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। যাহা হউক, দ্বৈপায়নকূলে পিতৃ-পিতামহাদির উদ্দেশে যথারীতি শ্রাদ্ধতর্পণাদি শেষ করিয়া আমরা সেস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

অতঃপর আরও একটু অগ্রসর হইয়া, অম্বালা ছাড়িয়া, স্বর্ণমন্দির-দর্শনলালসায় অমৃত সহরে যাওয়া গেল। তখন গান্ধীর গন্ধে কেহ উন্মত্ত হয় নাই,—ডায়ারের ডঙ্কা কোথাও বাজে নাই,—জালিয়ানোয়ালাবাগের যন্ত্রণা কাহাকেও সহিতে হয় নাই। অমৃতস'র প্রকৃতই অমৃত সহর, আনন্দের উৎস, দরবার সাহেবের * অপূর্ব্ব স্বর্গনিকেতন। আমরা নির্ভয়ে নিরুপদ্রবে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এক আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সহরে আধুনিক প্রথামত সরকারি বিদ্যালয়, Town Hall, কুসুমোদ্যান, দণ্ডক সরোবর প্রভৃতি দর্শনযোগ্য বিস্তর স্থান আছে। হাট বাজারও অল্প নহে, পণ্য দ্রব্যও অগণ্য, তন্মধ্যে সুদূর প্যারিস প্রদর্শনীতেও স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত শাল ও গালিচাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগন্তুকের বাসোপযোগী সরাই, ধর্ম্মশালা, প্রভৃতি স্থানেরও অসদ্ভাব

* মন্দিরাভ্যন্তরস্থ আরাধ্য বস্তুর নাম 'গ্রন্থ সাহেব' আর মন্দিরের নাম 'দরবার সাহেব'।

নাই। কিন্তু এ সকল দেখিবার জন্য কেহ অমৃতস'রে আসে না; এখানে দেখিবার সার বস্তু—স্থবর্ণমন্দির। শিখতীর্থের এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হইলেও, অমল ধবল মর্ম্মরের গ্রন্থন কৌশলে ও সংস্কারগুণে এখন পর্য্যন্ত উহা যেন সদ্যোরচিত বলিয়া বোধ হয়। সুদীর্ঘ সরোবরের চতুঃপ্রান্ত মর্ম্মরে মণ্ডিত,—তাহারই মধ্যস্থলে এই মনোহর মন্দির মর্ম্মরে গ্রথিত এবং মর্ম্মররচিত সেতুবন্ধে তীরের সহিত সংলগ্ন। মন্দিরের চূড়া ও সমগ্র শীর্ষ-ভাগ সোনার চাদরে আচ্ছাদিত, ও এইজন্যই উহা স্থবর্ণমন্দির বলিয়া বিখ্যাত। মন্দির মধ্যে কোন দেবপ্রতিমা নাই—আছেন কেবল সযত্নরক্ষিত শিখের ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থ সাহেব"; উঁহারই উদ্দেশে শত শত যাত্রী কর্ত্তৃক পুষ্প-অর্ঘ্য অর্পিত হয়, আর তদ্বিনিময়ে পাণ্ডাপ্রদত্ত অমূল্য "কড়াপ্রসাদ" পাওয়া যায়।

এই 'প্রসাদ,' নামে 'কড়া' হইলেও, প্রকৃত পক্ষে অতি কোমল, অতি মধুর, অতি সুরস। বস্তুতঃ উহা বাজারের হালুয়াপক্ক 'হালুয়া-মোহন' মাত্র। এই প্রসাদের প্রয়োজনাধিক্যে এখানকার বাজারে, বিশেষতঃ মন্দিরের সমীপবর্ত্তী দোকান সকলে, অন্য মিষ্টান্ন অপেক্ষা হালুয়াই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ও তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই রুচিপ্রদ হালুয়ার-এই মহাপ্রসাদ "কড়া প্রসাদের"—মাহাত্ম্য, সাধারণ ক্রেতা বা যাত্রী দূরে থাকুক, স্বয়ং 'গ্রন্থ'রক্ষক প্রসাদ-বিতরক পাণ্ডাগণও সকলে অবগত নহেন। সহানুভূতির বন্ধনশূন্য পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন,—সুতরাং হৃদয়হীন শক্তিহীন পঞ্চনদবাসীর মধ্যে যোগশক্তি-সঞ্চারের জন্য মহাত্মা নানক এই পরম পবিত্র, শক্তি-সঞ্চারক, স্বর্গীয় সুধা আপামর সকলকে বিতরণ করেন,—বিয়োগধর্ম্মী বৈষম্যের পরিবর্ত্তে সংযোগধর্ম্ম সাম্যের প্রতিষ্ঠা সাধন করেন,—হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণশূদ্র নির্ব্বিশেষে, হাড়িচণ্ডাল নির্ব্বিশেষে, এই অতুল শক্তির আধার "কড়াপ্রসাদ" বিতরণ করিয়া সকলকে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে যে শিখজাতির শিখশক্তির, শিখধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু হায়! এখন আর সে সংযোগধর্ম্ম কোথা? সে অতুল প্রেমবন্ধন কোথা? সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ-প্রবর্ত্তিত শক্তির আধার কোথা?—এখন নাম মাত্র "কড়াপ্রসাদ" ভ্রান্ত ধর্ম্মীর, ভ্রান্ত কর্ম্মীর, রসনা তৃপ্ত করিতেছে মাত্র! আমরাও সেইরূপ রসনাতৃপ্তির সঙ্গে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমৃতসহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

এইবারে, আবার উজনপথে দিল্লী হইয়া, সত্যসত্যই আমরা রাজপুতানাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং রাত্রিশেষে প্রথম উদ্দিষ্ট স্থান জয়পুরে পঁহুছিলাম। অপরিচিত স্থানে অসময়ে কোথা আশ্রয় পাইব, ভাবিয়া আশঙ্কা জন্মিয়াছিল; কিন্তু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় অতি সহজেই সে আশঙ্কা দূর করিলেন—ষ্টেশনের সন্নিকটেই সুন্দর পান্থশালায় আমরা নির্ব্বিঘ্নে স্থান পাইলাম ও নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করিলাম।

প্রাচীন অম্বরের নূতন রাজধানী জয়পুর, নব-দিল্লীর নূতন সংস্করণের বহু পূর্ব্বেই, বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল। দৈর্ঘ্যে এক ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী এই সহরের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে গুম্বজে অলঙ্কৃত ও সুদৃঢ় তোরণে

সংরক্ষিত। অশীতি হস্ত বিস্তৃত ক্রোশব্যাপী রাজপথ সহর ভেদ করিয়া উহার দীর্ঘতার পরিচয় দিতেছে এবং মাঝে মাঝে প্রায় তদ্রূপ প্রশস্ত অন্যান্য পথ ঐ প্রধান পথ ভেদ করিয়া গিয়াছে ও তাহার প্রত্যেকের সন্ধিস্থলে এক একটি বাজারের চক সুশৃঙ্খল ভাবে রচিত হইয়া রচয়িতার নিপুণতার সাক্ষ্যদান করিতেছে। নব-দিল্লীর পূর্ব্বকথিত নূতন চক অপেক্ষা রচনাকৌশলে ইহা বিশেষ হীন নহে।

নগরের মধ্যভাগে রাজপ্রাসাদ ও তৎ-সংলগ্ন পুষ্পবাটিকা ততোধিক রচনাপারিপাট্যে সহরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে এবং প্রাসাদের সপ্ততলবিশিষ্ট গগনস্পর্শী সম্মুখভাগ ও রাজ-পথের সমীপবর্ত্তী শিলামণ্ডিত সমুন্নত প্রাসাদ-শৃঙ্গ রাজোচিত উচ্চতার নিদর্শন জ্ঞাপন করিতেছে; পরন্তু প্রাসাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী দিল্লীর অনুরূপ দেওয়ানি-খাস, দেওয়ানি-আম সুখনিবাস, প্রভৃতি অট্টালিকা মহারাজার অতুল সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুদৃঢ় প্রাকারবেষ্টিত পুষ্পবাটিকা তাল-তমাল প্রভৃতি তরুরাজিতে,—দেশী-বিদেশী নানা অপরূপ লতাগুল্মে,—কৃত্রিম প্রস্রবণ, নিভৃত নিকেতন, প্রভৃতি বিলাসোপকরণে, সুসজ্জিত হইয়া মর্ত্তধামে অমরভোগ্য নন্দনের সুষমা বিস্তার করিতেছে। ইহারই একপার্শ্বে গোবিন্দজীর মন্দির বর্ত্তমান। মন্দির এরূপ সুকৌশলে রচিত যে, দূরবর্ত্তী আপন প্রাসাদ-কক্ষ হইতে মহারাজা অনায়াসে উহার মধ্যস্থিত দেববিগ্রহের দর্শনলাভ করিয়া থাকেন। আমরা এই মন্দির ও তন্মধ্যস্থিত যুগলমূর্ত্তির সান্ধ্য আরাত্রিক সন্দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। এই মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়াই, না-কি, মুর্শিদাবাদ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন,—ইহাই, না-কি, গোবিন্দজীর মূল মূর্ত্তি—বৃন্দাবনে ইহার প্রতিকৃতি মাত্র। মন্দিরে অবস্থানকালে একবিষয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিলাম, —বিগ্রহের পূজক পুরোহিত হইতে সমাগত দর্শকবৃন্দ পর্য্যন্ত সকলেই বঙ্গবাসী; বাস্তবিক, তখন—বারাণসীতে বা বৃন্দাবনে, বাঙ্গালার দেবমন্দির বা মাড়বাড়ের মঠে—কোথায় দেব-দর্শন করিতেছি, বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। জয়পুরাধিপতির রাজসভা হইতে দেবমন্দির পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতি কর্ত্তৃত্ব-ভারার্পণ দর্শনে মন সহজেই পুলকিত হয় ও কৃতজ্ঞতার আকর্ষণে তাঁহার চরণে মস্তক স্বতঃই অবনত হয়।

প্রাসাদসংলগ্ন এই উদ্যান অপেক্ষা জন-সাধারণের উপভোগ্য জয়পুরের প্রধান রাজোদ্যান অনেকাংশে উৎকৃষ্ট,—এমন কি, উহা সমগ্র ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বতন স্বর্গীয় মহারাজা কর্ত্তৃক প্রায় চারি লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উদ্যান রচিত হইয়া-ছিল। ইহারই মধ্যে য়্যালবার্ট হল, মেয়ো হাঁসপাতাল, চিত্রশালা (museum), প্রভৃতি লোকহিতকর অনুষ্ঠান বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন রামনিবাস উদ্যান, রাজ কলেজ, শিল্পবিদ্যালয়, মুদ্রারচনশালা (mint), "হাওয়া মহল," প্রভৃতি আরও অনেক নয়নরঞ্জন ও চিত্তাকর্ষক কাণ্ডে জয়পুরের রাজধানী অলঙ্কৃত। আমরা একে একে যথাসম্ভব সকল স্থান দর্শন করিয়া চক্ষু চরিতার্থ করিলাম; কেবল দেখা হইল না—রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বর। সম-য়াভাবে, অবশ্যগ্রহণীয় Political Agent সাহেবের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিতে না পারায়, আমাদিগের সে সাধ মিটিল না। আমরা তাহার ক্ষোভ মিটাইলাম—গালব

মুনির আশ্রম গল্‌তা পাহাড় দর্শনে। গালব মুনির আশ্রমের কোন নিদর্শন নয়নগোচর না হইলেও, গল্‌তা-গিরিসঙ্কটসংলগ্ন তদীয় স্মৃতি-সূচক অনেক মন্দিরে অধুনাতন সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম দেখিলাম, আর উহার অনন্য সুলভ নৈসর্গিক শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সূর্য্যদেব অস্তোন্মুখ,—প্রদোষের ছায়া প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, এমন সময়ে —এই দিবা-সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে—সঙ্কটের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে চলিতে, অতীত স্মৃতির মোহে —ইহা যে মেবার নহে, জয়পুরের জন-বিরল গিরিপথ, একথা বিস্মৃত হইয়া—উদাস প্রাণে, আকুল তানে, গান ধরিলাম—

"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল
যেথা প্রতাপ বীর"—

সঙ্গিনী শিশু নাতিনিটী নাচিতে নাচিতে চলিতেছিল,—মিনার্ভা রঙ্গালয়ের কৃপায় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের এই মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত তাহার শুনা ছিল,—সেও শিশুকণ্ঠে তারস্বরে যোগ দিল—

"মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার
রক্তনিশান উড়ে না আর।"

তখন মোহ কাটিল, দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া, অদূরস্থিত অশ্বযানে আরোহণ পূর্ব্বক সকলে ষ্টেশনসমীপস্থ ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর গৃহিণীবাঞ্ছিত 'সাবিত্রী'দর্শন-উদ্দেশে অজমীর যাত্রা করা গেল। অজমীর অতি প্রাচীন সহর;—এরূপ কিংবদন্তী আছে যে উহা রঘুবংশীয় মহাত্মা অজরাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেরূপ প্রাচীনত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আধুনিক গৌরবেও উহা অন্যান্য সহর অপেক্ষা হীন নহে। সুরম্য পাহাড়-বেষ্টিত উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় উহা স্বভাবতই বড় সুন্দর, অধিকন্তু সহরের পশ্চিম-ভাগে অন্নসাগর নামক কৃত্রিম হ্রদ সংলগ্ন হওয়ায় উহাকে আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বতন রাজপুতনা-মালব রেলপথের ইহাই প্রধান কার্য্যস্থল ছিল; অধুনা বম্বে-বরদা লাইনের বিরাট ব্যাপারের সহিত বন্ধনযুক্ত হইলেও, ঐ অপ্রশস্ত রেলপথের এঞ্জিন, গাড়ি ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জামের কল-কারখানা সমস্তই এখানে বিদ্যমান। বস্তুতঃ, বড় লাইনের পক্ষে যেমন সমগ্র ভারতবর্ষে জামালপুর ও লিলুয়ার কারখানার সমকক্ষ অন্যত্র নাই বলিলেই হয়, ছোট লাইনের উপযোগী কারখানার মধ্যে এই অজমীরের কারখানাই সেইরূপ আদি এক সময়ে অদ্বিতীয় ছিল। রাজপুত নৃপনন্দনগণের বিদ্যানুশীলনের নিমিত্ত মেয়ো কলেজ এইখানেই প্রতিষ্ঠিত। তদ্ভিন্ন খাজা সাহেবের সমাধি, অধয়-দীন-কী-ঝোপ্‌ড়ি, তারাগড়ের মস্‌জিদ্‌, প্রভৃতি মুসলমান স্থাপত্যের ও ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের নিদর্শন-সূচক বহুস্থান দর্শনযোগ্য।

আমরা কিন্তু সে সকল দেখিবার জন্য সময়ক্ষেপ না করিয়া, টোঙ্গাযোগে পুষ্করাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। পার্ব্বত্যপথে গমনাগমন পক্ষে টোঙ্গাই প্রকৃষ্ট যান;—সিমলা, শিলং, নৈনিতাল, প্রভৃতি সমস্ত শৈলাবাসেই পূর্ব্বে টোঙ্গায় যাইতে হইত, এখন কোথাও রেল-গাড়ি, কোথাও মোটর গাড়ি তাহার কার্য্য অধিকার করিয়াছে। অজমীর হইতে পুষ্করের পথও প্রথম কতকটা সমতল, পরে সিকতাময় পর্ব্বতের উপর দিয়া গিয়াছে। পথে ও গ্রামের মধ্যে এত বালুকা যে তাহা ভেদ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ বালুকাময় পর্ব্বতবেষ্টিত অপ্রশস্ত উপত্যকার মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। পুষ্কর নামক পরম পবিত্র হ্রদের

অজন্তই এই স্থান সুপরিচিত। অজমীরের প্রায় চারি ক্রোশ নৈঋর্তে এই পুষ্কর গ্রাম ও হ্রদ বিদ্যমান। কুরুক্ষেত্রের দ্বৈপায়ন হ্রদ অপেক্ষা আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, পবিত্রতা সম্বন্ধে উহা ভারতে অদ্বিতীয়। কার্ত্তিকী মেলায় প্রতি বৎসর এখানে প্রায় লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, এবং শোণপুরের মেলার ন্যায় হয়-হস্তী পর্যান্ত বিক্রয়ার্থ আনীত হয়; বস্তুতঃ সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে এরূপ মেলা অন্যত্র কোথাও হয় না। হ্রদের প্রায় চতুঃপার্শ্বে দেবমন্দির ও স্বর্গীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণের স্মৃতিমন্দির। পুষ্কর হ্রদের অপর নাম ব্রহ্মকুণ্ড। কথিত আছে,—ব্রহ্মা যজ্ঞসাধনসঙ্কল্পে এই স্থানে অবস্থিতি করেন এবং যজ্ঞবিঘ্নকারী অসুরগণের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার্থ চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বত-শৃঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করেন। সস্ত্রীক যজ্ঞসাধন করা বিধেয়, কিন্তু ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী দেবী যথাকালে উপস্থিত হইতে না পারায়, ব্রহ্মা এক অপ্সরাকে পত্নীর স্থলাভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। কিয়ৎকাল পরে সরস্বতী সমাগতা হইয়া এই বিসদৃশ কাণ্ড দর্শনে রোষে ও অভিমানে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে অন্তর্হিতা হইয়া প্রস্রবণে পরিণতা হয়েন। পরে কোন ব্যাধিক্লিষ্ট রাজা মৃগয়ায় আসিয়া এই প্রস্রবণের পবিত্র জলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করায়, সেই কষ্টদায়ক ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ঐস্থানে হ্রদ খনন করেন। এই সূত্রেই এই হ্রদ ব্রহ্মকুণ্ড নামে পরিচিত।

হ্রদের নিকটবর্ত্তী মন্দির সকলের মধ্যেও ব্রহ্মার মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিন্ধিয়ার রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ মর্ম্মরনির্ম্মিত দুই হস্তী ও অন্যান্য মূর্ত্তি গঠনশিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

দ্বৈপায়নের ন্যায় ব্রহ্মকুণ্ডেও শ্রাদ্ধতর্পণাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তদুদ্দেশ্যেই এত যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। আমরাও পাণ্ডা মদনলাল রামচন্দ্রের সহায়তায় যথারীতি সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। পাণ্ডাঠাকুরের উৎপীড়ন দেখিলাম না, বরং তাঁহার সাদর যত্নে আপ্যায়িত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

এখানকার ক্রিয়া শেষ করার পর গৃহিণীর সাধের সাবিত্রীদর্শনপর্ব্ব উপস্থিত হইল। এ পর্ব্বে আমার কর্ত্তব্য কিছুই ছিল না; সুতরাং তাহাতে অন্তরায়ও হইলাম না, অন্তরঙ্গতাও করিলাম না। তিনি প্রত্যুষে ভৃত্যসমভিব্যাহারে বংশনির্ম্মিত বিচিত্র শিবিকাযোগে সাবিত্রীমন্দিরে যাত্রা করিলেন, শিশু নাতিনীটীও এক কুলির পৃষ্ঠে তাঁহার সঙ্গ লইল,—আমি বাসায় বসিয়া সেই অবকাশে একটু বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া লইলাম। সাবিত্রীর মন্দির পুষ্করের অদূরবর্ত্তী এক নাতি-উচ্চ শৈলের উপরিভাগে অবস্থিত। মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তির মস্তকে সিন্দূর বিলেপন ও শাঁখা-সাড়ী প্রভৃতি সোপকরণ পূজার সামগ্রী অর্পণ করা ভিন্ন সেখানে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান নাই;—এই কর্ত্তব্য-কৃত্য সমাপন করিয়া বেলা দশটার মধ্যেই সকলে প্রত্যাগত হইলেন। উপকরণাদি পূর্ব্বেই সংগৃহীত ছিল—এক্ষেত্রে ব্যয়ের মধ্যে সাবিত্রীর নির্দ্দিষ্ট দর্শনী পাঁচ সিকা ও যাতায়াতের ডুলিভাড়া আর পাঁচ সিকা মাত্র; শিশুটীর বাহককেও অবশ্য অতিরিক্ত কিছু দিতে হইয়াছিল।

উদ্দিষ্ট কার্য্য একরূপ সমাপ্ত হইল,—এখন স্বদেশে ফিরিলেই চলিত। কিন্তু আশার

অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ অবকাশের অনুমতি পাওয়ায়, এই পথের অদৃষ্টপূর্ব্ব আর এক পুণ্যক্ষেত্র এই স্থত্রে দেখিয়া লইবার আশায় আরও একটু অগ্রসর হওয়া গেল। আমরা পুষ্কর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পরদিন প্রাতে 'আবু রোড' ষ্টেশনে পঁহুছিলাম, এবং সেখান হইতে টোঙ্গাযোগে আবু পাহাড়ে উঠিলাম। শিলং ও সিমলা যাত্রা উপলক্ষে পার্ব্বত্য পথের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, অতএব এপথে নূতনত্ব কিছুই লক্ষিত হইল না, বরং প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাদৃশ্যবশতঃ অনেকস্থল যেন পূর্ব্বদৃষ্ট বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল। পথও অল্প—ষ্টেশন হইতে ৮।৯ ক্রোশ মাত্র ; পাহাড়ের উচ্চতাও অপেক্ষাকৃত অল্প—৪৫০০ ফীট মাত্র ; তবে, দার্জ্জিলিঙ্, নৈনিতাল, সিমলা প্রভৃতির ন্যায়, ইহা স্বাস্থ্যনিবাসও বটে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিদাঘনিকেতনও বটে। যাহা হউক, মধ্যাহ্নের বহু পূর্ব্বেই আমরা যথাস্থানে নীত হইলাম ; তখন কিন্তু এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইল—আশ্রয়স্থানের অসদ্ভাব। বিশ্বস্ত স্থত্রে শুনা ছিল, অন্যান্য স্থানের ন্যায়, এখানেও Brooke's Serai নামে এক পান্থশালা আছে, এবং তাহারই ভরসায় শিশুসঙ্গে সস্ত্রীক এই অপরিচিত স্থানে আসিতে সাহস করিয়াছিলাম। টোঙ্গা হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম, অতি নিকটেই সরাই আছে সত্য বটে, কিন্তু লোকসমাগমের অসদ্ভাব বশতঃ তাহা সংস্কারবর্জ্জিত—সুতরাং ভদ্র-পরিবারের বাসের একান্ত অনুপযোগী। যাহা হউক, করুণাময়ের কৃপায়, সমস্যার সমাধানে বড় বিলম্ব ঘটিল না। টোঙ্গা আপিসে সন্ধান লওয়ায় তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষগণের আতিথেয়তাগুণে তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামভবনে বাসের অনুমতি পাইলাম ও পূর্ব্বোক্ত ব্রুক্-সরা'য়ের এক কক্ষে পাকাদি নিষ্পন্ন করিয়া, স্বচ্ছন্দভাবে দুই দিন সেখানে অতিবাহিত করিলাম। তখন স্বতই মর্ম্ম ফাটিয়া মুখ ফুটিল—

> "সবাই ছেড়েছে, নাহি যা'র কেহ,
> তুমি আছ তা'র, আছে তব স্নেহ,
> নিরাশ্রয় জন—পথ যা'র গেহ—
> সেও আছে তব ভবনে।"

অপরাহ্নে অনায়াসলভ্য, পরন্তু অনতিসুলভ, টোঙ্গা-যানে সকলে মিলিয়া সহর প্রদক্ষিণ করা গেল, এবং যে মহাতীর্থের আকর্ষণে এই সুদূর শৈলপথে আসা গিয়াছে, সেই তীর্থ-সন্দর্শনলাভে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ইহা ভারতের অন্যতম জৈনতীর্থ,—এ হিসাবে অন্যধর্ম্মীর পক্ষে এ তীর্থ, হয় ত, পরম শ্রদ্ধার স্থল না হইতে পারে ; কিন্তু যে হিসাবে আগ্রার তাজ, দিল্লীর মস্জিদ্, মাদুরার হিন্দু মন্দির, অমৃতসরের শিখ মন্দির বা গয়ার বৌদ্ধমন্দির ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল যাত্রীর সমভাবে নমস্য, আবুর এই তীর্থে জৈন মন্দিরের সমক্ষেও সেই হিসাবে সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই মস্তক অবনত করিতে হয়। এই তীর্থস্থানের নাম দিলোয়ারা বা দেবলবারা। শুনা যায়, প্রথমতঃ এখানে হিন্দুর শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির ছিল, পরে বনূল সাহ নামক পত্তনের কোন ধনবান জৈন বণিক ঐস্থানের স্বত্বাধিকারীকে সমগ্র ভূখণ্ড-আচ্ছাদনোপযোগী রজতমুদ্রা মূল্য-স্বরূপ দান করিয়া উহা হস্তগত করেন, এবং তদুপরি আপন ধর্ম্মের অনুকূল মন্দির-স্থাপন করেন। মন্দির সংখ্যায় পাঁচটি, তন্মধ্যে তিনটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও আকার প্রকারেও হীন। অপর দুইটীই প্রাচীন ও মনোহর; কিন্তু একই সময়ে একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত কি না, বলা দুষ্কর। একটির গাত্রস্থিত শিলালিপি পাঠে বোধ হয়,

উহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্থাপিত এবং তীর্থঙ্কর নেমিনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। অপরটির রচনাকাল নির্দ্ধারণের উপায় নাই; কিন্তু উহাই যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও বণিক-পুঙ্গব বনূল সাহের অর্থে রচিত, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী আয়োজনে, অষ্টাদশ ক্রোর মুদ্রা ব্যয়ে, প্রথম ও প্রধান তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের উদ্দেশে, রচিত এই ত্রিতল মন্দির দর্শনে মন মোহিত হইয়া যায়। স্থাপত্য গৌরবে তাজমহল ভারতের অদ্বিতীয় অট্টালিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু বস্তুতঃ, তাজ শ্রেষ্ঠ, কি এই দিলোয়ারার মন্দির শ্রেষ্ঠ, বিচার করা আমাদিগের ন্যায় মুগ্ধ ও অনভিজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব। তবে তাজ ভিন্ন অপর কোন অট্টালিকাই যে ইহার সমকক্ষ নহে—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।*

আমরা এই অপূর্ব্ব মন্দিরের স্মৃতি বহন করিয়া ও রাজপুতানার পথে আশাতীত আনন্দ-উপভোগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

---

* Beyond controversy this (the Dilwara) is the most superb of all the temples in India, and there is not an edifice, besides the Taj Mahal, that can approach it." —Col. Todd.

আত্মীয়ের পরিচয়।

(১)

এ কি ভ্রান্তি? না কি ব্যাধি? বুঝিবার নয়!
যারা চিরদিন ধরি'
দলিছে অবজ্ঞা করি'
পাছে কষ্ট হয় বলে সদা যারে ভয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(২)

স্বার্থ ভিন্ন মোর সনে কথা নাহি কয়,
কাছেতে মধুর বুলি,
পিছে ফিরে দেয় গালি,
কথা কয়ে মধু ঢালে প্রাণে বিষময়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৩)

ঘৃণা তুচ্ছ হেলাভরে স্পর্শে না আলয়,
মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ
যারা করে প্রতি দান,
অর্থ পেলে মোর প্রতি যে রহে সদয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৪)

আমার গৌরব ভেঙ্গে যার সুখোদয়,
পেষিয়া দলিয়া পায়
চির শান্তি যারা পায়,
প্রতি কাজে প্রতি পদে যে করে সংশয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৫)

কলহ পসরা দেয় স্নেহ বিনিময়,
বুকের পাঁজরগুলি
সঙ্গোপনে দিয়ে খুলি'
অত্যাচার উৎপীড়নে ভেঙ্গে সমুদয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৬)

সন্ধানি' আমার দোষ করে দেশময়,
আমার দীনতা হেরে
হৃদয়ে আনন্দ করে,
হিংসা-দ্বেষ পরিপূর্ণ যাহার হৃদয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৭)

আমার বিপদকালে হর্ষিত-হৃদয়,
হাতে দেখে ভিক্ষা ঝুলি
যারা দেয় করতালি,
তিল টুকু দোষ পেলে তালসম কয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

(৮)

যার সনে ন্যায়-বাক্যে প্রাণে পাই ভয়,
সকলের কাছে মোরে
যারা রাখে হেয় করে,
উন্নতি দেখিলে মোর আঁখি অন্ধ হয়,
তারেই আত্মীয় বলে দিই পরিচয়।

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।

কেশবচন্দ্র।

কলিকাতা হইতে দূরে থাকিতাম। পরমপূজনীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। অগ্রজের নিকট শুনিয়াছিলাম, ভগবদ্ভক্ত কেশবচন্দ্র মধুরকণ্ঠে অমৃত বর্ষণ করেন, তাঁহার দিব্য সৌম্য উজ্জ্বল মুখশ্রীতে ধর্ম্ম জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠে। যে তাঁহাকে দেখে, যে তাঁহার কথা শুনে, সেই মজে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বড় আশা করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম; যদি সুযোগ হয়, সাধু কেশবচন্দ্রের পদধূলি মাথায় দিয়া কৃতার্থ হইব; অন্ততঃ দূরে দাঁড়াইয়া সাধু দর্শন করিব। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না; পথেই শুনিলাম মহাপুরুষ দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। স্বর্গগত কেশবচন্দ্রের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভক্তিভরে যোগ দিয়াছিলাম। কমলকুটীরে দেবালয়ের প্রাঙ্গনে তাঁহার পূত চিতাভস্ম হস্তে লইয়া তাঁহার পুত্র অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া কাতর করুণ কণ্ঠে ভক্তিগদ্গদ-স্বরে নিষ্ঠার সহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন,—সে দৃশ্য ও অনুষ্ঠান হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়া আছে।

তারপর মধ্যে মধ্যে সাধক-প্রবর কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের উপাসনায় গিয়া শোকার্ত্ত উপাসকমণ্ডলীর সহিত বসিতাম। ধূপধুনা-পুষ্প-চন্দন-গন্ধামোদিত মন্দিরে পবিত্রতার বাতাস প্রবাহিত হইত। পূজার শেষে "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" ধ্বনি গম্ভীর মধুর পবিত্র শঙ্খধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়ে বাজিয়া উঠিত।

সাধু মহাজনদিগের জন্মমৃত্যু স্মরণার্থ দিনে তাঁহাদের তপস্যার ফল আমরা কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছি কিনা তাহাই ভাবিয়া দেখা উচিত। মহাত্মা কেশবচন্দ্র কি কি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার, একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার সংখ্যাধিক্য দেখাইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সভাসমিতির বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে যেমন ৫২টি অধিবেশনের ৫২টি কর্ম্ম-তালিকা থাকে, অনেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি-

গণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যও তেমনি তাঁহাদের সমস্ত জীবনের কার্য্যের একটি লম্বা ফর্দ্দ দাখিল করেন, যথা—অমুক বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে ১৩টি, বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ১৭টি, জাতিভেদের বিপক্ষে ১৯টি এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে ২৩টি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কোনও ব্যক্তির এরূপ বাহাদুরী দেখিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, সাধুতা ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব প্রমাণের জন্য কেহ কেহ বলেন তাঁহার হস্তাক্ষর বড় সুন্দর ছিল, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম-কুশল ছিলেন, এমন কি সূত্রধরের কার্য্যও জানিতেন এবং ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকল বাঙ্গালীকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব কর্ম্মবহুলতায় নহে, সর্ব্বকর্ম্ম-নিপুণতায় নহে, বাগ্মীতায় নহে ;—তাঁহার মহত্ত্ব ছিল—বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমে। ভগবান তাঁহার লীলা প্রদর্শনের জন্য মহাপুরুষগণকে জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসেন তাঁহারা ধর্ম্মের আদর্শ ও সাধন সঙ্কেত পাইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হন। আমরাও পরলোকগত মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারি। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কত কত সাধু জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমরা যদি মনে করি আমরা সকলেই সমান,—পুরুষকার দ্বারা আমরা যে কেহ বুদ্ধদেব, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ হইয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে মহা-পুরুষ জগতে সুলভ হইয়া উঠিত। স্বীকার করি, সাধু সাজা সহজ। অভিনয়ের সময়, আমাদেরই মত একজন লোক সাজ-ঘরে ঢুকিয়া, চট্ করিয়া, বুদ্ধদেব সাজিয়া আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া হারমোনিয়ামের সঙ্গে সুর মিলাইয়া, চোখ উল্টাইয়া "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই" বলিয়া যখন গান ধরিয়া দেয়, তখন কি আমরা তাহাকে দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া সম্মান করি? পুরুষকার দ্বারা ধন, মান, যশ লাভ করিতে পারি, কিন্তু রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র হইতে পারি না। সাধুপুরুষের আবির্ভাব "মানব দুয়ারে দেবতা ভিখারী" বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। এ ভিখারীকে ফিরাইলে অকল্যাণ হয়, ভক্তের অপমানে ভক্তিবিহীন হইয়া সংসার-মরুতে ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিতে হয়। ভক্ত ভক্তকে চিনেন। পরমহংসদেব লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কেশবকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। যাত্রা দলের অধিকারী, ভক্ত বৈষ্ণব নীলকণ্ঠ, কেশবকে দেখিয়া মজিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর বহুকাল পরে, কোনও স্থানে তাঁহার এক পুত্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, নীলকণ্ঠ বলিয়াছিলেন "যাই যাই, ভক্ত কেশবচন্দ্রের রক্ত যাঁর মধ্যে আছে তাঁকে দর্শন ক'রে আসি।" কেশবচন্দ্রের কন্যাগণ মন্দিরে বসিয়া যখন ভক্তিভাবে মধুরকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের পবিত্র মুখশ্রী দেখিয়া ও অমৃতময় বাণী শুনিয়া মনে হইয়াছে, তাঁহাদের পিতৃদেবের অমর আত্মা তাঁহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা, সাধু মহাজনগণের জীবনকাহিনী আলোচনা করি বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ ভাল করিয়া স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের ভয় হয়, মানুষকে অধিক ভক্তি করিলে বুঝি বা ঈশ্বর বিরক্ত

হইবেন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন কর্ম্মচারীকে সম্মান করিলে আফিসের বড় সাহেব চটিয়া যান। ঈশ্বরকেও কি আমরা সেই চক্ষে দেখিব? খৃষ্টীয় প্রভাবে আমরা অনেক কথাই বলিতে শিখিয়াছি। আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের বালকবালিকার মুখেও শুনিতে পাই, রথযাত্রার সময়, হিন্দুরা যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, তখন পথভাবে আমাকে প্রণাম করিল, রথভাবে আমাকে প্রণাম করিল, বিগ্রহ ভাবে আমাকে প্রণাম করিল, আর অন্তর্যামী যিনি তিনি সকলের ভ্রান্তি দেখিয়া মনে মনে হাসেন। ছাত্রদের ইংরেজী লেখায় গ্রামারের ভুল দেখিয়া, হেডমাষ্টার যেমন হাসেন আমাদের ভ্রান্তি দেখিয়া পরমেশ্বর যদি সেইরূপ হাসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বড় ছোট করিয়া দেখা হয়। ভারতবর্ষের সাধক বলেন, "লোকে পথকেই প্রণাম করুক, রথকেই প্রণাম করুক আর বিগ্রহকেই প্রণাম করুক,—সে নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম বিশ্বপতির চরণে গিয়াই পৌঁছে। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া, কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয়ভাব অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষের উদার ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় খুঁজিয়া পাইলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন—যুগে যুগে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সকলেই সত্যপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে, ক্ষুদ্রগণ্ডী অতিক্রম করিয়া, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার সীমা ছাড়াইয়া, উদার উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতেন। কেশবচন্দ্রের ভক্তিবিহ্বলতা দেখিয়া অনেকে তাঁহার পদধূলি লইতেন। কোনও কোনও ব্রাহ্ম মনে করিলেন,—'মানুষকে এরূপ ভক্তি করিলে ঈশ্বরের প্রাপ্য ভক্তি মানুষকে অর্পণ করা হয়। ইহারই নাম গুরুবাদ। গুরুবাদ পরম অপরাধ।" ভক্ত বৈষ্ণব নীলকণ্ঠের একটি ভক্তিপূর্ণ গান কোনও ব্রহ্মসঙ্গীতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই গানের "সর্ব্ব অঙ্গে মাখি ভক্ত-পদধূলি" অংশটি বর্জ্জিত হইয়াছে। এইরূপে রসময়ভাব বর্জ্জন করিতে করিতে আমাদের ভক্তিরস শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চমত মানিয়াই তৃপ্ত আছি। আমরা যতই উচ্চকণ্ঠে বলি না কেন "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে'—তাহাতে আমাদের পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না; শুষ্কমত লইয়া মরুভূমিতে পড়িয়া থাকিব। ভক্তিহীন হইয়া কান্নার সুরে সুদীর্ঘ প্রার্থনা করি, চোখে এক ফোঁটা জল আসে না;—সে প্রার্থনা করুণ রসের অভিনয়ে পরিণত হয়। ভক্তের মধ্যে ভগবান দর্শন করিতে না পারিলে, ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ হইবে না, হৃদয় সরস হইবে না। সূর্য্যচন্দ্রে, নদী পর্ব্বতে, আকাশে অরণ্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, বিশ্বের সকল দৃশ্যে বিশ্বপতির বিশ্বরূপ দর্শন হয়—আর ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—ভক্ত মানবের মধ্যে বিশ্বেশ্বর-দর্শন হয় না? ভক্ত কেশবচন্দ্রকে যথাযোগ্য ভক্তি অর্পণ না করিয়া আমরা অপরাধ করিয়াছি। অনেক দিন হইল, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া তাঁহার উপাস্য দেবতার চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। আজ সাঁইত্রিশ বৎসর পরে, তাঁহার মৃত্যুদিনে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি আর ভাবিতেছি, আমরা কি তাঁহার ভক্তি-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইতে পারিয়াছি?

শ্রীবামনদাস মজুমদার।

রুচি।

নেহারি পূরবাকাশে তরুণ তপন
বিমল আনন্দে ভাসে জগৎ-বয়ান,
কেহ ভাবে বিধির এ লোহিত লোচন,
কেহ কয় কেন হয় নিশা অবসান।

আশীবিষ দরশনে আতঙ্কে অস্থির
কেও হয়; কিন্তু ওই সাপুড়ে স্বেচ্ছায়
বিবরে প্রবেশি করে আদর অহির;
রজ্জুতে সর্পের ভ্রমে কেহ মূর্চ্ছা যায়।

মদ্যপায়ী স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সুরাপানে,
কেহ ত্যজে বিষবৎ সেই মদিরায়।
রাজ্যলোভে নরশিরে কেহ অস্ত্র হানে;
তৃণসম গণে কেহ রাজ্য পিপাসায়।

প্রবৃত্তি প্রকৃতিভেদে বিধির বিধান;
হলাহল শব্দে হয় সুধা অভিধান।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার লোধ।

পরলোক ও মনুষ্যাত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব।

এই দুইটীর মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে; একটীর উল্লেখে অপরটীর কথা মনে উদিত হয়। মনুষ্য আত্মার ব্যক্তিগত অমরত্বে (personal immortality) আত্মার, চৈতন্য, স্মৃতি ও অবিভাজ্য স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে হইবে। জলবিম্ব যেরূপ উদ্ভূত হইয়া পুনর্জ্জলবক্ষে লীন হয়, মৃত্যুর পর মনুষ্যাত্মা, পরমাত্মায় তদ্রূপ লীন হয় না; মৃত্যুতে, মনুষ্যের স্থূল শরীর লোপ পাইলেও সূক্ষ্মশরীর বিদ্যমান থাকে; তজ্জন্য মৃত্যুকে, আত্মার জীর্ণবাস পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ভক্তগণ, আত্মাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর সঙ্গে তুলনা করেন; পাখী, পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিলে যেমন তাহার পিঞ্জরের বাধা দূর হওয়ায়, সে অসীম গগণের মুক্ত আলোকে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে সমর্থ হয় ও তাহার গম্যস্থানের প্রসার বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ দেহবিমুক্ত আত্মাও দেহের বাধা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, অনন্ত উন্নতির পথে, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আকার অবলম্বনে, সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বদর্শী, ও সর্ব্বজ্ঞ হন।

পরলোক সম্বন্ধে নানা লোকের নানা ধারণা, বিশেষতঃ স্বর্গ ও নরক কল্পনা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে এবং কবিদের কাব্যে, স্বর্গ ও নরকের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা সাধারণ লোকের মনে অনেক স্থলে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। বস্তুত, স্বর্গ ও নরক, মনের অবস্থামাত্র; আত্মপ্রসাদই স্বর্গের সুখ, অনুতাপই নরকের অনল; এবং ইহাই যথাক্রমে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি। পাপ ও পুণ্যের "ওজেবাদ" (set off) হয় না; পাপের জন্য অনন্ত নরক ভোগ নাই। আকরিক অপরিষ্কার ধাতু যেরূপ "ব্লাষ্ট্ ফার্ণেসের (Blast furnance) উত্তাপে মলিনত্ব বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল আকার ধারণ করে, আত্মাও অনুতাপানলে তদ্রূপ সংস্কৃত হয়।